সা য়ে ন্স ফি ক শ ন

দূর পৃথিবীর ডাক

আর্থার সি. ক্লার্ক

অনুবাদঃ মিজানুর রহমান

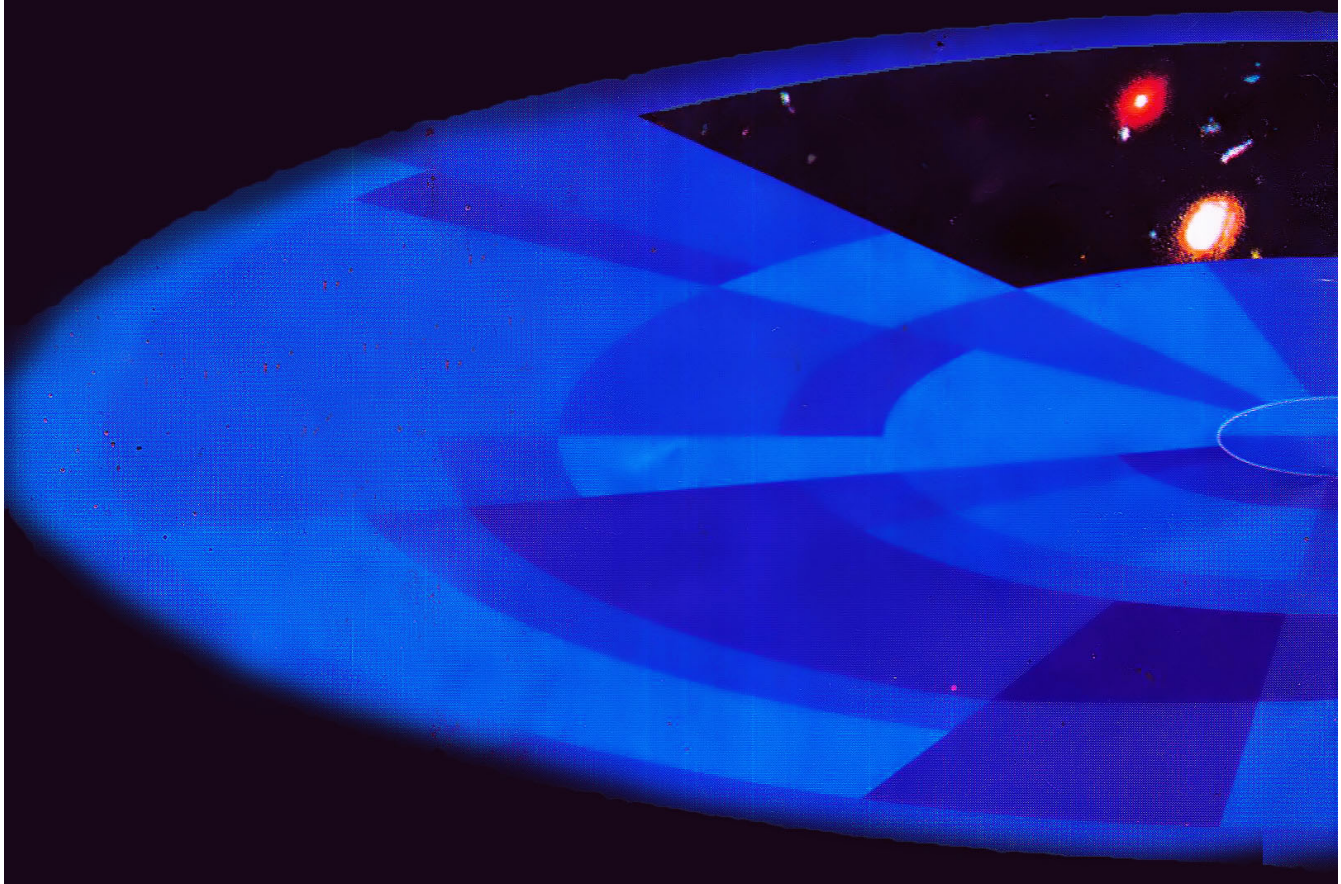

ANIK FUAD

মহাকাশযান ম্যাগেলান–পুড়ে যাওয়া পৃথিবীর শেষ উপহার তার সন্তানদের প্রতি। পঞ্চাশ আলোকবর্ষ দূরে সাগান-২ গ্রহকে মানুষের নতুন পৃথিবী করার সংকল্প নিয়ে ছুটে চলেছে সে। যাত্রাপথে বিরতি হিসেবে যাত্রা বিরতী হল থ্যালসায়। ছোট্ট সে বিশ্বে পুরনো পৃথিবীর মানুষ আবিষ্কার করল তাদেরই উত্তরসূরীদের। ভিন্ন দুই প্রেক্ষাপট থেকে আসা দুই সংস্কৃতির মানুষ কিভাবে পরস্পরকে আবিষ্কার করবে? তারা কি পরস্পরকে বুঝতে পারবে? ধ্বংস হওয়া পৃথিবীর স্মৃতি, থ্যালসার বর্তমান সৌন্দর্য আর সাগান-২ এর কঠিন ভবিষ্যত কি একই সুতোয় বাঁধা থাকবে? নাকি পালতোলা সেই ক্যাপ্টেন কুকের ম্যাগেলানের মত ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ঘটনা পাড়ি দিতে হবে কোয়ান্টাম ড্রাইভের শক্তিসম্পন্ন মহাকাশযান ম্যাগেলানকে। পাঁচশ বছরের যাত্রায় সব কিছুই সম্ভব।

পৃথিবীবাসী ও থ্যালসার অধিবাসীদের সম্পর্ক নৃতাত্ত্বিক অভিঘাত, পুড়ে যাওয়া পৃথিবীর বিষণ্নতা আর সব ছাপিয়ে ওঠা মানুষের জয়ের কাহিনী বলা হয়েছে এ-গ্রন্থে। এ-কাহিনী যত না আজকের তারচেয়ে বেশী আগামীর। হয়তো আগামীতে কোন দূর গ্রহে বসে এই কাহিনী পড়ে কেউ বিস্মিত হবেন লেখকের প্রজ্ঞার কথা ভেবে। বিশ্বের সব সম্মানিত সায়েন্স ফিকশন পুরস্কার যে লেখকের করায়ত্ব।

সায়েন্স ফিকশন

দূর পৃথিবীর ডাক

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

বইটি Banglapdf.net এর সৌজন্যে ক্রিয়েট করা। আমার ক্রিয়েট করা বই এর ব্যাপারে আমার অনুরোধ একটাই কোথাও শেয়ার করলে শুধু সাইটের কার্টেসী টুকু দিলেই হবে। তবে বেশ কিছু সাইট এবং বেশ কিছু গ্রুপ এই সাধারণ ভদ্রতাটুকু দেখাতেও রাজী না। যাইহোক, আসল কথা হল, সোর্স আমরাই। অন্যরা কার্টেসী দিলে ত ভাল, নাহয় চুরি করে চালাচ্ছে। আশা করব চোরদের বা অভদ্রদের এড়িয়ে চলার মানসিকতা আমাদের সবার মধ্যেই বিদ্যমান। ধন্যবাদ।

সায়েন্স ফিকশন

দূর পৃথিবীর ডাক

আর্থার সি. ক্লার্ক

অনুবাদ মিজানুর রহমান শাওন

সন্দেশ

সন্দেশ

ISBN-984-8088-53-9

দূর পৃথিবীর ডাক

আর্থার সি. ক্লার্ক

অনুবাদ মিজানুর রহমান শাওন

© সন্দেশ

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ফেব্রুয়ারী ২০০১

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহাবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
কম্পোজ বুক ক্লাব কম্পিউটার ৪৪ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০
পানামা প্রিন্টার্স ৫৯ পশ্চিম মালিবাগ ঢাকা ১২১৭ থেকে মুদ্রিত
পরিবেশক বুক ক্লাব ৪৪ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

১২৫.০০ টাকা

অনুবাদকের উৎসর্গ

আব্বা-আম্মা-সোহাগ
এবং
সাদিয়া শবনম সোমা
—আমার কাছের পৃথিবীর মানুষেরা

অনুবাদকের কথা

আর্থার সি ক্লার্ক বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখক। তার সাহিত্য কর্মের ভেতর **The Songs of Distant Earth** একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীটি একটি Hard Scince Fiction অর্থাৎ এটি নিছক কোন ফ্যান্টাসী নয়। বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে যা হতে পারে তার একটা সম্ভাব্য বিবরণ। কোয়ান্টাম ড্রাইভের ব্যাপারটিই কেবল এখানে কল্পিত। এছাড়া বাকী সবকিছুই বর্তমান বিজ্ঞানের স্বাভাবিক অগ্রগতিতেই আসার কথা। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী আর নিছক ফ্যান্টাসীর ভেতরের পার্থক্যটা এই উপন্যাসটি স্পষ্ট করে দেয়।

মহাকাব্যিক ঢঙে লেখা এ উপন্যাসটিতে বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভালোবাসা আর বিষাদ এক সঙ্গে মিলেমিশে এক অসাধারণ কাহিনীর জন্ম দিয়েছে যার সঙ্গে সম্ভবতঃ বাংলাভাষী পাঠকরা এর আগে খুব বেশি পরিচিত হয়নি।

মিজানুর রহমান (শাওন)

থ্যালসা

১. তারনার সৈকতে

বোটটা রীফে ঢোকার আগেই মিরিসা বুঝতে পরল যে ব্র্যান্ট রেগে আছে। হালের পেছনে তার রাগী দাঁড়ানো ভঙ্গি আর শেষ পথটুকু কুমারের বিশ্বস্ত হাতে ছেড়ে না দেয়াটাই প্রমাণ করে যে, কিছু একটা তাকে রাগিয়ে তুলেছে।

মিরিসা আস্তে আস্তে পাম গাছের ছায়া ছেড়ে বেরিয়ে এল। ঠান্ডা বালি যেন পা কামড়ে ধরছে। সে যখন সমুদ্রের কাছাকাছি পৌঁছালো, ততক্ষনে কুমার সবকিছু গুটিয়ে এনেছে। তার "বাচ্চা" ভাইটা (এখন অবশ্য তার সুঠাম পেশীবহুল দেহটা প্রায় মিরিসার সমানই হয়ে গেছে) ফুর্তিতে দৌড়ে এলো। কতবার মিরিসা আশা করেছে যে কুমারের এই সহজ ভালোমানুষী ভাবটা যদি ব্র্যান্টের থাকতো–কোন সমস্যাই যাকে আক্রান্ত করতে পারে না। ব্র্যান্ট অবশ্য বোট পাড়ে ভেড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল না। কোমর পানিতেই লাফিয়ে নেমে, রাগের সঙ্গে আসতে লাগল। একটা ধাতব, বাঁকানো ফেসটুন জাতীয় জিনিস, তাতে আবার কিছু ছেঁড়া তার ঝুলছে–সেটাই মিরিসাকে দেখানোর জন্য তুলে দেখাল।

চেঁচালো, দেখ! তারা আবার এটা করেছে। আর খালি হাতটা দিয়ে একই সঙ্গে উত্তর দিকটা দেখালো, এবার আমি ছাড়ছি না। আর ঐ মেয়র তার যা খুশী করুক।

মিরিসা চুপ করে দাড়িয়ে রইলো। ওদিকে দুই কাঠামো বিশিষ্ট ছোট নৌকাটা, প্রাচীন কোন সামুদ্রিক প্রাণীর মতো বালিতে ঢেউয়ের তোড়ে আছড়ে পড়ল। বাইরের চাকাগুলোর সাহায্যে সেটা আস্তে আস্তে জলসীমার উপরে উঠতেই কুমার নৌকার ইঞ্জিন বন্ধ করে, রাগে ফুসতে থাকা তার কাপ্তেন এর পাশে গিয়ে দাড়াল। সে বলল,

–আমি ব্র্যান্টকে বারবার বলেছি যে এটা দুর্ঘটনা। হয়তো একটা নোঙর ফেলা হয়েছিল। এছাড়া উত্তরের লোকজন ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কেন করবে?

–তারা করবে, কারণ তারা কোন প্রযুক্তি বের করার মতো কর্মঠ নয়, কারণ তারা ভয় পাচ্ছে যে আমরা অনেক বেশী মাছ ধরব। কারণ...

কুমারের দেঁতো হাসি চোখে পড়তেই সে থামল, আর জিনিসটা ছুড়ে মারল তার দিকে। কুমার অবশ্য সহজেই ধরে ফেলল।

–যাই হোক না কেন। যদি এটা দুর্ঘটনাও হয় তবুও তাদের ওখানে নোঙর ফেলা উচিত হয়নি। ওই জায়গাটা চার্টে পরিষ্কার ভাবে দাগিয়ে দেয়া আছে "গবেষণাক্ষেত্র –দূরে থাকুন।" আমি একটা প্রতিবাদ পাঠাতে যাচ্ছি।

ব্র্যান্ট অবশ্য এতোক্ষণে তার স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে। তার সবচাইতে কড়া রাগটাও কয়েক মিনিটের বেশী থাকে না। তাকে ঠিক রাখতে মিরিসা তার পিঠের ওপরে আঙ্গুল ছোয়াতে ছোয়াতে সবচাইতে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল,

–ভালো মাছ পেয়েছ?

কুমার উত্তর দিল,

–মোটেই না। তার আগ্রহ হচ্ছে কেবল উপাত্ত নেয়াতে। কিলোগ্রাম পার কিলোওয়াট এসব হাবিজাবি আর কি। ভাগ্য ভালো যে আমি রডটা নিয়েছিলাম। রাতের জন্য একটা টুনা মাছ ধরেছি।

সে বোটে গিয়ে প্রায় এক মিটার লম্বা সুন্দর মাছটা তুলে ধরল। এর রং অবশ্য দ্রুত বিবর্ণ হচ্ছে, চোখটা মৃত্যুর ছোয়ায় চকচকে হয়ে গেছে। সে গর্বের সঙ্গে বলল,

–এতবড় সবসময় পাওয়া যায় না।

তারা যখন সবাই এর প্রশংসায় ব্যস্ত ঠিক তখন ইতিহাস ফিরে এল থ্যালসায়। আর যে সহজ নিরুদ্বিগ্ন জগতে তাদের তারুণ্য কাটছিল হঠাৎ করেই তা শেষ প্রান্তে চলে এল।

এর প্রমাণটা চলে যাচ্ছিল আকাশ দিয়ে। যেন একটা দৈত্য নীল আকাশে বিশাল এক চক দিয়ে দাগ টেনে দিয়েছে। তারা দেখছিল উজ্জ্বল ধোয়ার পথটা তার প্রান্তের দিক দিয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। তারপর সেটা খন্ড খন্ড মেঘ হয়ে গেল আর যেন বরফের একটা সেতু তৈরী হল দিগন্ত থেকে দিগন্তে।

আর একটা দূরাগত গর্জন ধেয়ে আসতে লাগল আকাশ থেকে। এটা সেই আওয়াজ যা থ্যালসা গত সাতশ বছরে শোনেনি। তবে এমনকি বাচ্চারাও একবার শুনলেই এই আওয়াজ চিনে ফেলবে।

বিকেলের গরম সত্ত্বেও মিরিসা কেঁপে উঠল। মিরিসা ব্র্যান্টের হাত ধরলেও সে সেটা টের পেল কিনা সন্দেহ। সে তখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। এমনকি কুমারও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছিল। অবশ্য সেই প্রথম কথা বলল,

–যে কোন একটা কলোনী আমাদের খুঁজে পেয়েছে।

ব্র্যান্ট মাথা নাড়ল, তবে খুব দৃঢ় বিশ্বাসে নয়।

–তাদের দরকারটা কি? তাদের কাছে পুরানো ম্যাপ তো আছেই। তারা তো জানেই যে থ্যালসা প্রায় পুরোটাই সাগর। তাদের এখানে এসে কোন লাভ নেই।

–বৈজ্ঞানিক কৌতুহল? মিরিসা বলল, আমাদের কি হয়েছে তা দেখতে। আমি সব সময় বলেছি যে আমরা কমিউনিকেশন লিঙ্কটা ঠিক করি।

এটা একটা পুরোনো তর্ক, যা কয়েক যুগ পর পর চাঙ্গা হয়। এক সময় বেশীর ভাগ লোকই মনে করত যে থ্যালসার উচিত পূর্ব দ্বীপের বড় ডিসটা মেরামত করা। যেটা নাকি চারশ বছর আগে ক্র্যাকানের অগ্নুৎপাতের কারণে ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে অনেক কিছুই এল, যা নাকি আরও গুরুত্বপূর্ণ বা আরও মজাদার।

ব্র্যান্ট চিন্তার সঙ্গে বলল।

–একটা মহাকাশযান তৈরী বিশাল ব্যাপার। আমার মনে হয় না, কোন কলোনী সেটা করতে পারবে যতক্ষণ না পৃথিবীর মতো...

সে চুপ করে গেল। এতো শত বছর পর এটা একটা কঠিনই নাম উচ্চারণের জন্য। তারা দ্রুত পুবে ফিরল, যেখানে নিরক্ষীয় রাত দ্রুত নামছে সমুদ্র অতিক্রম করে। কিছু উজ্জ্বল তারা এর মধ্যেই ফুটে উঠেছে। পাম গাছের ওপর ছোট্ট নির্ভুল ত্রিভুজ।

এ তিনটি নক্ষত্র একই ম্যাগনিচুডে। দক্ষিণে থাকলে কয়েক সপ্তাহের জন্য আরও উজ্জ্বল দেখা যায়।

এর ক্ষয়ে যাওয়া চারপাশটা এখনও দেখা যায়, মাঝারী মানের টেলিস্কোপেই, কিন্তু কোন যন্ত্রই সেই পুড়ে যাওয়া পৃথিবীকে দেখতে পায় না।

২. ছোট্ট, নিরপেক্ষ এক

প্রায় এক হাজার বছর পরে একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ১৯০১-২০০০ সালকে "শতাব্দী –যখন সব হয়েছিল" হিসাবে বলেন, তখন তিনি এটাও উল্লেখ করেন যে ঐ সময়ের মানুষরাও তার সঙ্গে একমত হবে, তবে সম্পূর্ণ এক ভুল কারণে। তারা অবশ্য যৌক্তিক গর্বের সঙ্গেই দেখাবে বাতাসের ওপর প্রভুত্ব, আনবিক শক্তি, জীবনের মূল সূত্রের আবিষ্কার, ইলেকট্রনিক আর যোগাযোগ বিপ্লব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শুরু আর সবচাইতে বড় জিনিস সৌরজগৎকে ছাড়িয়ে যাওয়া আর চাঁদে প্রথম পদার্পন। অবশ্য ঐ ঐতিহাসিক যথার্থ ভাবেই দেখান যে, হাজারে একজনও সেই আবিষ্কারের কথা শোনেনি যা কিনা সব ঘটনাকেই ছাড়িয়ে যায়, এবং সব কিছুকে একদম অপ্রাসঙ্গিক করে তোলে।

এটাকে ক্ষতিকর মনেই হয়নি, যেমন মনে হয়নি হিরোশিমায় আনবিক বোমা পড়ার পঞ্চাশ বছর আগে বেকরোলের পরীক্ষাগারে ফটোগ্রাফিক প্লেটের ছবিকে। বস্তুত, এটা ছিল ঐ পরীক্ষারই একটা উপজাত এবং অবশ্যই সমান নিরীহ।

প্রকৃতি খুব শক্তভাবে তার ভারসাম্য রক্ষা করে। তাই পদার্থবিদরা খুবই অবাক হলেন, যখন তারা আবিষ্কার করলেন যে কিছু আনবিক বিক্রিয়ায় সব যোগ করলেও সমীকরণের এক পাশে কিছু কম হয়ে যাচ্ছে।

অডিটরের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য হিসাব রক্ষক যেমন নতুন হিসাব দেখায়, পদার্থবিদরাও তেমন একটা নতুন কণার সৃষ্টি করলেন। এবং গরমিলের হিসাবের একাউন্টের মতোই এটা ছিল অদ্ভুত। এর না ছিল ভর, না ছিল চার্জ এবং আশ্চর্যভাবে কোন বিক্রিয়া ছাড়াই এটা ভেদ করতে পারত–এমনকি বিলিয়ন কিলোমিটার পুরু সীসার দেয়ালও। এর ডাক নাম দেয় হল "নিউট্রিনো" নিউট্রন+ব্যমবিনো। এটাকে অবশ্য চিহ্নিত করার কোন আশা কারও ছিল না। কিন্তু ১৯৫৬ সালে পদার্থবিদরা যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম কিছু নমুনা ধরতে পারলেন। এটা

অবশ্য তাত্ত্বিকদের জন্য এক বিশাল বিজয়। তারা তাদের সমীকরণের নির্ভুলতার প্রমাণ পেলেন।

অবশ্য সমগ্র বিশ্ব এ ব্যাপারে শোনেওনি কিংবা পাত্তাও দেয়নি। কিন্তু শেষের দিনের হিসাব আরম্ভ হয়ে গেল।

৩. কাউন্সিল

তারনার আঞ্চলিক যোগাযোগ কখনোই শতকরা পচানব্বই ভাগের বেশী কিংবা পচাশি ভাগের কমে কর্মক্ষম থাকে না। থ্যালসার অন্যান্য যন্ত্রের মতোই এটা বহু আগেকার মেধাবীদের তৈরী। তাই হঠাৎ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা একেবারেই অসম্ভব। এমনকি যদি অনেকগুলো অংশও খারাপ হয়ে যায়, তবুও এটা কাজ করে, যতক্ষন না কেউ একজন রেগেমেগে এটাকে ঠিক করে।

সেন্ট্রাল কম্পিউটারের তথ্য অনুযায়ী, নেটওয়ার্কটা এখন প্রায় পচানব্বইভাগ সেবা দিচ্ছে। এবং মেয়র ওয়াডের্ন এর পরিমান কম হলেই খুশী হতেন। গত আধ ঘন্টায় পুরো বসতিই তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং অন্তত পঞ্চাশজন বয়স্ক আর শিশু কাউন্সিল চেম্বারের দিকে রওয়ানা দিয়েছে। সেখানে সবার দাঁড়াবার জায়গাই হবে না। আসনের কথাতো বাদই।

একটা সাধারণ মিটিং এর ফোরাম পূর্ণ করতে বারোজন লাগে এবং সে পরিমাণ মানুষ জোগাড় করতে প্রায়ই ঘাম ছুটে যায়। তারনার বাকী পাঁচশ ষাটজনের সে মিটিং দেখার কথা এবং ভোট দেয়ার কথা। অবশ্য যদি তারা আগ্রহী হয়।

প্রাদেশিক সরকার থেকেও দুটো বার্তা এসেছে। একটা প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে অন্যটা উত্তর দ্বীপের সংবাদ সংস্থা থেকে। প্রত্যেকেরই অপ্রয়োজনীয় অনুরোধ। এবং প্রত্যেকেই একই ছোট জবাব পেয়েছে– কিছু ঘটলে অবশ্যই আমরা তোমাদের জানাব–তোমাদের আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ।

মেয়র ওয়াডের্ন রোমাঞ্চ পছন্দ করেন না। আঞ্চলিক প্রশাসক হিসেবে তার মোটামুটি সাফল্যের চাবিকাঠি এটাই। তবে সব সময় তার ভেটো কাজ করে না। যেমন ৫৯ সালের হারিকেন–সেটা অবশ্য এ শতাব্দীর মানে আজ পর্যন্ত সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

তিনি চিৎকার করলেন,

–সবাই চুপ করুন। রিনা খোলশগুলো রেখে দাও। এগুলো আনতে অনেক কষ্ট হয়েছে। তোমার বিছানায় যাবার সময় হয়েছে। বিলি টেবিল থেকে নাম, এক্ষুনি।

তার বিস্ময়কর দ্রুত নির্দেশ বোঝালো যে, বসতির লোকজন তার কথা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। তিনি তার হাত-ফোনের জ্বলতে থাকা সুইচটি চালু করলেন।

–সত্যি বলতে তোমরা যা জান তার চাইতে খুব বেশী আমিও জানি না। এবং কয়েক ঘন্টা ধরে আমরা কোন তথ্যও পাচ্ছি না। এটা অবশ্যই কোনো ধরনের

মহাকাশযান। এবং এরই মধ্যে এটা ঢুকে পড়েছে থ্যালসায়। যেহেতু এখানে আর কোন জায়গা নেই তাই সম্ভবতঃ এটা আবার তিন দ্বীপের কাছেই ফিরবে। গ্রহকে পুরো ঘুরতে এর হয়তো ঘন্টা খানেক লাগবে।

–কোন রেডিও যোগাযোগ করার চেষ্টা? কেউ একজন বলল।

–হয়েছে। তবে কোন লাভ হয়নি।

–আমাদের কি চেষ্টা করা ঠিক? আরেক উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর।

পুরো সভায় লম্বা বিরতি পড়ে গেল। তারপর কাউন্সিলর সিমন্স (মেয়র ওয়াডের্নের প্রধান অনুচর) বললেন,

–এটা ফালতু। যাই আমরা করি না কেন, তারা আমাদের দশ মিনিটের মধ্যে বের করে ফেলবে। আর মনে হয়, তারা জানেও ঠিক কোথায় আমরা আছি।

মেয়র বললেন।

–কাউন্সিলরের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। যে কোন কলোনিয়াল যানের কাছে থ্যালসার সম্পূর্ণ ম্যাপ আছে। যেটা হাজার বছরের পুরোনো হতে পারে কিন্তু তা প্রথম অবতরণকে দেখাবে।

–কিন্তু ধরো, মানে শুধুই কল্পনা করো–এরা ভিনগ্রহের জীব।

–কোন ভিনগ্রহের জীব নেই। অন্ততঃ মহাকাশ যাত্রার মতো বুদ্ধিমান। আমরা একশ ভাগ নিশ্চিত নই–কিন্তু পৃথিবী হাজার বছর ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে।

মিরিসা কুমার আর ব্র্যান্টের মাঝে দাড়িয়ে পিছন থেকে বলে উঠল।

–আরেকটা সম্ভাবনা আছে।

প্রত্যেকেই তার দিকে তাকাল। ব্র্যান্ট একটা বিরক্তি প্রকাশ করল। মিরিসাকে ভালোবাসলেও মাঝেমাঝে তার মনে হয় যে মিরিসার জ্ঞানজ্ঞম্যি ভালো নয়। আর মিরিসার পরিবার গত পাঁচ প্রজন্মে আর্কাইভের দায়িত্বও পায়নি।

–কি সেটা?

এবার মিরিসার পালা বিরক্ত হবার। যদিও সে তার বিরক্তিকে গিলে ফেলল। সে এমন কারও জন্য নীচুতে নামতে চায় না, যে কিনা খুব একটা বুদ্ধিমান নয় অথচ ধূর্ত। ঘটনাটা হচ্ছে মেয়র ব্র্যান্টের প্রতি কিছু পরিমানে আকৃষ্ট। মিরিসার অবশ্য বয়স্ক এক মহিলার প্রতি কিছুটা সহানুভূতিই জাগে।

–এটা তো রোবট চালিত বীজবহনকারী মহাকাশযান হতে পারে। যেমন একটা আমাদের পূর্বপুরুষদের জিন প্যাটার্ন নিয়ে এসেছিল।

–কিন্তু এখন, এতো পরে?

–কেন নয় ? প্রথম দিকের বীজ বহনকারী মহাশযানগুলো কেবল আলোর বেগের কয়েক শতাংশ বেগে যেতে পারত। পৃথিবী সেগুলোর উন্নতি ঘটাতে লাগল একদম ধ্বংস পর্যন্ত। শেষ মডেলগুলো প্রায় দশগুন দ্রুত। সেগুলো প্রথম দিকেরগুলোকে এক শতাব্দীর মধ্যে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। এবং তাদের অনেকেই এখনও পথে আছে।

ব্র্যান্ট তুমি কি বল?

মিরিসা সবসময় সতর্কভাবে যে কোন আলোচনায় তাকে টেনে আনে, এবং যদি সম্ভব হয়, চিন্তাটা তার মাথা দিয়ে এসেছে এমন ধারণা দেয়। ব্র্যান্টের হীনমন্যতা সম্বন্ধে সে ভালোই জানে এখানে কিছু যোগ করতে সে মোটেই চায় না। ব্র্যান্ট বলল,

–এটা একটা আকর্ষণীয় ধারণা। ঠিক হতেও পারে।

যদিও ইতিহাস খুব একটা শক্তিশালী যুক্তি নয়। ব্র্যান্ট ফ্যাকনরের একজন প্রযুক্তিবিদের জ্ঞান আছে। বিশেষতঃ থ্যালসাকে কলোনী করার জটিল পদ্ধতি সমন্ধে। সে যোগ করল, আমরা কি করব? যদি আরেকটা মহাকাশযান আমাদের এখানে আবার কলোনী করতে চায়। ধন্যবাদ, আজ নয় আরেকদিন।

কিছু নার্ভাস হাসির শব্দ শোনা গেল। কাউন্সিলর সিমন্স চিন্তাশীল ভাবে বললেন,

–আমার মনে হয় এ ধরনের কোন ব্যাপার আমরা ঠিক করতে পারব। রোবটগুলোর কি এতোটুকু বুদ্ধি হবে না যে প্রোগ্রামটা বাতিল করবে। যেহেতু তা আগেই হয়ে গেছে।

–সম্ভবত। কিন্তু চিন্তা কর, তারা আরও ভালো করবে। যাইহোক, পৃথিবী থেকে পরের মডেল হলেও কোন এক ধরনের রোবট হবে সেটা।

এটা অবশ্য ব্যাখ্যার কোন দরকার ছিল না। সবাই জানে আন্তনাক্ষত্রিক ভ্রমণের অসুবিধা আর ব্যয়ের কথা। যদি যান্ত্রিক উৎকর্ষতায় সম্ভবও হয়, রোবটরা হাজার গুণ শস্তায় তা করে দেবে।

মেয়র বললেন–

–এটা হয়ত আমাদের সমস্যা নয়। সবাই ভাবছে যে, আমাদের এখানেই অবতরণ হবে, কিন্তু কেন ? উত্তর দ্বীপ তো আরও বেশী...

মেয়র প্রায়ই ভুল প্রমাণিত হন, তবে এতো দ্রুত কখনোই নয়। শব্দটা যখন তারনার আকাশে হল, সেটা অবশ্যই আয়োনোস্ফেয়ার হতে কোন গর্জন নয়। বরং দ্রুত গতির একটা জেটের শীষ। প্রত্যেকে কাউন্সিল চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল। প্রথম কয়েকজন কেবল দেখতে পেল যে, ভোতা মাথার একটা জিনিস পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্রের পবিত্র স্থানটিতে নামছে।

–ব্র্যান্ট, তুমি সেখানে দ্রুত যেতে পারবে। তোমার ঘুড়িটা বের কর।

তারনার প্রধান মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অবাক হয়ে তাকালো। এই প্রথম সে মেয়রের কাছ থেকে সরাসরি কোন নির্দেশ পেল।

–একটা নারকেল কয়েকদিন আগে ডানায় লেগেছে। মাছ ধরার ফাঁদের কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি মেরামতের সময় পাইনি। এছাড়া এটা রাতে ওড়ার জন্য উপযুক্ত নয়। মেয়র কঠিন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন,

–আমার গাড়ীটা কি কাজ করছে?

–অবশ্যই, জ্বালানী ভর্তি।

এটা অবশ্য অস্বাভাবিক যে মেয়রের গাড়ী কোথাও যাবে। বিশ মিনিটের মধ্যে যে কেউ তারনা হেটে ফেলবে। আঞ্চলিক খাবার আর যন্ত্রপাতি ছোট ঠেলাগাড়ীতে যায়। সত্তর বছরের অফিসিয়াল সার্ভিসে গাড়িটিকে একশ হাজার কিলোমিটারেরও কম পথ যেতে হয়েছে। দুর্ঘটনা না হলে এটা আরও একশ বছর কমপক্ষে চলবে। কেউ অবশ্য ভাবেনি যে, যাত্রীদের চাইতে বয়স্ক এই গাড়ীটা এরকম একটা ঐতিহাসিক যাত্রা করবে।

৪. সতর্ক সংকেত

পৃথিবীর বিদায় ঘন্টা বাজার প্রথম শব্দটা কেউ শুনতে পায়নি। এমনকি যে বৈজ্ঞানিক কলোরাডোর পরিত্যক্ত সোনার খনিতে, মাটির বহু নীচে সেই ভয়ংকর আবিষ্কারটা করেছিলেন, তিনিও না।

এটা ছিল একটা দুঃসাহসিক পরীক্ষা। বিংশ শতাব্দীর মাঝ পর্যন্ত যা একেবারেই সমর্থনযোগ্য ছিল না। নিউট্রিনো আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল যে, মানবজাতি মহাবিশ্বের এক নতুন জানালা খুলেছে। পাতলা কাঁচের মধ্যে দিয়ে আলো যাবার মতোই যা একটা গ্রহকে ভেদ করে. তা নক্ষত্রের ভেতর দেখতেও ব্যবহৃত হতে পারে।

বিশেষত সূর্য। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্যের ভেতরের শক্তি উৎপাদনকারী বিক্রিয়াগুলো সম্বন্ধে নিজেদের জ্ঞান নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন। যার উপরে কিনা পৃথিবীর জীবন নির্ভরশীল। সূর্যের কেন্দ্রে অসম্ভব চাপ ও তাপে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয় এবং এক গুচ্ছ বিক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি নিঃসরিত হয়। এবং একই সঙ্গে তৈরী হয় একটা উপজাত– নিউট্রিনো। সৌর নিউট্রিনোগুলো তাদের জন্মস্থান থেকে বেরিয়ে পড়ে আলোর বেগে, আর ট্রিলিয়ন টনের ভর তাদের সামনে একখন্ড ধোঁয়ার বাধার বেশী কিছু মনে হয় না। দুই সেকেন্ডের মধ্যে তারা মহাশুন্যে পৌঁছে যায়। এবং মহাবিশ্বের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যত গ্রহ-নক্ষত্রই আসুক না কেন, তাদের অধিকাংশই ঐ সব "অলীক পদার্থ" কে ফাঁকি দিয়ে যায় এবং তখন সময়ও নিজের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ায়।

সূর্যকে ছাড়ার আট মিনিট পর, প্রবল সৌর নিউট্রিনো ধারার সামান্য অংশ পৃথিবীর ওপর দিয়ে যায়– আর তারও সামান্য অংশ কলোরাডোর বিজ্ঞানীরা ধরতে পেরেছিলেন। তারা প্রায় এক কিলোমিটার মাটির গভীরে তাদের যন্ত্রপাতিগুলো বসিয়েছিলেন, যাতে অন্যসব স্বল্পভেদী বিকিরণগুলো আটকে যায় আর সূর্যের বুকের ভেতরকার দুর্লভ খাঁটি বার্তাবাহকদের যেন ধরা যায়। তাদের আশা ছিল, আটকানো নিউট্রিনোগুলো দিয়ে বিস্তারিতভাবে গবেষণা করা, যা কিনা এতোদিন মানুষের জ্ঞানের বা পর্যবেক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল।

পরীক্ষাটা সফল হলো, নিউট্রিনোও পাওয়া গেল। কিন্তু তা ছিল খুবই কম। বিশাল যন্ত্রগুলো ঠিক হলে, তিন থেকে চারগুণ নিউট্রিনো পাবার কথা।

পরিষ্কার বোঝা গেল যে কিছু একটা ভুল আছে। এবং ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই হারানো নিউট্রিনোগুলো একটা বৈজ্ঞানিক বদনাম হিসেবেই টিকে রইল। যন্ত্রপাতিগুলো বারবার পরীক্ষা করে দেখা হলো, তত্ত্বগুলো খুটিয়ে দেখা হলো এবং কয়েকবার পরীক্ষাটা করে দেখা হলো। কিন্তু প্রতিবারই সেই হতবুদ্ধিকর ফলাফল।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, জ্যোতিপদার্থবিদরা একটা বিরক্তিকর সমাধানে পৌঁছুতে বাধ্য হলেন, যদিও কেউই এর পরিপূর্ণ প্রভাব বুঝল না।

আসলে যন্ত্রেরও কোন দোষ নেই। তত্ত্বেরও নেই। সমস্যাটা হচ্ছে সূর্যের ভেতরে। আন্তর্জাতিক অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নের ইতিহাসের প্রথম গোপন মিটিংটা হয়েছিল ২০০৮ সালে অ্যাসপানে–কলোরাডোতে প্রাথমিক পরীক্ষার স্থান থেকে খুব একটা দূরে নয়–যে পরীক্ষাটা কিনা এখন অনেকগুলো দেশেই হচ্ছে। এক সপ্তাহ পর ইউনিয়নের বিশেষ বুলেটিন নং ৫৫/০৮ "সৌর বিক্রিয়া নিয়ে কিছু তথ্য" শিরোনামে সমস্ত সরকারের হাতে পৌঁছে দেয়া হলো। কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে,পৃথিবী ধ্বংসের খবরটা আস্তে আস্তে ফাঁস হয়ে গেলে, বেশ একটা ভীতির সৃষ্টি হবে। বাস্তবে সাধারণ প্রতিক্রিয়া হল এরকম– হঠাৎ একটু চুপ, তারপর কাঁধ ঝাকুনী দিয়ে দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যাওয়া।

খুব কম সরকারই তাদের সামনের নির্বাচনের বেশী ভাবতে পারে, বা খুব কম লোকই তাদের নাতিদের পরের সময়কে দেখতে পায়। আর জ্যোতির্বিদদের ভুল হবার সম্ভাবনা তো রয়েই যাচ্ছে...

মানব জাতির মৃত্যুর পরোয়ানা এলেও, মৃত্যুর দিনটা তখনও অনিশ্চিত। আর সূর্য যেহেতু আগামী এক হাজার বছরের মধ্যে ধ্বংস হচ্ছে না সুতরাং কে আর চোদ্দ পুরুষের পরের ধ্বংসের জন্য কান্নাকাটি করে।

৫. নিশি যাত্রা

ব্র্যান্ট, মেয়র ওয়াডের্ন, কাউন্সিলর সিমন্স, দু'জন বয়োজ্যেষ্ঠকে নিয়ে যখন গাড়ীটা তারনার বিখ্যাত পথ ধরে যাচ্ছিল, তখন দুটো চাঁদের একটাও আকাশে ওঠেনি। যদিও ব্র্যান্ট তার স্বাভাবিক দক্ষতায় গাড়ীটা চালাচ্ছিল, কিন্তু মনে মনে মেয়রের কড়া কথার জন্য সে জ্বলছিল। এমনকি মেয়রের হাত তার খোলা কাঁধ অসতর্ক ভাবে ছুঁয়ে থাকলেও জিনিসটা সে ভুলছিল না। রাতের শান্ত সৌন্দর্য, আর পাম গাছের সম্মোহনী ছন্দ, তার স্বাভাবিক রসবোধকে শিগগিরিই ফিরিয়ে আনল। আর এমন ঐতিহাসিক একটা মুহূর্তে, নিজস্ব ক্ষুদ্র অনুভূতি কিভাবে আসতে পারে? দশামানবের মধ্যে তাদের প্রথম অবতরণের স্থান –যেখান থেকে তাদের ইতিহাস শুরু সেখানে চলে আসল। সেখানে কি অপেক্ষা করছে? একটা জিনিস নিশ্চিত, যে আগুন্ত

-করা প্রাচীন বীজ বহনকারী মহাকাশযানের অনির্বান আলোকসঙ্কেতের সঙ্গে পরিচিত। তারা এটাও জানে যে কোথায় খুঁজতে হবে। সুতরাং নিশ্চয়ই এটা মহাশুন্যের এদিককার কোন কলোনী থেকে এসেছে।

হঠাৎ করেই ব্র্যান্ট একটা বিদঘুটে চিন্তায় ধাক্কা খেল। যে কেউ বা কিছু আলোকসংকেত দেখতে পারে, যা কিনা বুদ্ধিমত্তার কথা ছড়িয়ে দিচ্ছে মহাবিশ্বে। তার মনে পড়ল কয়েক বছর আগেই এটাকে বন্ধ করে দেবার কথা উঠেছিল। কারণ এর কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই। বরং এটা কোন ক্ষতিই করতে পারে। সামান্য ভোটে প্রস্তাবটা বাতিল হয় –অবশ্য কোন যৌক্তিক কারণে নয় বরং আবেগের জোয়ারেই। থ্যালসা হয়তো খুব শিগগিরি ঐ সিদ্ধান্তের জন্য দুঃখ করবে। যদিও তখন আর কিছুই করার থাকবে না।

কাউন্সিলর সিমন্স পিছনের আসন থেকে ঝুকে মেয়রকে বললেন, হেলগা। ব্র্যান্ট এই প্রথম তাকে মেয়রের প্রথম নাম ধরে ডাকতে শুনল। তুমি কি মনে কর আমরা যোগাযোগ করতে পারব। তুমি তো জান রোবটের ভাষা খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়।

মেয়র জানে। তবে সে তার অজ্ঞানতা লুকিয়ে ফেলতে আরও ভালো জানে।

–সেটা সমস্যার সবচে ছোট অংশ। আগে তো পৌঁছাই। আর ব্র্যান্ট, তুমি কি একটু আস্তে চালাতে পারো না? আমি ওখানে জীবিত পৌঁছুতে চাই। এই পরিচিত রাস্তায় বর্তমান গতি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তারপরও ব্র্যান্ট গাড়ীর গতি কমালো। ব্র্যান্ট ভাবল, মেয়র কি মুখোমুখি হওয়াটা এড়াতে চাইছে। অবশ্য গ্রহের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো কোন মহাকাশযানকে মোকাবেলা করা বিশাল দায়িত্বের কাজ। পিছনের সীট থেকে একজন বলে উঠল।

–ক্র্যাকান! কেউ কি ক্যামেরা এনেছে?

–ফিরে যাবার সময় নেই। ছবি তোলার জন্যে অনেক সময় পাওয়া যাবে। আমার মনে হয় না, তারা "হ্যালো" বলেই চলে যাবে।

তার গলা অবশ্য সামান্য হিস্টিরিয়ার মতো শোনাল। ব্র্যান্ট তাকে দোষ দিল না। কে জানে, পরবর্তী পাহাড়ের পর তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে?

মেয়র গাড়ীর রেডিওতে বললেন,

–কিছু বলার মতো থাকলে আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে বলব মিঃ প্রেসিডেন্ট। ব্র্যান্ট বার্তাটা শুনতেই পায়নি। সে এতোটাই তার স্বপ্নে মগ্ন ছিল। জীবনে এই প্রথমবারের মতো তার মনে হল ইতিহাসটা আরেকটু শেখা উচিত ছিল।

তবে অবশ্যই সে মূল তথ্যগুলোর সঙ্গে পরিচিত। থ্যালসার প্রতিটা শিশুই ওগুলো জেনে বড় হয়ে ওঠে। সে জানে কিভাবে নির্মমভাবে এগিয়ে আসছিল টিক টিক করে শতাব্দীগুলো। আর জ্যোতির্বিদদের দেয়া সময়টাও নির্ভুল হয়ে আসছিল। ৩৬০০ খ্রীস্টাব্দে, অবশ্য ৭৫ বছর এদিক ওদিক হতে পারে, সূর্য নোভায় পরিণত হবে। খুব বিশাল কিছু নয়। তবে যথেষ্ঠ পরিমানেই বড়।

এক প্রাচীন দার্শনিক একবার বলেছিলেন যে পরদিন সকালে ফাঁসির আদেশ একজন মানুষের মনকে আশ্চর্যভাবে স্থির করে দেয়। চার হাজার সালের দিকে পা দেবার সময় ঠিক এমন একটা অবস্থা হল সমগ্র মানবজাতির। ২৯৯৯ থেকে ৩০০০ সালের পা দেয়ার ৩১ শে ডিসেম্বর শেষ মুহূর্তে সমগ্র মানবজাতি এক মুহূর্তে এই সত্যটি উপলব্ধি করল যে, ৩ থেকে ৪ এর পরিবর্তন দেখার জন্য কেউ থাকবে না।

অবশ্য এখনও আরও পাঁচশ বছর আছে। আরও যে তিরিশটা প্রজন্ম আসবে তারা ইচ্ছে করলে তাদের পূর্বপুরুষদের মতো অনেক কিছুই করতে পারবে। অন্ততঃ তারা তাদের জাতির জ্ঞান আর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলোকে রক্ষা করতে পারবে।

এমনকি মহাকাশ যুগের একদম প্রথম দিকেও রোবট চালিত মহাকাশযানগুলো সৌরজগতের বাইরে সঙ্গীত, বার্তা আর ছবি নিয়ে যেত এই উদ্দেশ্যে যে, যদি তা মহাবিশ্বের অন্য কোন অনুসন্ধানীর হাতে পরে। যদিও নিজস্ব গ্যালাক্সীতে বুদ্ধিমান কোন জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এমনকি সবচে আশাবাদীরাও বিশ্বাস করে যে হয়তো অন্য লক্ষ গ্যালাক্সীর কোথাও না কোথাও বুদ্ধিমান জীব আছে।

তাই শত বছর ধরে মানব জাতির জ্ঞান আর সভ্যতার টেরাবাইট, টেরাবাইট তথ্য এন্ড্রোমিডা নেবুলা আর তার দূরবর্তী প্রতিবেশীদের জন্য পাঠানো হয়েছে। অবশ্য কেউই জানে না যে ওই সঙ্কেতগুলো কেউ ধরেছিল কিনা, কিংবা ধরলেও সেটা বুঝতে পেরেছিল কিনা। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল একটাই। শেষ একটা তথ্য রেখে যাওয়া মানব জাতির পক্ষ হতে–দেখ একদিন আমিও বেঁচে ছিলাম।

৩০০০ সালের দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এটা বিশ্বাস করলেন যে, তাদের বিশাল টেলিস্কোপগুলো অন্তত সূর্যের চারপাশে পাঁচশ আলোক বর্ষের মধ্যে সমস্ত গ্রহগুলোকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। এরমধ্যে ডজন খানেক প্রায় পৃথিবীর সমান গ্রহও আবিস্কৃত হল। এমনকি কাছের কয়েকটার মোটাদাগের মানচিত্রও তৈরী করা গেল। এর মধ্যে কিছুর আবহাওয়ামন্ডলে জীবনের নির্ভুল চিহ্ন–উঁচুমাত্রায় অক্সিজেন দেখা গেল। মানুষের ভালো একটা সম্ভাবনা আছে সেখানে বেঁচে থাকার। অবশ্য যদি কেউ পৌঁছুতে পারে তবেই।

মানুষরা পারবেনা তবে মানুষ পারবে।

প্রথম বীজ বহনকারী মহাকাশযানটা ছিল আদিম ধরনের। যদিও তখনকার প্রযুক্তির সর্বোচ্চটাই ব্যবহার করা হয়েছিল। ২৫০০ সালের উড্ডয়নশক্তির সাহায্যে দু'শ বছরের মধ্যেই সবচে কাছের সৌরজগতে যাওয়া যাবে। নিয়ে যাওয়া যাবে হিমায়িত ভ্রুণ। তবে সেটা ছিল তাদের কাজের সামান্য অংশ। তাদের আরও নিতে হবে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, যা কিনা ঐ সব সম্ভাবনাময় মানবকে সম্ভাব্য প্রতিকূল পরিবেশে শিক্ষা দেবে এবং লালন পালন করবে। নিরীহ নগ্ন অবোধ শিশুদের সাহারা বা এন্টার্টিকার মতো একটা বিশ্বে ছেড়ে দেয়াটা হবে অর্থহীন নিষ্ঠুরতা। তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে, যন্ত্রপাতি দিতে হবে, দেখাতে হবে কিভাবে স্থানীয় সম্পদ খুঁজতে আর ব্যবহার করতে হয়। বীজ বহনকারী মহাকাশযানগুলো

অবতরণের পরই বদলে যাবে পালক মহাকাশযানে। যা কিনা এর সন্তানদের প্রজন্মের জন্য লালন করবে। শুধু মানুষই নয় সমগ্র জীবজগৎ, উদ্ভিদ (যদিও তাদের জন্য মাটি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ) গৃহপালিত পশু, বিশাল বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয় পতঙ্গ এবং আনুবিক্ষণীক জীবও নিতে হবে এই কারণে যে, কোন কারণে স্বাভাবিক খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে হয়তোবা মূল কৃষিতেই ফিরে যেতে হতে পারে।

তবে এ ধরনেব নতুন আরম্ভের একটা সুবিধা আছে। সব অসুখ আর পরজীবিদের আগুনে পরিশুদ্ধ করার জন্য পৃথিবীতে রেখে যাওয়া যাবে।

ডাটা ব্যাঙ্ক "বিশেষ ব্যবস্থা" যা কিনা যে কোন অবস্থা মোকাবেলায় সক্ষম, এবং জরুরী ব্যবস্থা সবই ডিজাইন এবং তৈরী করতে হবে, যেটা কিনা ভালো সময় ধরে কাজ করবে।

এই কাজ যদিও মনে হচ্ছিল সম্ভব নয়। তবে এটা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক যে, সমগ্র মানবজাতি এ কাজের জন্যই ঐক্যবদ্ধ হল। এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য, শেষ লক্ষ্য –যা কিনা জীবনের কোন মানে বহন করে। এমন কি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও।

২৫৫৩ সালে প্রথম বীজ বহনকারী মহাকাশযানটি সৌরজগৎ পেরুলো। লক্ষ্য সূর্যের কাছের যমজ–"আলফা সেঞ্চুরী-এ"। যদিও পৃথিবীর সমান প্যাসডেনা গ্রহটি চরমভাবাপন্ন তবু তারপরের বি এর তুলনায় এর দুরত্ব প্রায় অর্ধেক। সিরিয়াস–দশের পথের সময় প্রায় চারশ বছর। ততদিনে পৃথিবী হয়তো টিকবেও না।

কিন্তু প্যাসডেনাকে যদি ঠিকভাবে কলোনী করা যায়, তবে হয়তো সুখবরটা শোনার জন্য যথেষ্ঠ সময় থাকবে। দু'শ বছর লাগবে যাত্রার জন্য, পঞ্চাশ বছর একটা ছোট ট্রান্সমিটার বসানো ও তৈরীর জন্য, আরও চার বছর সেই সংকেত পৃথিবীতে পৌঁছাবার জন্য। ২৮০০ সালের দিকেই হয়তো রাস্তায় চিৎকার শোনা যাবে... বাস্তবে ২৭৮৬ সালেই প্যাসডেনা ভবিষ্যৎবাণীর চাইতে ভালো করল। খবরগুলো ছিল সাংঘাতিক এবং পরিকল্পনাকে নতুন করে উৎসাহ দিল। এর মধ্যে অবশ্য একদল মহাকাশযানকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। প্রতিটি তার আগেরটার চাইতে উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ। শেষ মডেলগুলো আলোর বিশ শতাংশ গতিবেগে পৌঁছুতে পারে। আর হাতের মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশটা লক্ষ্য আছে।

এমনকি যখন প্যাসডেনার সঙ্কেত প্রাথমিক অবতরণের পর আর কোন সংকেত পাঠাল না, তখনও হতাশাটা ছিল সাময়িক। যেটা একবার করা গেছে সেটা আবার করা যাবে, আবারও এবং অনেক বেশী সাফল্যের নিশ্চয়তা সহ।

২৭০০ সালে হিমায়িত ভ্রুণ নিয়ে যাবার স্থূল পদ্ধতিটা বাতিল হয়ে গেল। ডি এন. এ. এর সর্পিল কাঠামোতে প্রকৃতি যে জেনেটিক তথ্যগুলো রেখে দেয়,তা শক্তিশালী কম্পিউটারের স্মৃতিতে অনেক বেশী সহজে, নিরাপদে এবং গুছিয়ে রাখা

যায়। তাই লক্ষ জিনোটাইপ .হাজার যাত্রীবহনকারী বিমানের সমান একটা মহাকাশযানেই রেখে দেয়া যায়। একটা সম্পূর্ণ সম্ভাব্য জাতি, নতুন সভ্যতার জন্য সমস্ত যন্ত্রপাতিসহ, কয়েকশ বর্গমিটার জায়গার মধ্যে জায়গা করে নক্ষত্রগুলোর দিকে পাঠিয়ে দেয়া যায়।

ব্র্যান্ট জানে, সাতশ বছর আগে থ্যালসায় তাই ঘটেছিল। যে রাস্তাটা এখন পাহাড়ের উপরে উঠছে এর পাশেই তাদের পূর্বপুরুষদের তৈরীর জন্য রোবট খননকারীরা কাঁচামাল জোগাড়ের জন্য যে গর্ত খুড়েছিল, তা পড়ে আছে। এক মুহূর্তের মধ্যে তারা বহু আগের পরিত্যক্ত প্রথম প্রজন্মকে তৈরীর কারখানাটা দেখতে পাবে।

কাউন্সিলর সিমন্স ফিসফিসিয়ে বলল

–ওটা কি?

–থাম। মেয়র নির্দেশ দিলেন।

ব্র্যান্ট ইঞ্জিন বন্ধ করল। সে গাড়ীর মাইক্রোফোনের দিকে ঝুকল।

–মেয়র ওয়াডের্ন বলছি, আমরা সাত কিলোমিটারের চিহ্নে আছি। আমাদের সামনে একটা আলো আছে, আমরা গাছের মাধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। আমি এটাও বলতে পারি যে ওটা ঠিক প্রথম অবতরণের জায়গা। কিছুই আমরা শুনছি না। আমরা আবার যাচ্ছি। ব্র্যান্ট নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করল না। স্পীড কন্ট্রোলকে আস্তে সামনে ঠেলে দিল। ৫৯ সালের হারিকেনের পর তার জীবনে এটাই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রোমাঞ্চকর ঘটনা।

সেটা অবশ্য রোমাঞ্চের চেয়ে বেশী কিছু ছিল। তার ভাগ্য ভালো যে সে বেঁচে গিয়েছিল। হয়তো এখানেও বিপদ আছে, যদিও সে তা পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। রোবটরা কি আক্রমনাত্মক হতে পারে? বন্ধুত্ব আর জ্ঞান ছাড়া থ্যালসা থেকে বাইরের আর কেউ কি আশা করতে পারে? কাউন্সিলর সিমন্স বললেন,

–গাছের ওপারে যাবার আগে আমি ভালোভাবে ওটাকে দেখতে পেয়েছিলাম। আমি নিশ্চিত ওটা এক ধরনের বিমান। বীজ বহনকারী মহাকাশযানের কখনোই ডানা বা সরু ধোয়া বের হবে না। আর ওটা খুব ছোটও।

ব্র্যান্ট বলল,

যাই হোক না কেন আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে জানব। আলোটা দেখ, এটা ঠিক পৃথিবী উদ্যানে নেমে এসেছে। আমাদের কি গাড়ী বন্ধ করে হেঁটে যাওয়া উচিত।

প্রথম অবতরণের পূবদিকে যত্ন করে উপবৃত্তাকার ঘাসের 'পৃথিবী উদ্যান' তৈরী করা হয়েছে। সেটা অবশ্য এখন গ্রহের সবচাইতে পুরোনো, পবিত্র মনুমেন্ট–পালক মহাকাশযানের কালো, লম্বা ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে। তার ওপর একটা সিলিন্ডারের ধার বেয়ে বয়ে যাচ্ছে আলোর বন্যা।

–জাহাজের কাছে পৌঁছাবার ঠিক আগে গাড়ী বন্ধ করবে, মেয়র নির্দেশ দিলেন। এরপর আমরা বের হব এবং উপরে উঠব। বাতিটা নেভাও। আমি চাইনা আমরা চাইবার আগেই তারা আমাদের দেখুক।

–তারা না ওটা?

একজন যাত্রী হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো বলল। সবাই অবশ্য তাকে অগ্রাহ্য করল। গাড়িটা মহাকাশযানের ছায়ার কাছে এসে থামল। আর ব্র্যান্ট এটাকে একশ আশি ডিগ্রী ঘুরিয়ে রাখল। সে অবশ্য ব্যাখ্যা দিল।

–যদি দ্রুত ভাগতে হয় আরকি!

অর্ধেকটা গুরুত্ব আর অর্ধেকটা উত্যক্ত করার জন্য। সে এখনও বিশ্বাস করে না সত্যি সত্যি কোন আসল বিপদ হবে। এমনকি মাঝে মাঝে তার মনেই হচ্ছে না সত্যিই এটা ঘটছে।

সে হয়তো ঘুমিয়ে আছে আর এটা একটা দুঃস্বপ্ন।

তারা দ্রুত গাড়ী থেকে বের হয়ে মহাকাশযানে উঠল এবং আলোর পরিষ্কার দেয়ালটার কাছে গিয়ে ঘিরে দাড়াল। ব্র্যান্ট হাত দিয়ে চোখ ঢেকে আধবোঁজা চোখ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল।

কাউন্সিলর সিমন্স পুরোপুরি ঠিক। এটা কোনো ধরনের বিমান। আর খুব ছোট। উত্তরের লোকেরা কি? না অসম্ভব। এই ছোট তিন দ্বীপে এটা ব্যবহারের মতো কোন পথ নেই। আর এটা লুকিয়ে বানানোও সম্ভব নয়।

ভোতা তীরের মাথার মতো এটার গঠন। এবং নিশ্চিতভাবে এটা লম্বালম্বি ভাবে নেমেছে। কারণ আশে পাশের ঘাসে নামার কোন চিহ্ন নেই। সরু একটা কোন পেছনের জায়গা থেকেই তীব্র আলো ভেসে আসছে। আর ছোট্ট একটা লাল সঙ্কেত তার ঠিক ওপরে জ্বলে আছে। সব মিলিয়ে নিশ্চিত এবং হতাশাব্যঞ্জক একটা সাধারণ যন্ত্র। যেটা ডজনখানেক আলোকবর্ষ পেরিয়ে কাছের কলোনীতেই যেতে পারবে না। হঠাৎ করে দর্শনার্থীদের অন্ধ করে প্রধান আলোটা নিভে গেল। যখন তারা রাতের দৃষ্টি ফিরে পেল তখন ব্র্যান্ট মেশিনটার সামনের জানালা দিয়ে ভেতরের জিনিস দেখতে পেল। এটা তো দেখতে মনুষ্য চালিত যন্ত্রের মতো, রোবট চালিত নয়।

মেয়রও এই বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন।

–এটা রোবট নয় এতে মানুষ আছে। আর সময় নষ্ট নয়। তোমার ফ্ল্যাশলাইটটা আমার ওপরে ধরো। যাতে তারা আমাকে দেখতে পায়।

চাঁদে প্রথম অবতরনকারী মানুষটা দুই হাজার বছর আগে ঠিক কি বলেছিল?

একটা ছোট পদক্ষেপ... তারা বিশ সেকেন্ডের মতো সময় নিল দরজা খোলার জন্য। তারপর দু'ভাঁজ করা একটা মই বেয়ে দু'জন মানুষ সদৃশ জীব নেমে এল।

সেটা অবশ্য ব্র্যান্টের প্রথম প্রতিক্রিয়া। তারপরই সে বুঝল যে তাদের গায়ের চামড়ার রঙ অথবা স্বচ্ছ, নমনীয় পুরো শরীর আবৃত করা আবরণ দেখে সে ভুল বুঝেছিল।

তারা মানুষ সদৃশ নয় তারা মানুষ। সে যদি আর কখনো রোদে না বের হয় সেও সম্ভবতঃ এদের মতো হবে।

মেয়র তার হাত দুটো "কোন অস্ত্র নেই" সেই প্রাচীন ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বের করে রেখেছিলেন। সে বলল,

–আমি আশা করি না তোমরা বুঝবে। তবু বলছি থ্যালসায় স্বাগতম।

আগুন্তকরা হাসল। দুজনের মধ্যে বয়স্ক, ষাটের শেষের কোঠায়, ধূসর চুলের সুদর্শন ব্যক্তি তার হাত বাড়িয়ে দিলেন।

–ভুল হলো। তিনি বললেন। ব্র্যান্ট কখনো এতো গভীর অনুরণিত স্বর শোনেনি। আমরা তোমাদের পুরোপুরি বুঝতে পারছি। তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা আনন্দিত।

এক মুহূর্তের জন্য অভ্যর্থনাকারীরা নিস্তব্ধ রইলো। ব্র্যান্ট অবশ্য আশ্চর্য হওয়াটাকে ফালতু ভাবল। তাদের তো দু'হাজার বছর আগের মানুষের কথা বুঝতে সামান্য অসুবিধা হয় না। শব্দ যখন রেকর্ড করা গেল এটা সমস্ত ভাষার মূল ভাবটা জমিয়ে রাখল। শব্দভান্ডার বাড়ে, ব্যাকরণ বদলাতে পারে, কিন্তু উচ্চারণ হাজার বছর ধরে অপরিবর্তিত থাকে।

মেয়রই প্রথম ঘোর ভাংল। যে শান্তভাবেই বলল,

–তাহলে তো অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচা গেল। কিন্তু তোমরা এসেছো কোথেকে? আমি আশংকা করছি, আমরা তোমাদের মানে আমাদের প্রতিবেশীদের যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের ডিপ স্পেস এ্যান্টেনাটা নষ্ট হয়ে গেছে।

বয়স্ক লোকটি তার লম্বা সঙ্গীর দিকে তাকালো এবং কোন নিঃশব্দ বার্তা তাদের মধ্যে বিনিময় হয়ে গেল। তারপর সে আবার অপেক্ষমান মেয়রের দিকে ফিরল। তার কণ্ঠের বিষণ্ন ভাবটায় কোন ভুল নেই। এর পরেই সে উদ্ভট দাবীটা করল।

–তোমাদের বিশ্বাস করাটা হয়তো কষ্টের ব্যাপার। কিন্তু আমরা তোমাদের কোন কলোনী থেকে আসিনি। আমরা সরাসরি পৃথিবী থেকে এসেছি।

ম্যাগেলান

৬. গ্রহ

লোরেন অবাক হল যে, চোখ খোলার আগেই কোথায় আছে সেটা সে ঠিক বুঝতে পেরেছে। দু'শ বছর নিদ্রার পর কিছুটা সন্দেহ থাকাটাই বরং স্বাভাবিক। কিন্তু মনে হচ্ছে মাত্র গতকাল সে মহাকাশযানের লগবুকে তার শেষ স্বাক্ষর করেছে। এবং যতদূর তার মনে পড়ে, একটা স্বপ্নও সে দেখেনি। এটা অবশ্য ধন্যবাদ পাবার মতো ব্যাপার।

চোখ বন্ধ করেই সে তার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোর দিকে মনোযোগ দিল। নিশ্চিতভাবে সে মৃদু গুঞ্জন শুনছে। মুখের ওপর দিয়ে পরিচিতভাবে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, সুন্দর অ্যান্টিসেপ্টিকের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে মুখের চারপাশে।

কেবল ওজনের অনুভূতিটা পাওয়া যাচ্ছে না। সে অলসভাবে তার ডান হাতটা তুলল। সেটা বাতাসে ভাসতে লাগল পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায়।

একটা ফূর্তিবাজ গলা শোনা গেল–

–হ্যালো মি. লোরেনসন। দয়া করে তাহলে আপনি আবার আমাদের সঙ্গ দিচ্ছেন। কেমন লাগছে?

লোরেন অবশেষে চোখ খুলে তার বিছানার পাশে ভাসতে থাকা ঝাপসা অবয়বটাকে চিনতে চেষ্টা করল।

–হ্যালো–ডাক্তার। ভালো, আমি ক্ষুধার্ত।

–এটা সবসময়ই খুব ভালো লক্ষণ। তুমি পোশাক পর। খুব তাড়াহুড়ো কোরোনা। আর দাঁড়ি রাখবে কিনা সেটা নিয়ে পরেই ভেবো।

লোরেন ভেসে থাকা হাতটা তার মুখের দিকে নিয়ে এল। খোঁচা খোঁচা দাঁড়ির পরিমাণ দেখে সে অবাক হল। অধিকাংশ মানুষের মতোই সে চিরতরে দাড়ি উঠিয়ে ফেলায় রাজী হয়নি। অবশ্য সাইকোলজির একটা খন্ডই শুধু লেখা হয়েছে এ ব্যাপারটায়। তবে এখন মনে হয় ওটা করতে হবে। চিন্তা করো, এই তুচ্ছ ব্যাপারটা কি বিশৃংখলার সৃষ্টি করেছে।

–আমরা কি নিরাপদে পৌঁছেছি?

–অবশ্যই। নইলে তো তুমি ঘুমাতে। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে। একমাস আগে থেকে মহাকাশযান আমাদের জাগাতে আরম্ভ করেছে আর এখন

আমরা থ্যালসার কক্ষপথে। মেইনটেইনেন্স ক্রু-রা সব চেক করেছে। এখন তোমাকে কিছু কাজ করতে হবে। এবং তোমার জন্য আমাদের একটা ছোট চমক আছে।

–নিশ্চয়ই ভালো কিছু।

–আমাদেরও তাই মনে হয়। মূল সভাকক্ষে দু'ঘন্টা পরে ক্যাপ্টেন বে একটা ব্রিফিং দেবেন। তুমি না যেতে চাইলে এখান থেকে দেখতে পার।

–আমি অবশ্যই যাব। সবার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছে। তবে প্রথমে কি আমি নাস্তাটা করে নিতে পারি। অনেক দিন তো হলো।

ক্যাপ্টেন সিরডার বেকে নতুন জাগানো পনেরোজনকে অভ্যর্থনা জানানোর সময় কিছুটা ক্লান্ত হলেও আনন্দিত দেখাচ্ছিল। তিনি তাদের তিরিশজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, যারা ক ও খ দলে ভাগ হয়ে কাজ করছে। মহাকাশযানের নিয়ম অনুযায়ী গ দলের ঘুমিয়েই থাকার কথা। তবে অনেকগুলো কারণ তাদের ওখানে থাকতে দেয়নি।

–আমি খুশি যে তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছো। কিছু নতুন মুখ দেখতে ভালোই লাগে। আর এটাও আনন্দের যে আমাদের মহাকাশযান আমাদের প্রাথমিক দু'শ বছরের পরিকল্পনায় বড় কোন অসুবিধা না করেই এই গ্রহে এসে পৌঁছেছে। আমরা এখন থ্যালসায়। একদম ঠিক সময়ে। প্রত্যেকে দেয়ালজোড়া ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে ঘুরে তাকাল। এর অধিকাংশটাই বিভিন্ন উপাত্ত আর মহাকাশযানের বর্তমান অবস্থার তথ্য দিয়ে ভরা। কিন্তু সবচে বড় অংশটা মহাশূন্যের দিকে একটা জানালার মতো। এটা একটা চমৎকার নীল-সাদা গ্লোবের ছবি দিয়ে ভরা এবং সম্ভবতঃ প্রত্যেকেই গভীর বিষাদের সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে মিলটা লক্ষ্য করল। প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর থেকে যেমন দেখা যায়–ঠিক তেমনি, প্রায় পুরোটাই সমুদ্র আর ছোট ছোট কয়েকটা স্থলভাগ।

এখানকার ভূ-ভাগটা হচ্ছে তিনটা ঘনসন্নিবিষ্ট দ্বীপ–মেঘ দিয়ে কিছুটা ঢাকা। লোরেন হাওয়াই এর কথা চিন্তা করল, যাকে আর দেখা যাবে না। যার কোন অস্তিত্বই আর নেই। অবশ্য একটা মৌলিক পার্থক্য আছে দুই গ্রহের ভেতর। পৃথিবীর অনেকটাই জমি আর থ্যালসার প্রায় পুরোটাই সাগর।

ক্যাপ্টেন গর্বের সঙ্গে বললেন,

–এটা এখানেই আছে। আমাদের মিশনের পরিকল্পনায় যা ধরা হয়েছিল। তবে একটা ব্যাপার হলো যে, তারা আমাদের আশা করেনি। অবশ্যই এটা আমাদের পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করবে।

আমরা জানি যে, থ্যালসা, মার্ক এক ৫০০০ ইউনিট মডেল দিয়ে কলোনীতে পরিণত হয়েছিল। যেটা ২৭৫১ সালে পৃথিবীকে ছেড়ে আসে এবং ৩১০৯ সালে অবতরণ করে। সবকিছু ভালোই চলছিল। একশ ষাট বছর পর আমরা প্রথম সঙ্কেত পাই। থেমে থেমে প্রায় দু'শ বছর ধরে তা চালু ছিল। তারপর হঠাৎই সেটা থেমে যায় একটা বিশাল অগ্নুৎপাতের বড় খবর পাঠিয়ে। আর কিছুই শোনা যায় নি।

আমরা ধরে নেই যে কলোনীটা ধ্বংস হয়ে গেছে বা এটা কোন পর্যায়ের আদিমতায় ফিরে গেছে– যেটা কিনা অন্যান্য কয়েক ক্ষেত্রে ঘটেছে।

নতুনদের সুবিধার জন্য আমরা এখন পর্যন্ত কি পেয়েছি তা আমি আবারও বলছি। স্বাভাবিকভাবেই সৌরজগৎটায় ঢোকার পর আমরা সব ফ্রিকোয়েন্সীতে শোনার চেষ্টা করেছি। কিচ্ছু না, এমনকি পাওয়ার সিস্টেমের অপচয়ের বিকিরণও আমরা পাইনি।

অবশ্য আরও কাছে গিয়ে বুঝলাম যে, সেটা কিছুই প্রমাণ করে না। থ্যালসায় আয়নোস্ফেয়ার অত্যন্ত ঘন। মিডিয়াম বা শর্ট ওয়েভে নীচে অনেক কথাই বলা যেতে পারে, বাইরে থেকে কেউই শুনবে না। মাইক্রোওয়েভ অবশ্য যেতে পারে। তবে হয়তো তাদের তা দরকার নেই, অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা কোন বীমই ধরতে পারিনি।

যাই হোক সেখানে একটা উন্নত সভ্যতা আছে। রাতের আবহাওয়া ভালো থাকলে আমরা তাদের শহরের আলো দেখতে পাই। ওখানে কয়েকটা ছোট কারখানা আছে। আছে উপকূলীয় যাতায়াত ব্যবস্থা। তবে কোন বড় জাহাজ নেই। আমরা কয়েকটা ছোট বিমানও দেখতে পেলাম পাঁচশ ক্লিকের গতিসীমার মধ্যে। যেটা তাদেব যেকোন জায়গায় পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে দেয়।

অবশ্যই এরকম একটা ঘন সমাজে বিমানের খুব একটা দরকার নেই। আর তাদের বেশ ভালো রাস্তা আছে। এখনও আমরা কোন কমিউনিকেশন বের করতে পারিনি। আর কোন স্যাটেলাইটও নেই, এমনকি ভূ-তাত্ত্বিক জরিপের জন্যও। হয়তো তাদের দরকার নেই, যেহেতু তাদের জাহাজগুলো কখনোই দৃষ্টিসীমার বাইরে যায় না। যাবার অবশ্য কোন জায়গাও নেই। অবশেষে আমরা এখানে এসেছি। এটা খুব আকর্ষণীয় অবস্থা আর বেশ চমৎকারও। অন্ততঃ আমি আশা করি। কোন প্রশ্ন? জ্বি, মি. লোরেনসন?

–স্যার আমরা কি যোগাযোগের কোন চেষ্টা করেছি?

–এখনও না। আমাদের মনে হয় তাদের সংস্কৃতির মাত্রাটা না জেনে তাদের সঙ্গে কিছু করাটা ঠিক হবে না। যাই আমরা করি না কেন, সেটা তাদের জন্য বেশ বড় একটা ধাক্কা হবে।

–তারা কি জানে আমরা এখানে আছি?

–সম্ভবত না।

–কিন্তু আমাদের ড্রাইভ তো তাদের নিশ্চয়ই দেখার কথা।

–এটা অবশ্য একটা যৌক্তিক প্রশ্ন। কোয়ান্টাম র‍্যামজেট পুরো শক্তিতে কাজ করলে সেটা হয় মানুষের শ্রেষ্ঠ দৃশ্যমান কৌশল। যা কিনা দেখা যাবেই। এটা আণবিক বোমার মতো উজ্জ্বল কিন্তু মিলিসেকেন্ডের বদলে এটাকে দেখা যায় মাস ধরে। তবে সন্দেহ আছে। আমাদের গর্জনের অধিকাংশটাই হয়েছে যখন আমরা সূর্যের অন্য পাশে ছিলাম। এর ঔজ্জ্বল্যে আমাদের দেখার কথা নয়।

এরপর সবাই যে কথাটা ভাবছে, সেটাই একজন জিজ্ঞেস করল।

–ক্যাপ্টেন, এটা আমাদের মিশনকে কিভাবে প্রভাবিত করবে?

সিরডার বে বক্তার দিকে চিন্তিত ভাবে তাকালেন

–এপর্যায়ে এটা বলা দুঃসাধ্য ব্যাপার। আরও কয়েকশ, হাজার মানুষ পুরো ব্যাপারটাকে অনেক সহজ করে দেয়। বা অন্ততঃ আরামদায়ক করে তোলে। কিন্তু যদি তারা আমাদের পছন্দ না করে...

তিনি শ্রাগ করলেন।

–এক পুরোনো অভিযাত্রীর একটা উপদেশ মনে পড়ছে। তুমি যদি স্থানীয়দের বন্ধু ভাব, তাহলে তারাও ভাববে। আর উল্টো ভাবলে উল্টোটা। যতক্ষণ অন্যকিছু প্রমাণিত না হচ্ছে আমরা তাদের বন্ধুবৎসলই ভাবব। আর যদি তারা তা না হয়...

ক্যাপ্টেনের ভঙ্গীটা কঠোর হয়ে গেল। তার কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে গেল এক অধিনায়কের যে কিনা তার মহাকাশযানকে মাত্রই পঞ্চাশ আলোকবর্ষ পেরিয়ে নিয়ে এসেছেন।

–গায়ের জোরই ঠিক এটা আমি কখনোই বলিনি। তবে এটা থাকাটা বেশ স্বস্তির ব্যাপার।

৭. শেষের দিনের প্রভুরা

এটা সত্যি আশ্চর্যের ব্যাপার যে, সে সত্যি সত্যি আবার জেগে উঠেছে এবং জীবনটাও আবার চলছে।

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার লোরেন লোরেনসন জানত যে, সে কখনোই সেই ট্র্যাজেডীর হাত থেকে বের হতে পারবেনা, যা কিনা চল্লিশ প্রজন্ম ধরে ছায়ার মতো লেগে আছে এবং তার নিজস্ব জীবনেই তা চূড়ান্তে পৌঁছুবে। প্রথম কয়েকটা দিন সে একটু ভয়ে ছিল। এমনকি ম্যাগেলানের নীচের চমৎকার সামুদ্রিক গ্রহের কোন রহস্য, কোন আশাও তাকে ঐ চিন্তা থেকে বিরত রাখতে পারত না। দু'শ বছর পর স্বাভাবিক ঘুমে কি স্বপ্ন সে দেখবে?

সে এমন একটা দৃশ্যের স্বাক্ষী যা কিনা কেউ কোনদিন ভুলতে পারবে না। আর মানবজাতিকে তা শেষ সময় পর্যন্ত তাড়া করে ফিরবে। মহাকাশযানের টেলিস্কোপ দিয়ে সে দেখেছে সৌরজগতের মৃত্যু। নিজের চোখে সে দেখেছে মঙ্গলের আগ্নেয়গিরিগুলো লক্ষ বছর পরে প্রথম বারের মতো জেগে উঠল। আবহাওয়ামন্ডল উঠে যাওয়ায় ধ্বংস হবার ঠিক আগে শুক্র আবরণহীন হয়ে গেল। গ্যাসীয় দানবটা ভাস্বর হয়ে জ্বলতে লাগল। কিন্তু পৃথিবীর ট্র্যাজেডীর তুলনায় এগুলো কিছুই না। সেটাও অবশ্য সে ক্যামেরার লেন্সের ভেতর দিয়েই দেখেছিল। পৃথিবী কয়েক মিনিটের বেশী টেকেনি সেইসব মানুষদের চাইতে, যারা শেষ সময়গুলো উৎসর্গ করেছিল তাদের তৈরী করতে। সে দেখেছে...

বিশাল পিরামিডগুলো গলিত পাথরে পরিণত হবার আগে কি রকম লাল হয়ে উঠছিল...

আটলান্টিকের তলদেশ সেকেন্ডে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং আবারও ডুবে গিয়েছিল মাঝ সমুদ্রের আগ্নেয়গিরিগুলোর লাভার স্রোতে...

ব্রাজিলের জ্বলন্ত অরণ্যের ওপর শেষ বারের মতো চাঁদ উঠেছিল সূর্যের মতোই উজ্জ্বল হয়ে...

দীর্ঘদিন ডুবে থাকার পর এ্যান্টার্টিকা জেগে উঠল, যখন প্রাচীন কিলোমিটার পুরু বরফ গলে গেল...

জিব্রাল্টার ব্রীজের মাঝের শক্তিশালী খিলান জ্বলন্ত বাতাসে উড়ে গেল...

শেষ শতাব্দীতে পৃথিবী ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ করল–মৃতদের নয় বরং যারা এখনও জন্মাতে পারে নি। পাঁচশ বছর ধরে জন্মহার এমনভাবে কমিয়ে আনা হয়েছে, মানবজাতি কয়েক মিলিয়নে নেমে গেছে শেষের সে সময়ে। সব শহরগুলো এমনকি দেশগুলোও মরুভূমির মতো পরে রইল। কেননা মানবজাতি গাদাগাদি করে রইল একসঙ্গে ইতিহাসের শেষ ঘটনার জন্য।

এটা ছিল একটা অদ্ভুত বৈপরীত্যের সময়। হতাশা আর উন্মত্ত আনন্দের মধ্যে দোল খাওয়া। অনেকেই বিস্মৃতি পেতে চাইল প্রচলিত ড্রাগস, রমণ আর বিপদজনক খেলায়–স্বীকৃত অস্ত্র নিয়ে, সতর্কভাবে পরিচালিত ছোটখাট যুদ্ধ সেগুলো। ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা, অন্তহীন ভিডিও গেম, সক্রিয় স্বপ্ন, মস্তিষ্ককে সরাসরি উত্তেজিত করা ইত্যাদিও সমান জনপ্রিয় ছিল।

কারণ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হবার কোন দরকার ছিল না। পৃথিবীর সম্পদ এবং অর্থ খুব পরিষ্কার বিবেক নিয়েই উড়িয়ে দেয়া যায়। বস্তু হিসেবে হিসাব করলে সমস্ত মানুষই কোটিপতি, যা তাদের পূর্বপুরুষরা চিন্তাও করতে পারেনি। বিকৃত একটা গর্বের সঙ্গে তারা তাদের বলত– শেষের দিনের প্রভু। বিস্মৃতির মধ্যে হারিয়ে যেতে অধিকাংশরা পছন্দ করলেও সব সময়ের মতো কিছু মানুষ ছিল যারা তাদের নিজের জীবনেরও পরের কোন লক্ষ্যের প্রতি কাজ করতে আগ্রহী। অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলতে লাগল। বিশেষত মুক্ত হয়ে যাওয়া সব সম্পদ দিয়ে। যদি কোন পদার্থবিদ কয়েকশ টন সোনা চাইত পরীক্ষার জন্য, সেটা জোগাড়েই যা সমস্যা হবে কেনায় নয়।

তিনটা ভাব প্রাধান্য পেল। প্রথমটা হলো সূর্যকে সার্বক্ষণীক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নয় বরং ধ্বংসের সময়টার ভবিষ্যৎবাণী একদম নিখুঁত করে করার জন্য, বছর দিন ঘন্টাসহ...

দ্বিতীয়টা হলো ভিনগ্রহের বুদ্ধিমানদের খোঁজা। শতাব্দীর ব্যর্থতার পর যা অগ্রাহ্য করা হয়েছিল এখন তার নিশ্চিত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গেল। তবে এমনকি শেষেও আগের চাইতে বড় কোন সাফল্য ধরা পড়ল না। মানুষের এতো প্রশ্ন সত্ত্বেও মহাবিশ্ব তার নোংরা উত্তরই দিয়ে গেল।

আর তৃতীয়টা হল কাছাকাছি নক্ষত্রগুলোকে কলোনী করা, যাতে মানব জাতি সূর্যের মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকতে পারে।

শেষ শতাব্দীর শেষ দিকে পঞ্চাশটারও বেশী লক্ষ্যে আগের চাইতে দ্রুত ও আধুনিক মহাকাশযান পাঠান হল। অধিকাংশই ধারণার মতো ব্যর্থ হল, কিন্তু অন্ততঃ দশটা আংশিক সাফল্যের বার্তা পাঠাল। শেষেরগুলোর প্রতি আশা অনেক বেশী থাকলেও সেগুলো পৃথিবী ধ্বংসের আগে পৌঁছুতেই পারবে না। একদম শেষেরটা আলোর গতির বিশ শতাংশে পৌঁছুতে পারে এবং ন'শ পঞ্চাশ বছরেই সব কিছু ঠিকঠাক চললে লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে।

লোরেন এখনও চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝখানের নির্মানস্থান থেকেই "এক্সক্যালিবারের" উৎক্ষেপনটা স্মরণ করতে পারে। যদিও তখন তার বয়স মাত্র পাঁচ কিন্তু সে জানত এটাই এধরনের শেষ মহাকাশযান। কিন্তু শতাব্দীব্যাপী লম্বা এই পরিকল্পনা, প্রযুক্তির পরিপূর্ণতায় এসে কেন বাতিল হলো তা বোঝার বয়স অবশ্য তার ছিল না। এমনকি পৃথিবীর শেষ যুগগুলোর বিস্ময়কর আবিষ্কার মানবজাতিকে নতুন আশা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন কিভাবে বদলে গেল সে সমন্ধেও তার বোঝার বয়স হয়নি। অসংখ্য তত্ত্বীয় গবেষণা হলেও কেউই মানুষ চালিত মহাকাশ যাত্রার বাস্তব রূপ দেখাতে পারেনি–এমনকি পাশের নক্ষত্রটি পর্যন্ত। শত বছরের যাত্রায় সময়টা ব্যাপার না। সেটা হিমনিদ্রার মাধ্যমেই মেটানো সম্ভব। লুই পাস্তুর উপগ্রহ হাসপাতালে একটা বাঁদর এক হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে আছে এবং এখনও সেটার মস্তিষ্কের কাজ স্বাভাবিক। মানুষ যে পারবেনা তাও ঠিক না। কারণ এক সন্দেহভাজন ক্যান্সারের রোগী দু'শ বছরের বেশী ধরে ঘুমিয়ে আছে। শারীরবৃত্তীয় সমস্যার সমাধান আছে। কিন্তু প্রযুক্তির সমস্যাটা দুর্লঙ্ঘ্য। হাজার খানেক নিদ্রিত মানুষ নিতে পারে এমন একটা মহাকাশযান প্রাচীন সামুদ্রিক জাহাজের মতোই হবে। এধরনের একটা জাহাজ মঙ্গলের পর গ্রহাণুর অফুরন্ত সম্পদ ব্যবহার করে বানানো সম্ভব। কিন্তু বিশাল সময় ধরে কাজ করবে এধরনের ইঞ্জিন তৈরী হচ্ছে অসম্ভব।

আলোর গতির এক দশমাংশের গতি হলেও সবচে কাছের সম্ভাবনাময় লক্ষ্যে যেতে পাঁচশ বছর লাগবে। ছোট রোবট যানগুলো এই গতি তুলতে পারে। কাছের নক্ষত্রগুলোর দিকে ধেয়ে যায় আর প্রথম বারের উন্মাতাল ঘন্টার বর্ণনা পাঠায়। কিন্তু তারা কোনো ভাবেই তাদের অবতরণের গতিকে কমিয়ে আনতে পারে না। দুর্ঘটনা না হলে তারা তাদের গতিবেগ বাড়িয়েই যায়। রকেট নিয়ে এটা একটা মূল সমস্যা এবং গভীর মহাশূন্য ভ্রমনে এর বিকল্পও কেউ দেখাতে পারেনি। গতি ওঠানোর মতোই গতি নামানোও একই সমস্যা। গতি কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী নেয়া শুধু যাত্রাকে দ্বিগুন ঝামেলাই দেয় না। এটা অসম্ভব করে তোলে।

একটা মহাকাশযানকে আলোর গতির এক দশমাংশে তোলা যায়। কয়েক মিলিয়ন টন জ্বালানী দিয়ে কাজটা কঠিন হলেও সম্ভব। কিন্তু যাত্রার পর সেই গতি

কমাতে আবার মিলিয়ন– না তারও বেশী মিলিয়ন মিলিয়ন টন জ্বালানী লাগবে। এটা সম্ভব নয় বলেই কেউ এটা নিয়ে চিন্তা করেনি।

আর এরপরই হল ইতিহাসের সবচে বড় রসিকতা। মানবজাতিকে মহাবিশ্বের চাবি দিয়ে দেয়া হলো এবং মাত্র এক শতাব্দী পেল তারা তা ব্যবহারের জন্য।

৮. পুরোনো সেই দিনের কথা

মোজেস ক্যালডর ভাবল, কি সৌভাগ্যবান আমি। আমি কোনদিন শিল্প কলা এবং প্রযুক্তির প্রলোভনে আকর্ষিত হইনি, যা কিনা হাজার বছর ধরে মানবজাতিকে দেয়া হয়েছে। ইভলিনের ইলেকট্রনিক ভূতকে কয়েক গিগাবাইটের প্রোগ্রামে নিয়ে আসার কোন ইচ্ছে কি আমার ছিল?

সে আমার সামনে আসতে পারত। যে কোন পটভূমিতে আমরা ভালোবাসতে পারতাম এবং এমনভাবে কথা বলতাম যে কোন আগন্তুক বুঝতেই পারত না যে, সেখানে কেউ বা কিছুই নেই।

কিন্তু পাঁচ বা দশ মিনিট পর আমি নিজেকেই জোর করে প্রতারিত করব। আর সেটা আমি কখনোই করব না। যদিও আমি কেন এর বিরুদ্ধে সে সম্বন্ধে আমি নিজেই নিশ্চিত না। আমি সব সময় মৃতের সঙ্গে মিথ্যে সান্তনার বাণী শোনাকে প্রত্যাখান করেছি। এমনকি আমি তার কণ্ঠের সাধারণ রেকর্ড পর্যন্ত রাখিনি। এর চাইতে এইই ভালো। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে তাকে দেখা। আমাদের শেষ বাড়ীর ছোট্ট বাগানে। এটুকু অন্ততঃ জানা, যে এটা কোন প্রতিরূপ বানিয়ের তৈরী নয়, এটা সত্যিই হয়েছিল দু'শ বছর আগের পৃথিবীতে। এখানে এখন শুধু আমারই কণ্ঠস্বর। আমার নিজেরই স্মৃতির সঙ্গে কথা বলা–যা আমার মানবীয় মস্তিষ্কে বেঁচে আছে।

ব্যক্তিগত রেকর্ডিং এক। আলফা স্ক্র্যামেবেলর। স্বয়ংক্রিয় মুছে যাওয়া প্রোগ্রাম। ইভলিন, আমরা এখানে। এবং আমি ঠিক প্রমাণিত হইনি। এই মহাকাশযানের সর্বজেষ্ঠ্য ব্যক্তি হলেও আমি এখনও কাজের।

জেগে দেখি, ক্যাপ্টেন বে আমার পাশে। প্রথম অনুভূতিটাই হলো গর্বের। বললাম, ভালো ক্যাপ্টেন। আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি। অর্ধেক আশংকা ছিল যে আমাকে অপ্রয়োজনীয় ভেবে না মহাশূন্যেই রেখে আস।

তিনি হাসলেন।

–সেটা এখনও হতে পারে মোজেস। যাত্রা এখনও শেষ হয়নি। তবে তোমাকে আমাদের দরকার। মিশনের পরিকল্পনাকারীরা তোমার চাইতে জ্ঞানী ছিলেন।

–তারা তো আমাকে জাহাজে আভিধানিক দূত হিসেবে আর অআভিধানিক কাউন্সিলর হিসেবে লিখেছিলেন। কোনটায় আমাকে দরকার?

–দুটোই। এবং সম্ভবত তোমার ভূমিকা হবে–

–তুমি ক্রুসডার শব্দটা ব্যবহার করতে চাচ্ছ। শব্দটা আমার পছন্দ না, আর আমি নিজেকে কোন কিছুর নেতা ভাবতেও পছন্দ করি না। আমি শুধু মানুষকে তাদের নিজেদের জন্য ভাবাতে চেষ্টা করি। আমাকে অন্ধভাবে কেউ অনুসরণ করুক তা আমি মোটেই চাইনি। ইতিহাস অনেক নেতা দেখেছে।

–সবাইতো আর খারাপ না। তোমার নামের নেতার কথাই ধরো।

–অতিরিক্ত বলা হয়। অবশ্য তোমার প্রশংসার কারণ আমি বুঝি। কারণ তোমরা দু'জনই গৃহহীন একটা জাতিকে প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছ। আমার মনে হয় সামান্য কোন সমস্যা হয়েছে।

–তুমি যে সম্পূর্ণ সজাগ তা দেখে আমি আনন্দিত। এ অবস্থায় কোন সমস্যা নেই। থাকা উচিতও নয়। কিন্তু এমন একটা অবস্থা হয়েছে, আর তুমি হচ্ছ একমাত্র কূটনীতিক। তোমার একটা দক্ষতা আছে, যা আমাদের লাগবে বলে ভাবিনি।

তোমাকে আমি বলছি ইভলিন সেটা আমাকে একটা ঝাকুনি দিল। আমার চোয়াল ঝুলে পড়তে দেখে নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন বে নির্ভুলভাবে আমার মন বুঝতে পেরেছিলেন।

–না, না আমরা কোন ভিনগ্রহবাসীর কাছে যাচ্ছি না। তবে থ্যালসার মানবজাতি আমাদের ধারণামত ধ্বংস হয়নি। বরং সেটা ভালোই চলছে।

সেটা অবশ্য আরেক আনন্দদায়ক বিস্ময়। থ্যালসা, সমুদ্র-সমুদ্র। যে জগৎটাকে আমি দেখব বলে ভাবিনি। আমি যখন জেগেছি তখন আমি অনেক আলোক বর্ষ দূরে আর শতাব্দী পেরিয়ে এসেছি।

–অধিবাসীরা কেমন? তোমরা কি যোগাযোগ করেছ?

–এখনও না। ওটা তো তোমার কাজ। পেছনের ভুল ভ্রান্তি সম্বন্ধে তুমি ভালো জান। আমরা এখানে তার পুনরাবৃত্তি চাই না। এখন যদি তুমি ব্রীজে আস তাহলে আমি তোমাকে আমাদের অনেক দিনের হারানো ভাইদের সম্বন্ধে হালকা ধারণা দেব।

ইভলিন এটা ছিল এক সপ্তাহ আগে। কি আনন্দের ব্যাপার। কোন অলংঘনীয় এবং নিশ্চিত শেষ সময়সীমার চাপ নেই। থ্যালসা সম্বন্ধে আমরা এখন এতোটাই জানি যে আমরা মুখোমুখি হব। এবং সেটা হবে আজ রাতেই। আমাদের সদিচ্ছা দেখাবার জন্য আমরা পরিচিত জায়গাটাই বেছে নিচ্ছি। প্রথম অবতরণের জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যায়। সেটা বেশ ভালো ভাবে রাখা। অনেকটা পার্ক কিংবা হয়তো তীর্থস্থানের মতো। এটা অবশ্য খুব ভালো চিহ্ন। আমি শুধু আশা করছি তারা আমাদের দেবতা ভাবতে পারে, যেটা আমাদের কাজকে সহজই করে দেবে। থ্যালসানরা কি দেবতা সৃষ্টি করছে কিনা আমি বের করতে চাই।

আমি আবার আমার জীবন শুরু করেছি। এবং সত্যি সত্যি তুমি আমার চাইতেও জ্ঞানী ছিলে–তথাকথিত দার্শনিক না হয়েও। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তার সাথীদের সাহায্য করতে পারে, ততক্ষণ তার মৃত্যুর অধিকার নেই। অন্যকিছু ভাবাটা হতো স্বার্থপরের মতো... তোমার পাশে চিরতরে শুয়ে থাকা, যে জায়গাটা বহু আগে

বহুদূরে আমরা পছন্দ করেছিলাম... এখন আমি মেনে নিয়েছি যে তুমি সৌরজগতে ছড়িয়ে আছ–আমি সারাজীবনে পৃথিবীর যা কিছু ভালোবেসেছি তার সঙ্গেই।

না, এখন কাজের সময় হলো। আর তুমি কি জান তোমার সঙ্গে যখন আমি স্মৃতিতে কথা বলি, তুমি তখন জীবিতই থাক।

৯. সুপারস্পেসের প্রশ্ন

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের যে মনস্তাত্ত্বিক আঘাতটা সহ্য করতে হয়েছে তা হল "শূন্য" স্থানের মতো ভিড়াক্রান্ত জায়গা আর দ্বিতীয়টি নেই এ সত্যের আবিষ্কার। প্রকৃতি শূন্যতা পরিহার করে অ্যারিস্টোলীয় যুগের এ তথ্যটা সম্পূর্ণ সত্যি এমনকি যখন কোন জায়গা থেকে পদার্থের শেষ অণুটিও সরিয়ে ফেলা হয়, তখনও সেখানে মানবীয় অনুভূতির বাইরে অকল্পনীয় শক্তি ছড়িয়ে থাকে। তুলনা করলে নিউট্রন নক্ষত্রের প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে শত মিলিয়ন টনের ভরের সবচে জমাট বস্তুটিও, অধরা ভৌতিক জিনিস "সুপার স্পেসে" একটা ফোম জাতীয় জিনিস। অস্বস্তিটা হল স্পেসে (স্থান) সাধারণ ধারণার চাইতে বেশী কিছু আছে। ১৯৪৭ সালে ল্যাম্ব আর রাদারফোর্ডের ক্ল্যাসিক কাজেই যা বোঝা গিয়েছিল। হাইড্রোজেন পরমাণু–সবচে সরলতম পরমাণু পর্যবেক্ষণের সময় তারা বুঝতে পারলেন কিছু একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে, যখন নিঃসঙ্গ ইলেকট্রনটা প্রোটনকে কেন্দ্র করে ঘোরে। মসৃণ একটা পথে ঘোরার চাইতে এটা অতি আণুবীক্ষণীক স্কেলে সবসময় অবিশ্রান্ত ভাবে ওঠানামা করে। কঠিন সত্যটা হল যে, শূন্যতাটার নিজের ভেতরেই ওঠানামা হয়।

সেই গ্রীকদের সময় থেকে দার্শনিকরা দু'ভাগে বিভক্ত। একদল ভাবে প্রকৃতি মসৃণভাবেই পথ চলে। আর যারা এর প্রতিবাদ করে তারা বলেন, সব কিছুই আলাদাভাবে ধাক্কাধাক্কি করে চলে। আনবিক তত্ত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষেই গেল। আর যখন প্ল্যাংকের তত্ত্ব দেখাল যে এমনকি আলো বা শক্তিও নিরবিচ্ছিন্নভাবে না এসে থোকা থোকা হিসেবে আসে তখন বিতর্কটা সত্যিকার অর্থে শেষ হয়ে গেল।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা গেল মহাবিশ্ব কণাযুক্ত বিচ্ছিন্ন। খালি চোখে যেমন জলপ্রপাত বা ইটের কণা দুরকম লাগলেও আসলে একই রকম। পানির "ইট" গুলো ছোট দেখে এমনিতে বোঝা যায় না। কিন্তু পদার্থবিদদের যন্ত্রপাতির সাহায্যে খুব সহজেই তা বোঝা যায়।

এরপর বিশ্লেষণটা আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। কণা সমৃদ্ধ এই মহাবিশ্ব কিভাবে এতো অকল্পনীয় রকমের শক্ত যা কিনা এর সূক্ষ্ম অতি আণুবিক্ষণীক জগতেও।

এক সেন্টিমিটারের এক মিলিয়নের এক ভাগকে কেউ সত্যিকার অর্থে কল্পনা করতে পারে না। যদিও মিলিয়নের ব্যাপারটা মানুষ বাজেট বা আদমশুমারীর জন্য

আন্দাজ করতে পারে। তাই এক সেন্টিমিটারে প্রায় এক মিলিয়ন ভাইরাসকে রাখা যায় একথাটা কিছুটা হলেও বোঝা যায়।

কিন্তু এক সেন্টিমিটারের মিলিয়ন ভাগের মিলিয়ন ভাগ। এটা একটা ইলেকট্রনের আকারের সমান এবং মানুষের দৃষ্টি সীমার বহু নীচে। বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কিছুটা হয়তো বোঝা যায়, তবে মন দিয়ে এতোটুকুও নয়।

আর মহাবিশ্বে কাঠামোর ঘটনাগুলোর মাত্রা এর চাইতেও অবিশ্বাস্য রকমের ছোট। এতোই ছোট যে তার তুলনায় পিঁপড়া বা হাতির মাপ একই রকম হবে। যদি কেউ এটাকে ফোমের মতো বুদ্বুদ ভাবে (যদিও এটা পুরোটাই বিভ্রান্তিকর তবুও সত্যের জন্য প্রথম প্রথম এমনটাই ভাবা যাক) তাহলে সেই বুদ্বুদগুলো....

এক সেন্টিমিটারের... মিলিয়নের মিলিয়নের মিলিয়নের সহস্র ভাগের এক ভাগ।

এখন চিন্তা করা যাক যে, সেগুলো ক্রমাগত বড় হচ্ছে আর আনবিক বোমার মতো শক্তি বিচ্ছুরণ করছে এবং সেই শক্তিই আবার পুনঃ শোষণ করছে, আবার বের করে দিচ্ছে এবং এভাবে প্রক্রিয়াটা চলতেই থাকছে।

খুব মোটা দাগে ধরলে এটাই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগের পদার্থবিদরা মহাবিশ্বের মৌলিক কাঠামো বলে ধরে নিয়েছিলেন। তবে এই আভ্যন্তরীন শক্তিকে বের করেই সঙ্গে সঙ্গে বেধে ফেলাটা এক কথায় বলা যায় কিম্ভুত।

তাই এক প্রজন্মের আগেই আণবিক কণার মধ্য দিয়ে এই নতুন পাওয়া শক্তিকে ব্যবহারের চিন্তা করা হল। "কোয়ান্টাম তারতম্য" যার ভেতর মহাবিশ্বের শক্তি লুকিয়ে আছে, তাকে কাজে লাগানো অবশ্যই উঁচুমাত্রায় দুঃসাধ্য কাজ। অবশ্য সাফল্যের পুরস্কারটাও বিরাট।

অন্যসব কিছু বাদ দিলেও, এটা মানবজাতিকে মহাবিশ্বে স্বাধীনতা দেবে। একটা মহাকাশযান–তাত্ত্বিকভাবে অন্তহীনভাবে গতিবেগ বাড়াতে পারবে, যেহেতু নতুন কোন জ্বালানীর দরকার হবে না। বাস্তব সমস্যাটা অবশ্য যেটা এখানে হবে, অদ্ভুত হলেও প্রথম আকাশযানের মতোই। পারিপার্শ্বিক বাধা–মহাশূন্যে যে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো আছে তাই আলোর গতির চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত যাবার আগে সমস্যা করবে।

২৫০০ সালের পর যে কোন সময়ই কোয়ান্টাম ড্রাইভ সম্ভব ছিল। আর তা হলে হয়তো মানব জাতির ইতিহাসও অন্যরকম হতো। যেভাবে আগেও বহুবার এলোমেলো পদক্ষেপে বিজ্ঞান এগিয়েছে, দূর্ভাগ্যজনকভাবে এবারও ত্রুটিপূর্ণ পর্যবেক্ষণ আর অসংখ্য তত্ত্ব আসল সত্যটিকে প্রায় হাজার বছর পিছিয়ে দিল।

শেষের দিকের শতাব্দীগুলোতে অনেক প্রতিভার জন্ম হলেও অধিকাংশই ছিল ক্ষয়িষ্ণু আর মৌলিক জ্ঞান ছিল খুবই কম। তাছাড়া বিশাল ব্যর্থতার ইতিহাসের কারণে সবাই ধরে নিয়েছিল, মহাবিশ্বের শক্তি ধরার চেষ্টা অযৌক্তিক বিরক্তিকর–যা কিনা তত্ত্বীয় ভাবেই সম্ভব নয়, বাস্তবে তো দূরের কথা। যদিও তত্ত্বীয়ভাবে এটা অসম্ভব প্রমানিত হয়নি, এবং সন্দেহাতীতভাবে তা না হলে আশা কিছুটা থেকেই যায়।

পৃথিবী ধ্বংসের মাত্র দেড়শ বছর আগে ল্যাগরেনজ-১ মধ্যাকর্ষণবিহীন গবেষণা উপগ্রহের বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন যে তারা এতোদিনে খুঁজে পেয়েছেন যে, কেন মহাবিশ্বের শক্তি বাস্তব হলেও বাস্তবে ব্যবহার করা যাবে না। বিজ্ঞানের অস্পষ্ট একটা কোনাকে এভাবে গিট্টু দেয়ার ঘোষণার প্রতি অবশ্য কারও বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

এক বছর পর ল্যাগরেনজ-১ থেকে বিব্রত একটা গলা খাঁকরী শোনা গেল। ঐ প্রমাণে ছোট্ট একটা ভুল পাওয়া গেছে। এরকম অবশ্য অতীতেও কয়েকবার হয়েছে, তবে কখনোই এতো সঠিক মুহূর্তে নয়। একটা বিয়োগচিহ্ন যোগচিহ্ন হয়ে গেল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বই বদলে গেল। নক্ষত্রের দিকের রাস্তা খুলে গেল মধ্যরাতের ঠিক পাঁচ মিনিট আগে।

দক্ষিণ দ্বীপ

১০. প্রথম পরিচয়

মোজেস ক্যালডর নিজেকেই বলল, বোধহয় আমার আর একটু আস্তে খবরটা ভাঙ্গা উচিত ছিল। এরা সবাই স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু এটাই ভালো হবে, যদিও এরা প্রযুক্তির দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে (গাড়ীটার অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়)। তবু তারা এটুকু অন্ততঃ বুঝবে প্রযুক্তির কি যাদু আমাদের পৃথিবী থেকে থ্যালসায় এনেছে। তারা প্রথমে আশ্চর্য হবে যে, কিভাবে আমরা এটা করেছি, এবং তারা অবাক হবে এই ভেবে, কেন?

সত্যিকার অর্থেই মেয়রের মনে এটাই ছিল প্রথম প্রশ্ন। ছোট্ট যানটার এই দুইজন মানুষ নিশ্চয়ই ভ্যানগার্ড। কক্ষপথে নিশ্চয়ই এদের হাজার এমনকি মিলিয়নও থাকতে পারে। আর থ্যালসার জনসংখ্যা কঠিন নিয়মের কারণেই আসলে পরিবেশ ভারসাম্যের নব্বই ভাগই ব্যবহার করে বসে আছে...

দুজনের মধ্যে বয়স্ক জন বললেন,

–আমি মোজেস ক্যালডর। আর ইনি হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার লোরেন লোরেনসন, অ্যাসিসট্যান্ট চীফ ইঞ্জিনিয়ার–মহাকাশযান ম্যাগেলান। আমরা এই বাবল স্যুট পরার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। এটা আমাদের পারস্পরিক সংক্রমণ হতে বাঁচার জন্যই করা হয়েছে। আমরা বন্ধুত্ব নিয়ে আসলেও আমাদের ব্যাকটেরিয়া সেরকম নাও ভাবতে পারে।

মেয়র নিজেকেই বললেন, কি চমৎকার কণ্ঠস্বর। পৃথিবী ধ্বংসের কয়েক দশক আগে এটাই ছিল পৃথিবীতে সব চাইতে পরিচিত কণ্ঠস্বর। যা মিলিয়ন মানুষকে কখনো শান্ত, কখনো খেপিয়ে তুলেছে।

মেয়রের চঞ্চল চোখ অবশ্যই মোজেস ক্যালডরের ওপর বেশীক্ষণ থাকল না। নিশ্চয়ই তার বয়স ষাট। আর মেয়রের তুলনায় সেটা একটু বেশীই। অপেক্ষাকৃত তরুণ ব্যক্তিটি বরং অনেক আকর্ষণীয়। তবে ঐ ফ্যাকাসে চামড়া সে কখনো সহ্য করতে পারবে কিনা সন্দেহ। লোরেন লোরেনসন (কি চমৎকার নাম!) দুই মিটারের মতো লম্বা, এবং তার চুল প্রায় রূপার মতো ব্লন্ড। সে অবশ্য অতটা বড় কাঠামোর নয়, যেমন ব্র্যান্ট–তবে অবশ্যই অনেক বেশী সুদর্শন।

মেয়র নারী পুরুষ উভয় ক্ষেত্রে বেশ ভালো বিচারক। সে লোরেনসনকে খুব দ্রুত ছকে ফেলে দিল। এর মধ্যে আছে বুদ্ধিমত্তা, একাগ্রতা এবং নিষ্ঠুরতাও। সে

তাকে শত্রু হিসেবে পেতে কখনো আগ্রহী হবে না। তবে বন্ধু হিসেবে পেতে সে আগ্রহীই হবে অথবা আরও

একই সঙ্গে তার এবিষয়েও সন্দেহ নেই যে ক্যালডর একজন চমৎকার ব্যক্তি। তার চেহারা এবং স্বরে খুব সহজেই প্রজ্ঞা, স্থৈর্য্য এবং এক প্রগাঢ় দুঃখ মিশে আছে। কিছুটা অবাক করা হলেও এই দুঃখের ছায়ার নীচেই তার বাকী জীবনটা কাটাতে হবে।

অভ্যর্থনা কমিটির বাকী সবাই নিজেদের পরিচিত করাল। ব্র্যান্ট বিশাল ভদ্রতা দেখানোর পর সোজা বিমানটার কাছে গিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

লোরেন তাকে অনুসরণ করল। একজন সতীর্থ ইঞ্জিনিয়ারকে পেয়ে সে তার কাছ থেকে থ্যালসানদের প্রতিক্রিয়াটা দেখতে চাইল। সে ঠিকই অনুমান করেছিল যে, ব্র্যান্টের প্রথম প্রশ্ন কি হতে পারে। অবশ্য ব্র্যান্ট ভারসাম্য রক্ষা করেছিল।

–এটার উড্ডয়ন ব্যবস্থাটা কি? এর জেটের ফুটোগুলো অদ্ভুত রকমের ছোট। সত্যিই কি এরা এতোটা ছোট?

এটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ। প্রথমে যতটা প্রাযুক্তিক দিক থেকে আদিম মনে হয়েছিল এরা ততটা নয়। তবে সে যে উঁচু ধারণা করেছে তা একে দেখানোর প্রয়োজন নেই। বরং উল্টো আঘাত করেই তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বোঝানো যাক।

–এটা একটা কোয়ান্টাম র‍্যামজেট। বাতাসে চলার জন্য তৈরী। যা তরল বাতাসকেই জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে। প্ল্যাংকের সূত্র থেকে তুমি নিশ্চয়ই জান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি থ্রি সেন্টিমিটার ব্যাপারটা। তাই আশেপাশে বাতাস থাকলে এটা অন্তহীন ভাবে যেতে পারে।

তাকে আবারও ব্র্যান্টকে কৃতিত্ব দিতে হবে। সে চোখ পিটপিট করে কোনভাবে বলল, দারুণ তো! যদি সে সত্যিই তাই মনে করে।

–আমি কি ভেতরে যেতে পারি।

লোরেন ইতস্ততঃ করল। আপত্তি করাটা অভদ্রতা যেহেতু এরা বন্ধুত্ব করতে অত্যন্ত আগ্রহী। তার চেয়ে বড় কথা হলো, এটা প্রমাণ করবে যে, কে এখানে আসলে প্রভুত্বপরায়ন।

–অবশ্যই। তবে কোন কিছু স্পর্শ করার ব্যাপারে সাবধান থেকো। ব্র্যান্ট অবশ্য "প্লিজ" শব্দটা শোনার চাইতে ভেতরটা দেখার জন্যই বেশী উৎসাহী। লোরেন মহাশূন্যবিমানের ছোট্ট বাতাস নিরোধক জায়গায় নিয়ে গেল। সেখানে মাত্র দু'জনের থাকার মতো জায়গা। আর ব্র্যান্টকে বাড়তি বাবল স্যুট পরাতে রীতিমত জটিল জিমন্যাস্টিক করা লাগল।

–আমার মনে হয় না এটা বেশীদিন লাগবে। কিন্তু আণুবীক্ষণীক পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এটা পরব। জীবানুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে

রাখবে। ব্র্যান্ট হালকা গোলাপী রঙ দেখেছিল আর সেখানে গ্যাসের হিসহিস আওয়াজ শোনা গেল। তার পর ভেতরের দরজা খুলে গেল তারা ভেতরের রুমে ঢুকল। পাশাপাশি বসলেও, শক্ত স্বচ্ছ আবরণটা তাদের নাড়াচাড়া অনেকটা সঙ্কুচিত করেছে। এটা তাদের এমনভাবে আলাদা করেছে যেন তারা দুই বিশ্বের, অবশ্য অনেক অর্থেই তারা তাই।

লোরেনকে স্বীকার করতেই হবে যে, ব্র্যান্ট একজন ভালো শিক্ষার্থী। কয়েক ঘন্টা সময় দিলেই সে এই যন্ত্রটা চালাতে পারবে। অবশ্য এর ভেতরে তত্ত্বটা হজম করার শক্তি তার কখনোই হবে না। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রচলিত কথাই হলো যে, মাত্র কয়েকজন মানুষই সত্যিকার অর্থে সুপারস্পেসের জিওডাইনামিক্স বুঝত এবং তার সবাই শতাব্দীরও আগে মারা গেছে।

তারা প্রাযুক্তিক আলোচনায় এতো মগ্ন হয়ে গিয়েছিল যে, বাইরের বিশ্ব সম্বন্ধে ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ একটা চিন্তিত কণ্ঠ কন্ট্রোল প্যানেল থেকে ভেসে এল,

–লোরেন? মহাকাশযান থেকে বলছি। কি হয়েছে? আধ ঘন্টা হল তোমাদের কোন খবর নেই? লোরেন অলসভাবে সুইচের দিকে হাত বাড়াল,

–তোমরা যেখানে দুটো ভিডিও আর পাঁচটা অডিও চ্যানেলে আমাদের দেখছ সেখানে এটা একটু বেশী বলা হল না? সে আশা করল ব্র্যান্ট তার মমার্থটা বুঝবে। আমরা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখেছি এবং আমরা নিশ্চিত না হয়ে কিছু করি না।

–মোজসকে দিলাম। সেই কথাবার্তা চালাচ্ছে বরাবরের মতো।

বাঁকা জানালা দিয়ে তারা দেখতে পাচ্ছিল যে ক্যালডর আর মেয়র একান্ত আলাপে মগ্ন, আর কাউন্সিলর সিমন্স মাঝে মাঝে তাতে যোগ দিচ্ছে। লোরেন একটা সুইচ চালাতেই তাদের কণ্ঠস্বর বেড়ে গিয়ে কেবিন ভরে ফেলল।

–আমাদের আতিথেয়তা। কিন্তু আপনি বুঝবেন যে জমির দিক থেকে চিন্তা করলে এটা একটা অসম্ভব ছোট বিশ্ব। আপনার জাহাজে কতজন আছে যেন বলেছিলেন।

–ম্যাডাম মেয়র, আমি কোন সংখ্যা বলেছি বলে তো মনে পড়ে না। থ্যালসা খুব সুন্দর হলেও আমাদের খুব অল্প লোকই এখানে নামবে। আমি তোমাদের ব্যাপারটা বুঝি। কিন্তু সামান্যতম সংকোচের কোন কারণ নেই। সবকিছু ভালোভাবে চললে এক বা দুই বছরের মধ্যে আমরা আবার রওয়ানা দেব।

আমরা বেড়াতে আসিনি।·আমরা কাউকে এখানে আশাই করিনি। আর আলোর অর্ধেক গতিতে চলা কোন মহাকাশযান খুব ভালো কারণ না হলে এমনি এমনি থামবে না। তোমাদের এমন কিছু আছে যা আমাদের দরকার এবং তোমাদের দেয়ার মতো কিছু আমাদেরও আছে।

–যেমন, যদি কিছু মনে না করেন?

–আমাদের কাছ থেকে তোমরা যদি চাও শিল্প আর বিজ্ঞানের শেষ শতাব্দীর আবিষ্কার নিতে পার। অবশ্যই আমি তোমাদের সাবধান করব, তোমাদের

সংস্কৃতিতে আমাদের উপহার কি প্রভাব ফেলবে সে ব্যাপারে সতর্ক থেক। আমরা যা দেব তার সবই নেয়াটা ঠিক হবে না।

–আমি আপনাদের সততা ও উপলব্ধির প্রশংসা করছি। আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই অমূল্য সম্পদ আছে। কিন্তু বিনিময়ে আমরা কি দেব?

ক্যালডর অট্টহাসি দিলেন।

–সৌভাগ্যবশত, সেটা কোন সমস্যা না। এমনকি আমরা না বলে নিলেও তোমাদের চোখে পড়ত না।

থ্যালসা থেকে আমরা যা চাই তা হচ্ছে কয়েক হাজার টন পানি। আর ঠিক ভাবে বলতে –বরফ।

১১. দূত

থ্যালসার প্রেসিডেন্ট মাত্র দু'মাসের জন্য তার অফিসে এসেছেন এবং এখনও তার দূর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ করেন। কিন্তু তার কিছু করার নেই, কেবলমাত্র তিন বছরের একটা খারাপ চাকরীকেই ভালো মতো করে যাওয়া ছাড়া। আবার গণনা করতে বলে কোনো লাভ নেই। বাছাই প্রোগ্রাম যেটা প্রজন্ম আর হাজার অক্ষরের সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল তাকে মানুষের নিখাদ ভাগ্য বলেই মানতে হয়।

প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ (বিশটা রুম, একটা একশ জনকে বসানোর মতো বড়) থেকে বেরিয়ে যাবার ঠিক পাঁচটা পথ আছে। তোমাকে হয় তিরিশের নীচে বা সত্তরের ওপরে হতে হবে, তোমাকে নিরাময় অযোগ্য অসুস্থ হতে হবে, তুমি মানসিক রোগগ্রস্ত হতে পার কিংবা গুরুতর কোন অপরাধ করতে পার। প্রেসিডেন্ট এডগার ফারাদীনের সামনে শেষ পথটাই খোলা এবং সে সেটা নিয়ে গভীর ভাবেই ভাবছে। তার ব্যক্তিগত ক্ষতি করলেও সে অবশ্যই স্বীকার করে যে, মানবজাতির জন্য এই সরকারটিই সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ।

মাতৃগ্রহ প্রায় দশ হাজার বছর সময় লাগিয়েছে এই ব্যবস্থাটা গড়তে এবং তাও বহুবার চেষ্টা ও বীভৎস ভুলের মাধ্যমে।

যখন সমগ্র জনসংখ্যা এর সর্বোচ্চ (অনেক সময় আরও বেশী) জ্ঞান দ্বারা সিঞ্চিত হয়, প্রকৃত গণতন্ত্র তখনই সম্ভব। আর চূড়ান্ত রূপটি হল সেন্ট্রাল কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রত্যেকের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ। ঐতিহাসিকদের মতে ২০১১ সালে প্রথম সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নিউজিল্যান্ড নামের এক দেশে।

এরপর থেকে একজন রাষ্ট্রপ্রধাণ পছন্দ করা অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। যখন সবাই একমত হল যে, ঐ পদটির প্রতি সক্রিয় চেষ্টাই হবে অযোগ্যতা, তখন থেকে সব পদ্ধতিই সমান। তবে লটারী হল সবচে সহজ পদ্ধতি।

কেবিনেট সেক্রেটারী বললেন,

–মি. প্রেসিডেন্ট। অতিথিরা লাইব্রেরীতে অপেক্ষা করছে।

–ধন্যবাদ লিজা। বাবল স্যুট ছাড়াই।

–হ্যাঁ সব ডাক্তারী বিদ্যাই সে কথা বলছে, এটা সম্পূর্ণ নিরাপদ–তবে স্যার আমি আপনাকে সাবধান করছি। তাদের গায়ে সামান্য গন্ধ আছে।

–ক্র্যাকান! কি ভাবে?

সেক্রেটারী হাসল,

–দুর্গন্ধ নয়। অন্তত আমার মনে হয়নি। নিশ্চয়ই এটা তাদের খাবারের সঙ্গে জড়িত। হাজার বছরে আমাদের রায়োকেমিস্ট্রি নিশ্চয়ই কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। "অ্যারোমেটিক" বললে এটা ঠিকভাবে হয়তো বোঝানো যায়।

প্রেসিডেন্ট অবশ্য ঠিকভাবে ব্যাপারটা বুঝলেন না বরং একটা বিব্রতকর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন কিনা চিন্তা করলেন।

–আমাদের গন্ধ তাদের কাছে কি রকম লাগবে বলে তুমি মনে কর?

তার পাঁচজন অতিথি অবশ্য একে একে পরিচিত হবার সময় কেউই নাসিকা কুঞ্চিত করল না। তবে তার সেক্রেটারী এলিজাবেথ ইশিহিয়া বেশ বুদ্ধিমান। কারণ তিনি এখন "অ্যারোমেটিক" কথাটার আসল অর্থ ধরতে পেরেছেন।

অশ্ব খুরাকৃতি টেবিলে বসে থ্যালসার প্রেসিডেন্ট নিজেকে সুযোগ আর ভাগ্যের মধ্যে হাবুডুবু খেতে দেখলেন, যা নিয়ে তিনি অতীতে খুব একটা ভাবেননি। সুযোগ তাকে আজ এখানে এনেছে। এখন তার সঙ্গী ভাগ্য আবার আঘাত হেনেছে। কি অদ্ভুত, খেলার সামগ্রী তৈরীকারক, উচ্চাভিলাষহীন একজন লোক, এই ঐতিহাসিক মিটিং-এ বসেছে। তবে কাউকে তো এটা করতেই হবে এবং সে এর মধ্যেই এটা উপভোগ করতে আরম্ভ করেছে। অন্ততঃপক্ষে তার স্বাগত বক্তব্য দেয়া কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

বক্তব্য বেশ ভালোই হয়েছিল। তবে কিনা এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্যও কিছুটা বড়। অবশ্য শেষ দিকে তিনি বুঝতে পারছিলেন যে অতিথিদের নম্র মনোযোগ আস্তে আস্তে তুচ্ছ জিনিসে চলে যাচ্ছে। তাই তিনি শেষ দিকে কিছু উৎপাদন উপাত্ত আর দক্ষিন দ্বীপের নতুন পাওয়ার গ্রীডের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে দিলেন। তিনি বসে পড়ে এটুকু নিশ্চিত হলেন যে একটা উদ্যমী, বর্ধনশীল উঁচু প্রযুক্তিসম্পন্ন সমাজের ছবি আঁকা গেছে। থ্যালসা পিছিয়ে বা নীচুতে নেই। এর আছে প্রাচীন প্রজন্মের রেখে যাওয়া সর্বোচ্চ রীতিনীতি।

–ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট। একটু থেমে ক্যাপ্টেন বললেন, থ্যালসা যে বেঁচেই নেই বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা অবশ্যই চমৎকার বিস্ময়। এটা আমাদের এখানে অবস্থান আরও মধুর করেছে। এবং আমরা আশা করি যাবার সময়ও আমাদের দু'পক্ষের ভেতর সদিচ্ছা ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

–আমাকে ক্ষমা করবেন, একটা প্রশ্ন তোলা খুব রূঢ় মনে হতে পারে। তবু বলছি, কতদিন আপনারা থাকবেন এখানে? আমরা দ্রুতই জানতে চাই। কারণ তাহলে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারব।

–আমি বুঝতে পেরেছি মি. প্রেসিডেন্ট। কিন্তু এখনই আমরা নিশ্চিত হতে পারব না। কারণ আপনি কতজন সাহায্যকারী দিতে পারবেন তার ওপরও এটা নির্ভর করবে। আমার মনে হয় কমপক্ষে এক বছর, দুই বছরও হতে পারে।

এডগার ফারাদীন, অন্যান্য ল্যাসানদের মতোই তার আবেগ লুকাতে দক্ষ নয়। ক্যাপ্টেন বে প্রধাণ নির্বাহীর মুখের ওপর দিয়ে সমর্থন সূচক বা ধূর্ত বললেও হয়, ভাবটা যাওয়াতে চমকে উঠলেন।

–মহামাণ্য, মনে হয় আমরা কোন সমস্যা করিনি।

হাত ঘষতে ঘষতে সে বলল,

–আমাদের দেশে, আপনারা হয়তো জানেন না, আমাদের ২০০ তম অলিম্পিক আগামী দুবছর পর। যুবক অবস্থায় ১০০০ মিটারে আমি ব্রোঞ্জ পেয়েছিলাম। বাইরে থেকে আমরা কিছু প্রতিযোগী আনতে পারি।

কেবিনেট সেক্রেটারী বললেন,

–মি. প্রেসিডেন্ট। আমার মনে হয়, এরকম কোন নিয়ম–

–সেটা আমি বানাব। প্রেসিডেন্ট দৃঢ় স্বরে বললেন, ক্যাপ্টেন আমাদের আমন্ত্রণ অথবা আপনি মনে করলে প্রতিযোগিতা মনে রাখবেন।

ম্যাগেলানের কমান্ডার সব সময় দ্রুত আলোচনা সারতেই অভ্যস্ত। কিন্তু এবার হঠাৎ করেই তিনি থমকে গেলেন। আর এই ফাঁকে প্রধান চিকিৎসক ঢুকে পড়লেন।

সার্জন কমান্ডার মেরী নিউটন বললেন,

–সেটা অবশ্যই আপনার অসীম দয়া, মি. প্রেসিডেন্ট। তবে একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি বলছি যে আমাদের সবার বয়স তিরিশের ওপর। আমরা সবাই ট্রেনিং এর বাইরে। এছাড়া থ্যালসার মধ্যাকর্ষণ ছয় পার্সেন্ট বেশী পৃথিবীর চাইতে। তাই এগুলোর সবগুলোই আমাদের বিপক্ষে। তাই যদি অলিম্পিকে দাবা অথবা কার্ড ঢোকানো... প্রেসিডেন্টকে হতাশ দেখাল। অবশ্য দ্রুত তিনি সেটা কাটিয়ে উঠলেন।

–ঠিক আছে। তবে ক্যাপ্টেন বে, আপনাকে পুরস্কার বিতরণীর সময় থাকতেই হবে।

–আনন্দের সঙ্গে। সামান্য হতবুদ্ধি কমান্ডার বললেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, মিটিংটা তার হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং এখনই আলোচ্যসূচীতে ফিরতে হবে।

–মি. প্রেসিডেন্ট আমাদের এখানকার করণীয় সম্বন্ধে আমি কি ব্যাখ্যা করতে পারি?

–নিশ্চয়ই, কিছুটা নিরাসক্ত উত্তর এল। তিনি সম্ভবতঃ এখনও অন্য জগতে অবস্থান করছেন। হয়তো তিনি এখনও তার যৌবনের জয়কে ভাবছেন। তারপর অনেক চেষ্টায় তিনি বর্তমানে মনোযোগ দিলেন। –আমরা আপনাদের আসায় সত্যি খুশী, আর স্তম্ভিত। এখানে খুব সামান্যই আছে যা আপনাদের দেয়া যায়। আমাকে বলা হয়েছে বরফের কথা, নিশ্চয়ই সেটা রসিকতা।

–না, মি. প্রেসিডেন্ট। আমরা অবশ্যই সিরিয়াস। ওটাই আমরা চাই। আমরা কিছু খাবারের নমুনাও নিয়েছি। বিশেষত দুপুরের খাবারের চীজ আর ওয়াইনের

ব্যাপারে বলা যায় যে, আমরা হয়তো এর চাহিদা বাড়াব। তবে বরফ অবশ্যই। আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন। প্রথম দৃশ্য প্লিজ।

মহাকাশযান ম্যাগেলান–দুই মিটার লম্বা, প্রেসিডেন্টের সামনে ভাসছে। দেখার মতো কেউ না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই ছবিটা ধরে দেখার চেষ্টা করতেন।

–আপনারা দেখছেন যে আমাদের মহাকাশযানটি উপবৃত্তাকার। চার কিলোমিটার লম্বা, এক কিলোমিটার চওড়া। যেহেতু আমরা মহাশূণ্য দিয়েই জ্বালানী সংগ্রহ করি, সেহেতু আমাদের গতির সীমা তত্ত্বীয় ভাবে আলোর সমান পর্যন্ত। কিন্তু বাস্তবে এর এক পঞ্চমাংশেই, আন্তঃনাক্ষত্রিক ধুলা আর গ্যাসের জন্য সমস্যার সম্মুখীন হই। এবং সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বা তার চাইতে বেশী গতিসম্পন্ন কোন বস্তুর জন্য কোন বস্তুকে আঘাত করা একটা ভয়ংকর ব্যাপার। এমন কি এই গতিতে একটা হাইড্রোজেন পরমাণুও যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে।

তাই আদিম মহাকাশযানগুলোর মতো ম্যাগেলানও একটা রক্ষাবর্ম তার সামনে রাখে। যে কোন পদার্থই যথেষ্ঠ পরিমানে হলে এই কাজ করতে পারে। এবং প্রায় শূণ্য ডিগ্রী তাপমাত্রায় বরফের চাইতে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। সস্তা, সহজ আর বিস্ময়কর রকমের শক্ত। সামনের গোলাকার জিনিসটা আমাদের ছোট্ট হিমবাহ যখন আমরা সৌরজগত ছাড়ি; দশ বছর আগে। আর এটা হচ্ছে এখনকার রূপ। ছবিটা ঝাপসা হল, তারপর আবার ফিরে এল। জাহাজটা অপরিবর্তিত হলেও সামনের ভাসমান জিনিসটা পাতলা হয়ে গেছে।

এটা হচ্ছে গ্যালাক্সীর এই ময়লা অংশ দিয়ে পঞ্চাশ আলোকবর্ষ চলার ফল। আমাদের হিসেবের চাইতে ক্ষয়ের পরিমাণ শতকরা পাঁচ ভাগের মতো বেশী। তবে সেটা কোন বিপদ নয়। অবশ্য সত্যিকারের বড় কিছুর সঙ্গে আঘাতের সম্ভাবনা থেকেই যায়। আর সেক্ষেত্রে কোন আবরণই সেটা থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। সেটা বরফেরই হোক আর স্টীলেরই হোক।

আমরা ভালোভাবেই আরও দশ আলোকবর্ষ পেরুতে পারতাম। কিন্তু সেটা যথেষ্ঠ নয়। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সাগান-২ গ্রহ, পচাত্তর আলোকবর্ষ দূরে।

সুতরাং মি. প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন, কেন আমরা থ্যালসায় থেমেছি। তাই আমরা আপনাদের কাছে ধার হিসেবে, আসলে সাহায্য হিসেবেই বলা ভালো, যেহেতু আমরা ফেরত দিতে পারব না, কয়েক হাজার টনের মতো পানি চাচ্ছি। আমাদের উপরের কক্ষপথেই আরেকটা বরফের বর্ম তৈরী করতে হবে, যেটা আমাদের নক্ষত্রের পথটা পরিষ্কার করে দেবে।

–আমরা কিভাবে আপনাদের সাহায্য করব? প্রযুক্তির দিক থেকে তো আপনারা শত শত বছর এগিয়ে।

–আমার সন্দেহ আছে। অবশ্য কোয়ান্টাম ড্রাইভ ছাড়া। আমাদের ডেপুটি ক্যাপ্টেন ম্যালিনা আমাদের বিবেচনার জন্য পরিকল্পনাটা পেশ করবে।

–নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

–প্রথমে আমাদের বরফ কলের জায়গাটা ঠিক করতে হবে। অনেক জায়গাতেই সেটা হাতে পারে–উপকূলের যে কোন আলাদা জায়গায় এটা হতে পারে। এটা পরিবেশের ওপর বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া ফেলবে না। আর যদি আপনারা চান, তাহলে আমরা এটাকে পূর্ব দ্বীপেও বানাতে পারি। আশা করি ক্র্যাকান কাজ শেষ হবার আগেই জেগে উঠবে না।

কলের পরিকল্পনা পুরোটাই করা আছে। কেবল বসানোর জায়গা হিসেবে একটু এদিক ওদিক করতে হবে। অধিকাংশ মূল যন্ত্রগুলো সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ করতে পারবে। এটা খুব সহজ সরল প্রক্রিয়া। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রযুক্তি –পাম্প, শীতল অংশ, উষ্ণতা বিনিময়, ক্রেন সবই।

সব কিছু ঠিক থাকলে নব্বই দিনের মধ্যেই আমরা প্রথম বরফ পাব। আমরা প্রমাণ সাইজ ব্লক তৈরী করব। প্রতিটি দশ টনের সমতল, ছ'কোনা পাত। উৎপাদন আরম্ভ হলে আমরা প্রতিদিন এই তুষারচাকগুলো উপরে নিয়ে যাব। সেখানে কক্ষপথে সেগুলো জুড়ে বর্মটা তৈরী হবে। প্রথম ওঠানো থেকে শেষ তৈরী পর্যন্ত দু'শ পঞ্চাশ দিনের মতো লাগবে। এবং এর পর আমরা যাত্রার জন্য তৈরী হয়ে যাব। ডেপুটি ক্যাপ্টেন যখন শেষ করলেন প্রেসিডেন্ট ফারাদিন এক মুহূর্ত থমকে রইলেন, তারপর প্রায় নিমগ্ন স্বরে বললেন।

–বরফ আমি কখনো দেখিনি, ওই পানীয়ের তলানীতে ছাড়া।

হ্যান্ডসেক করে অতিথিদের বিদায় দেবার সময় প্রেসিডেন্ট ফারাদীন অবাক হয়ে উপলব্ধি করলেন যে অ্যারোমেটিক গন্ধটা তেমন পাওয়া যাচ্ছে না।

তিনি কি ওটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন না গন্ধ শোঁকার শক্তি তার হারিয়ে গেছে? দুটোই অবশ্য ঠিক ছিল। তবে মাঝরাতের দিকে তিনি দ্বিতীয়টাকেই স্বীকার করে নিলেন। তিনি উঠে বুঝলেন তার চোখ জ্বলছে আর নাক এতো বন্ধ যে নিঃশ্বাস নেয়াই প্রায় দুঃসাধ্য।

–কি হয়েছে! মিসেস প্রেসিডেন্ট শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন। প্রধান নির্বাহী বললেন,

–ডাক্তার ডাক। হ্যাচ্ছো! আমাদের আর মহাকাশযানের কাউকে। তারা কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে আমি তাদের –হ্যাচ্ছো–কিছু বলতে চাই। তোমারও হয়নি বলে আশা করি।

প্রেসিডেন্ট পত্নী তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে কিছু হয়নি–অবশ্য নাক মুছতে মুছতে। তারা অসন্তুষ্ট ভাবে বিছানায় দু'জন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

প্রেসিডেন্ট বললেন,

–আশা করি সাত দিনের মধ্যেই এটা সারবে। তবে শেষ শতাব্দীতে চিকিৎসা নিশ্চয়ই কিছু এগিয়েছে।

তার আশা কিছুটা হলেও পূর্ণ হলো। বীরত্বপূর্ণ চেষ্টায়, কোন জীবনহানি না ঘটিয়েই সংক্রমনটি শেষ হয়ে গেল, দুটি বিরক্তিকর দিন পর। হাজার বছর ধরে বিচ্ছিন্ন দুই ভাইয়ের মধ্যেকার সাক্ষাতের জন্য অবশ্য এটা কোন শুভসূচনা নয়।

১২. উত্তরাধিকার

ইভলিন: এখানে আমরা প্রায় দু'সপ্তাহ। থ্যালসার হিসাবে মাত্র এগারো দিন। অবশ্য আজ বা কাল আমাদের পুরোনো বর্ষপঞ্জী ফেলে দিতেই হবে। কিন্তু আমার হৃদয় ঐ প্রাচীন পৃথিবীর ছন্দেই চলবে।

বেশ ব্যস্ত এবং আনন্দদায়ক সময় গেল। স্বাস্থ্যগত অবশ্য একটা সমস্যা হয়েছিল। আলাদা করে রাখা সত্ত্বেও ল্যাসানদের প্রায় বিশভাগই কোন একটা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এবং আমাদের কারও কোন লক্ষণ না দেখায় আমরা আরও দোষী হয়ে গেছি। ভাগ্যিস কেউ মরে যায়নি। তার জন্য স্থানীয় ডাক্তারদের কোন কৃতিত্ব দেয়া যায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞান এখানে অনেক পিছিয়ে। তারা আগেকার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ওপর এতো নির্ভরশীল যে নতুন কিছুই তারা সামলাতে পারে না।

অবশ্য আমাদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতেই দেখা হয়েছে। ল্যাসানরা খুব ভালো মানুষ, আমুদে জাতি। তারা ভাগ্যবান–বেশীই ভাগ্যবান। বিশেষত তাদের গ্রহের ব্যাপারে। আর এটা সাগান-২ কে আরও বেশী মলিন করে দিয়েছে।

জমির স্বল্পতাই তাদের মূল সমস্যা। অবশ্য তারা বুদ্ধিমানের মতো সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যার নীচেই জনসংখ্যা স্থির রেখেছে। তারা এটাকে কখনো বাড়াতে চাইলে পৃথিবীর শহরগুলোর অতীত ইতিহাসের সতর্ক সংকেত পেয়ে যাবে।

তারা এতোই ভালো আর চমৎকার যে, তাদের সংস্কৃতি নিজস্ব প্রক্রিয়ায় উন্নত হবার চাইতে আমাদের সাহায্য করতে ইচ্ছা করে। সত্যিকার অর্থে তারা তো আমাদেরই সন্তান। তবে সব বাবা মাকেই এটা মানতে হয় যে, আজ অথবা কাল তাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতেই হবে।

অবশ্য আমাদের উপস্থিতিটাই কিছু প্রভাব ফেলেছে। আমরা অপ্রত্যাশিত, তবে অনাহুত নই এই গ্রহে। আর তারা কখনোই ভোলে না যে, ম্যাগেলান ঠিক তাদের মাথার ওপর ঘুরছে। পৃথিবীর শেষ চিহ্ন।

আমি প্রথম অবতরণের জায়গায় আবার গিয়েছিলাম। ওটা ওদের জন্মস্থান। আর একটা ট্যুরেও গেলাম, যেটায় প্রতিটি ল্যাসান অন্তত জীবনে একবার হলেও যায়। এটা জাদুঘর আর স্মৃতির মিশ্রণ। সম্ভবত গ্রহের একমাত্র জায়গা যেটা সমন্ধে "পবিত্র" শব্দটা ব্যবহার করা যায়।

মহাকাশযানটা এখন শূন্যগর্ভ হলেও, মনে হয় যেন এইমাত্র নেমেছে। নিশ্চুপ যন্ত্রেরা –রাসায়নিক কারখানা, তাদের রোবট সাথী সহ আর প্রথম প্রজন্মের নার্সারী স্কুল

প্রথম যুগের প্রায় কোন রেকর্ডই নেই। সম্ভবতঃ ইচ্ছাকৃত। পরিকল্পনাকারীদের সব যোগ্যতা আর সাবধানতা সত্ত্বেও নিশ্চয়ই ভুল-ত্রুটি হয়েছিল। আর সেই সব ভুল নির্মম ভাবে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। কোন রক্তমাংসের বাবা-মা না থাকাটাও একটা বিশাল মানসিক আঘাত।

তবে সেই সব ট্র্যাজেডী আর দুঃখ আজ শতাব্দীর পেছনে। সব অভিযাত্রীর কবর যেভাবে নতুন সমাজ নির্মাতারা ভুলে যায়।

এখানে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিলে ভালো হতো। থ্যালসায় নৃতত্ত্ববিদ, মনোবিজ্ঞানী আর সমাজতত্ত্ববিদদের একটা বিশাল বাহিনীর প্রয়োজনীয় রসদ আছে। আর আমার সবচে ইচ্ছা জাগে আমার কিছু গতায়ু সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে যে, আমাদের দীর্ঘ ঝগড়ার অবসান হয়েছে।

ঐশ্বরিক ভীতির কোন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই একটা যুক্তিবাদী মানব সংস্কৃতি তৈরী করা যায়। কোন সেন্সরশীপকে সমর্থন না করলেও যারা থ্যালসার আর্কাইভ তৈরী করেছিল তারা অবশ্য একটা অসাধ্য সাধন করেছে। তারা দশ হাজার বছরের ইতিহাস আর সাহিত্যকে সংশোধন করেছে। এবং তাদের চেষ্টা ফলবতী হয়েছে। আমরা যত অসুন্দরই হোক না কেন, একটা জিনিস সরাবার আগে চিন্তা করি। থ্যালসানরা মৃত ধর্মগুলোর ক্ষয়িষ্ণু উপজাত দিয়ে দূষিত হয়নি। গত সাতশ বছরে কোন নবী, নতুন কোন বিশ্বাস নিয়ে আসেনি। "ঈশ্বর" শব্দটি তাদের ভাষা থেকে মুছেই গেছে। এবং ওই শব্দ কখন আমরা ব্যবহার করতাম সেটা ভেবে তারা প্রায়ই অবাক হয়।

আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা অবশ্য একটা উদাহরণ খুব কম বলে সবসময় উল্লেখ করত। তাই এই সমাজে ধর্মের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি খুব কমই প্রমাণ করে। আমরা জানি থ্যালসানরা জেনেটিক বাছাই এর ব্যাপারে খুব সতর্ক, যাতে সামাজিক বিশৃংখলা না হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি জানি মানুষের ব্যবহারের মাত্র পনেরো ভাগ জিন নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এই অংশটাও গুরুত্বপূর্ণ। ল্যাসানরা অসহিষ্ণুতা, ঈর্ষাকাতরতা, ক্রোধ এসমস্ত অপ্রিয় জিনিস থেকে মুক্ত। এটা কি শুধুই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের ফসল?

ছাব্বিশ শতাব্দীর ধার্মিকদের প্রেরিত বীজ মহাকাশযানের ফলাফল জানতে পারলে কি খুশিই আমি হতাম। কনভেন্টের বাতি, নবীর তলোয়ার আরও কত জিনিস দেয়া সেটায়। যদি তারা সফল হয়, তাদের সাফল্য, ব্যর্থতায় ধর্মের ভূমিকা কি হবে? হয়তো যেদিন আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন আমরা প্রথম দিকের অভিযানগুলো সম্বন্ধে জানতে পারব। তবে নাস্তিকতার কারণে এদের ভাব প্রকাশ কমে গেছে। যখন কোন ল্যাসানের পায়ে কিছু পড়ে, সে তখন কথা খুঁজে

পায়না। শরীরের ভাবই যা প্রকাশ করে। একমাত্র "ক্র্যাকান" শব্দটি দিয়েই তারা সব কিছু বোঝায়। চারশ বছর আগে ক্র্যাকান পর্বতের অগ্ন্যুৎপাত তাদের মনে ছাপ রেখে গেছে। আমি মনে হয় যাবার আগে একবার ওটা দেখতে যাব।

আরও বহুমাস আছে সামনে। আমি ভয় পাচ্ছি। আমার বিপদ নয়, তবে মহাকাশযানের যদি কিছু হয়। এর মানে হল পৃথিবীর সঙ্গে আর তোমার সঙ্গেও সম্পর্কের একটা সুতো ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

১৩. টাস্ক ফোর্স

–প্রেসিডেন্ট এটা পছন্দ করবেন না, মেয়র ওয়াডের্ন বললেন, আপনাদের উত্তর দ্বীপে নেবার জন্যই তিনি মনস্থির করেছেন।

–আমি জানি, ডেপুটি ক্যাপ্টেন ম্যালিনা উত্তর দিলেন, তাকে হতাশ করতে হলো বলে, আমরাও দুঃখিত। তিনি অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন। কিন্তু উত্তর দ্বীপ খুব বেশী পার্বত্য এলাকা আর ভালো উপকূলীয় এলাকাগুলোও গড়ে উঠেছে। আর এখানকারটা একটা সম্পূর্ণ মরুময় উপকূল–সুন্দর ঢালু সৈকত। তারনা থেকে মাত্র নয় কিলোমিটার দূরে।

–ভালোই লাগছে শুনতে। কিন্তু, এটা মরুময় কি হিসাবে?

–ওটা একটা ম্যানগ্রোভ প্রজেক্ট। আমরা এখনও জানি না কেন,তবে সব গাছই মরে গেছে। কেউ ওই বিশৃংখলাকে গোছানোর চেষ্টাও করেনি। এটা দেখতে ভয়ংকর, আর জঘন্য গন্ধ।

–তাহলে এটা এখনই একটা পরিবেশগত বিপর্যয়ে আছে। তাহলে ক্যাপ্টেন আপনারা স্বাগতম। আপনারা কেবল জিনিসটার ভালোই করবেন।

–আপনাকে আমি নিশ্চিত ভাবে বলছি যে, প্ল্যান্টটা খুব চমৎকার আর তা আপনাদের পরিবেশের সামান্য বিপর্যয়ও আনবে না। আর আপনারা না চাইলে, যাবার সময় আমরা ওটা ধ্বংস করে যাব।

–ধন্যবাদ। তবে কয়েকশ টন বরফ দিয়ে প্রতিদিন আামরা কি করব তা নিয়ে আমার প্রচুর সন্দেহ আছে। আর এর মধ্যে তারনা কি সুবিধা দিতে পারে বাসস্থান, খাদ্য, পরিবহন? আমরা কিছু করতে পারলে খুশী হব। আমার মনে হয় অনেকেই কাজ করতে আসবে।

–সম্ভবতঃ একশ। আপনার আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ। তবে মনে হয় আমরা একটু অদ্ভুত অতিথি। আমাদের মহাকাশযানের সঙ্গে প্রতি ঘন্টায় যোগাযোগ রাখতে হবে। তাই আমাদের একত্রে থাকতে হবে সবসময়। আমরা খুব শিগগিরিই ছোট একটা বসতি গড়ে তুলব; আর যন্ত্রপাতি নিয়ে আসব। এটা অকৃতজ্ঞের মতো মনে হতে পারে কিন্তু অন্য কিছু হবে অবাস্তব।

–হয়তো আপনারা ঠিক। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়র বললেন। সে অবাক হয়ে ভাবল কিভাবে প্রটোকল আর আতিথেয়তার ব্যাপারটা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার লোরেনের

বদলে ডেপুটি ক্যাপ্টেন ম্যালিনার কাছে যায়। সমস্যা অমোচনীয় মনে হলেও এখন আর সমস্যাটাই উঠবে না।

১৪. মিরিসা

বৃদ্ধা হবার পরও মিরিসা লিওনার্দ লোরেনের সঙ্গে তার প্রথম চোখাচোখিটা স্পষ্ট মনে করতে পারবে। সেখানে কেউ উপস্থিত ছিল না, এমনকি ব্র্যান্টও।

নতুনত্বের কারণে এটা হয়নি। লোরেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে তার সঙ্গে আরও কয়েকজন পৃথিবীবাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং কেউই তার মনে কোন বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি। সূর্যের স্পর্শ ছাড়া ল্যাসানরাও কয়েকদিনের মধ্যে ওরকম হয়ে যাবে।

কিন্তু লোরেন অন্যরকম। তার চামড়া কখনোই তামাটে হবে না। আর তার চুল হয়তো আরও রূপালী হয়ে যাবে। অন্ততঃ মেয়র ওয়াডের্নের অফিস থেকে দু'জন সহকর্মী নিয়ে বের হবার সময় তার সেরকমই মনে হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের চোখে ছিল হতাশ একটা দৃষ্টি–যা কিনা থ্যালসার অফিস এবং কঠিন আমলাতন্ত্রের সঙ্গে একটা সাক্ষাতের পর প্রকাশ পাবেই।

এক মুহূর্তের জন্য তাদের চোখদুটো মিলেছিল। মিরিসা আরও কয়েকপা হেঁটে গিয়ে অবচেতন ভাবেই একদম থেমে পেছনে চেয়ে দেখতে পেল যে, আগন্তুক তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেন তারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছে যে তাদের জীবন বদলে গেছে।

সে রাতেই ভালোবাসার ঝড় থামলে সে ব্র্যান্টকে জিজ্ঞেস করল,

–তারা বলেছে, কতদিন থাকবে?

–আর সময় পেলে না জিজ্ঞেস করার, সে জড়ানো স্বরে বলল। অন্তত এক বছর। হয়তোবা দুই। ঘুমাও শুভরাত্রি।

আর যে কোন প্রশ্ন করা যাবে না, সেটা মিরিসা জানত। তবুও অনেকক্ষণ তার খোলা চোখ দেখল, কিভাবে ভেতরের চাঁদের দ্রুতগামী ছায়া মেঝের ওপর দিয়ে, তার পাশের গভীর ঘুমে ডুবে থাকা মানুষটাকে কোমল ভাবে ছুঁয়ে সরে যায়।

ব্র্যান্টের আগে সে খুব বেশী লোককে চিনত না। কিন্তু একসঙ্গে থাকার পর অন্য কারও মধ্যে সে বিশেষ তেমন কিছু দেখেনি। কিন্তু তারপর এই হঠাৎ কৌতুহল কেন? সে এখনও একে কৌতুহলই বলতে চায়। তাও এমন একজনের প্রতি যে কিনা তার প্রতি মাত্র কয়েকমুহূর্ত তাকিয়েছে আর তার ভালো নামটুকুও সে জানে না। মিরিসা নিজস্ব সততা আর পরিষ্কার চিন্তার জন্য গর্ব বোধ করত। যে সমস্ত মানুষ আবেগে চলে তাদের সে নীচু চোখেই দেখত। সে অবশ্য নিশ্চিত, তার আকর্ষণের কিছুটা হচ্ছে নতুনত্বের–নতুন দিগন্তের হাতছানি। এমন কারো সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হওয়া যে সত্যি সত্যি পৃথিবীর শহরগুলোতে হেঁটে বেড়িয়েছে,

দেখেছে সৌরজগতের মৃত্যু, আর এখন যাচ্ছে এমন এক নতুন সূর্যের দিকে যার কল্পনা সবচে বুনো স্বপ্নটারও অসাধ্য। এটা তাকে ব্র্যান্টের সঙ্গের আনন্দের নীচে বয়ে চলা থ্যালসার অলস, একঘেয়ে জীবনের দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলল।

সত্যি সত্যি সে কি চায়? এই নক্ষত্রের আগন্তুকদের কাছে যে কি খুঁজছে সে নিজেও জানে না। তবে তারা যাবার আগে সে একবার চেষ্টা করে দেখবে।

ঐদিন সকালেই ব্র্যান্ট মেয়রের অফিসে গিয়েছিল। তবে বরাবরের মতো উষ্ণ অভ্যর্থনা সে পায়নি। সে তার মাছ ধরার ফাঁদের টুকরাগুলো ডেস্কে রাখল,

–বুঝলাম যে তুমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু এ ব্যাপারটা নিয়ে কি করবে?

মেয়র উৎসাহহীন ভাবে স্তুপ করা তারগুলো দেখল। নাক্ষত্রিক রাজনীতির মধ্যে দৈনন্দিন কাজে মনোযোগ দেয়া দুঃসাধ্য ব্যাপারই বটে!

–তোমার কি মনে হয় ?

–এটা ইচ্ছাকৃত। দেখ, কিভাবে না ভাঙ্গা পর্যন্ত তারগুলো মোচড়ানো হয়েছে।

একটা তার না, পুরো একটা অংশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমার মনে হয় না দক্ষিণ দ্বীপের কেউ এটা করবে। কি লাভ তাদের? তবে খুব শিগগিরি আমি বের করব... ব্র্যান্টের কথা হঠাৎ থেমে তারপরের অবস্থা বুঝিয়ে দিল।

–কাকে সন্দেহ হয়?

–যখন থেকে আমি বৈদ্যুতিক ফাঁদ নিয়ে কাজ করছি তখন থেকেই রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে আমাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। তারা ভাবে যে, সমস্ত খাদ্যকেই কৃত্রিম হতে হবে, কেননা জীবন্ত প্রাণীকে ধরে খাওয়াটা নৃশংসতা।

–রক্ষণশীলদের একটা যুক্তি আছে। তোমার ফাঁদটা তোমার দাবী অনুযায়ী কর্মক্ষম হলে, এটা পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

–নিয়মিত রীলিফ শুমারীর সময়ই তা বেরিয়ে আসবে। আমরা তখন বন্ধ করব। আর আমার ফাঁদ তিন থেকে চার কিলোমিটার দূরের মাছ আকৃষ্ট করবে। তাছাড়া তিন দ্বীপের সবাই যদি শুধু মাছ খায়, তবুও তা সমুদ্রের ভান্ডারে ছাপও ফেলবে না।

–আমি আশা করি তুমিই ঠিক অন্ততঃ ঐ মাছ সদৃশগুলো ব্যাপারে। ওগুলো খুবই বিষাক্ত। আর তুমি কি তেরানের মজুদ সম্বন্ধে নিশ্চিত?

ব্র্যান্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকাল। মেয়র তাকে ক্রমেই অবাক করছে। তার এর আগে কখনো মনে হয়নি যে, চোখাচোখি করা ছাড়াও মেয়রের এমন কোন গুণ আছে, যা কিনা তাকে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে বহুদিন থাকতে দিয়েছে।

–আমার মনে হয় না, টুনা মাছ টিকে থাকতে পারবে। সমুদ্রকে তাদের উপযুক্ত পরিমাণে লবনাক্ত হতে আরও কয়েক বিলিয়ন বছর লাগবে। তবে ট্রাউট আর স্যামন টিকে যাবে।

–তারা আসলেই সুস্বাদু। এমনকি কৃত্রিমের সমর্থকদের নৈতিকতা ভাঙ্গার মতো। আমি অবশ্য তোমার আকর্ষণীয় তত্ত্বটা গ্রহন করছি না। ওসব লোক বলে অনেক কিছু তবে করে কম।

–তারা কয়েক বছর আগেই একটা পরীক্ষামূলক খোঁয়াড় থেকে পুরো একটা গৃহপালিত পশুর পাল ছেড়ে দিয়েছিল।

–তারা চেষ্টা করেছিল। গরুগুলো সোজা খোঁয়াড়ে ফিরে গিয়েছিল। আর সবাই এতো বেশী মজা পেয়েছিল যে তারা লজ্জায় আর কিছু করেনি। আমি মনে করি না, তারা এতো বড় কিছু করবে।

–এটা এমন কোন কঠিন কাজ নয়। রাতের বেলা ছোট একটা নৌকা, কয়েকজন ডুবুরী। আর পানিতো মাত্র বিশ মিটার গভীর।

ঠিক আছে আমি তদন্তের ব্যবস্থা করছি। তবে এর মধ্যে তোমাকে দুটো কাজ করতে হবে।

–কি? ব্র্যান্ট তার গলার সন্দেহ লুকাবার বৃথাই চেষ্টা করল।

–জিনিসটা মেরামত কর। স্টোর থেকে যা নেবার নাও। আর একশ ভাগ নিশ্চিত না হয়ে কাউকে দায়ী করো না। কারণ তোমার ভুল হলে তোমাকেই বোকা বনতে হবে। এবং তোমাকে মাপ চাইতেও হতে পারে। আর তুমি ঠিক হলেও তোমার কথা তাদের সতর্ক করে দেবে। বুঝেছো?

ব্র্যান্টের চোয়াল কিছুটা ঝুলে পড়ল। সে কখনো মেয়রকে এতো স্থিরচিত্ত দেখেনি। সে কোনভাবে বেরিয়ে এল।

সে হয়তো আরও কিছুটা ধাক্কা খেত কিংবা হয়তো তেমন খেত না, যদি জানত যে মেয়র আর তার প্রতি তেমন আকৃষ্ট নয়।

বিলক্ষণ, অ্যাসিটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার লোরেন লোরেনসন একজনের বেশী মহিলার উপরই সেদিন প্রভাব ফেলেছিল।

১৫. টেরা নোভা

পৃথিবীর কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয় এমন কোন নাম অবশ্যই বসতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু কেউ স্বীকার না করলেও বেস ক্যাম্প কথার চাইতে সেটা অনেকটাই সৌকর্যময়, তাই সেটাই দ্রুত গৃহীত হয়ে গেল। আগে থেকেই বানানো জটিল ঘরগুলো অসম্ভব গতিতে বসানো হয়ে গেল সত্যিকার অর্থে এক রাতেই। পৃথিবীবাসীদের তার চাইতে বলা ভালো পৃথিবীর রোবটদের এটাই তারনার প্রতি প্রথম কাজের উদাহরণ। এবং পুরো বসতিই দারুণ ভাবে প্রভাবিত হল। এমনকি ব্র্যান্ট যে কিনা ঝামেলা আর একঘেয়ে কাজ ছাড়া রোবটদের কাজের চেয়ে অকাজেরই বেশী মনে করে সেও দ্বিতীয় বারের মতো ভাবতে বাধ্য হল। সেখানে একটা বিশাল, সব ধরনের কাজ করতে সক্ষম, চলনক্ষম নির্মাণ যন্ত্র ছিল যার কাজ অনেক সময় দেখাটাই দুঃসাধ্য হয়ে যেত। যেখানেই এটা যেত না কেন, সবসময়ই এর পেছনে ল্যাসানদের ছোট একটা ভীড় লেগেই থাকতো। আর কেউ পথে পড়লে, এটা বাধা দূর না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকতো। ব্র্যান্ট ঠিক করল,

এরকম একটা সাহায্যকারীই তার দরকার। সম্ভবত আগন্তুকদের কাছে এটা চাওয়া যায়...

ঠিক এক সপ্তাহ পর টেরা নোভা কক্ষপথের ঘূর্ণনায়মান বিশাল মহাকাশযানের আণুবীক্ষণীক কর্মস্থল রূপ পেয়ে গেল। সেখানে সাধারণ কিন্তু একশ জনের উপযুক্ত বাসস্থান হয়ে গেল সব ব্যবস্থা সহ। যেমন লাইব্রেরী, ব্যায়ামগার, সুইমিং পুল আর মঞ্চ। ল্যাসানরা এই সুবিধাগুলোকে সমর্থন করল আর ব্যবহার করতেও দ্বিধা করল না। ফলে টেরা নোভার জনসংখ্যা কখনোই অন্ততঃ অনুমিত একশর দ্বিগুনের কম রইলনা।

অধিকাংশ অতিথি আমন্ত্রিত হোক আর অনাহুতই হোক, আগন্তুকদের সাহায্য করতে আর তাদের অবস্থানকে আনন্দদায়কই রাখতে চাচ্ছিল। ওরকম বন্ধুত্ব খুব প্রত্যাশিত আর কাম্য হলেও প্রায়ই অত্যন্ত বিব্রতকর। ল্যাসানরা অত্যন্ত কৌতুহলী, আর একান্ত ব্যক্তিগত শব্দটার সঙ্গে তারা পরিচিতই নয়।

দয়া করে বিরক্ত করবেন না – এধরনের চিহ্ন একটা ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ হিসেবেই ধরা হয়। যার ফলাফলটা অবশ্যই বেশ আকর্ষণীয় সমস্যা...

–আপনারা সবাই পদস্থ কর্মকর্তা, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক, শেষ স্টাফ কনফারেন্সে ক্যাপ্টেন বে বলেছিলেন। তাই আপনাদের এটা ভেঙ্গে বলার দরকার নেই। আপনারা চেষ্টা করবেন কোন ধরনের ইয়ে মানে ঝামেলায় না জড়ানোর জন্য। যতক্ষন না আমরা ওসব ব্যাপারে সব জানছি। তারা সহজ ভাবেই সব নিচ্ছে কিন্তু সেটা প্রতারণাও হতে পারে। ড. ক্যালডর আপনি কি বলেন?

–ক্যাপ্টেন, আমি না বলব না। বিশেষতঃ এই অল্প কদিনের পর্যবেক্ষণেই। তবে একটা চমৎকার ঐতিহাসিক সাযুজ্য আছে। যখন পৃথিবীর পুরোনো পাল তোলা জাহাজ বিশাল সমুদ্র যাত্রা শেষ করে নোঙর করত। আমার মনে হয় তোমরা অনেকেই সেই ক্লাসিক ভিডিও গুলো দেখেছ।

–ড. ক্যালডর নিশ্চয়ই আমাকে ক্যাপ্টেন কুকের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে না?

–এটা কোন অপমান নয়। সে একজন মেধাবী নাবিক ছিল। এমুহূর্তে আমাদের দরকার হচ্ছে সাধারণ বুদ্ধি, ভালো ব্যবহার আর আপনি যেটা বললেন ধৈর্য্য। লোরেন অবাক হল যখন ড. ক্যালডর তার দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করল। নিশ্চয়ই এখনই এটা তেমন বেশী কিছু হয় নি...

দাপ্তরিক কাজেই ব্র্যান্টের সঙ্গে অন্তত ডজন খানেক বারের বেশী তার দেখা হয়েছে। ইচ্ছা থাকলেও মিরিসাকে পাশ কাটাবার উপায় নেই। তারা একত্রে এখনও কোন সময় কাটায়নি। এমনকি এখন পর্যন্ত কয়েকটা ভদ্রতা সূচক কথা ছাড়া তেমন কথাও হয়নি। তবে খুব বেশী কিছু বলার দরকারও বোধহয় নেই।

১৬. অনুষ্ঠান

এই হচ্ছে একটা শিশু, মিরিসা বলল। দেখতে যেমন লাগুক না কেন একদিন এই বড় হয়ে বড় মানুষে রূপ নেবে।

ভেজা চোখেই সে হাসছিল। লোরেনের আকর্ষণ লক্ষ্য করার আগে কখনোই তার এমন হয়নি। সম্ভবতঃ তারনার এই ছোট বসতিতে যে পরিমাণ বাচ্চা আছে পৃথিবীর শেষ দিনগুলোতে সমগ্র পৃথিবীতেও সেই প্রায় শূন্য জন্মহারে এতো শিশু ছিল না।

–এটা কি তোমার? সে দ্রুত জিজ্ঞেস করল।

–এ্যাই, প্রথম কথা হচ্ছে একে এটা বলা চলবে না। এ হচ্ছে ব্র্যান্টের ভাইপো লিস্টার। ওর বাবা-মা উত্তর দ্বীপে গেলে আমরা ওর দেখাশোনা করি।

–কি সুন্দর! আমি ওকে নিতে পারি?

লিষ্টার অবশ্য তারস্বরে কান্না জুড়ে দিল।

–মনে হচ্ছে সেটা ভালো হবে না– মিরিসা হাসল। সে বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে কাছের বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বলল,

–আমি ওর ভাব বুঝি। ব্র্যান্ট বা কুমার তোমাকে চারিদিক ঘুরিয়ে দেখাক। ততক্ষণ আমরা অন্যান্য অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করি।

ল্যাসানরা অনুষ্ঠান খুবই পছন্দ করে। আর অনুষ্ঠান করার কোন সুযোগই তারা হাতছাড়া করেনা। ম্যাগেলানের আবির্ভাব, সত্যিকার অর্থেই এক না, বহু জন্মেরই ঘটনা। যদি সব আমন্ত্রণ গ্রহণ করার মতো সময় আগন্তুকদের থাকতো তা হলে, তাদের কাজের পুরো সময়টাই কোন আনুষ্ঠানিক বা অআনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ খেতেই শেষ হয়ে যেত। অবশ্য খুব শিগগিরি ক্যাপ্টেন তার একটা নির্দেশ দিয়ে দিলেন। "বের বজ্র" নামে ডাকা এই নিয়মে একজন পাঁচদিনে একটির বেশী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে না। ল্যাসানদের আতিথেয়তার অত্যাচারের চাইতে এটাতেই অবশ্য অনেকে খুশী হল।

লিওনার্দের এক তলা বাড়ি, যাতে এখন মিরিয়া, ব্র্যান্ট আর কুমার থাকছে তা প্রায় ছয় প্রজন্ম ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। দোতলা বাড়ী অবশ্য তারনায় খুব কমই আছে। প্রায় তিরিশ মিটার ঘাসের লন এর সামনে। তার মাঝে একটা পুকুর। পুকুরের মাঝে শীর্ণ এক পাম গাছ নিয়ে ছোট্ট দ্বীপ। একটা কাঠের সেতু দিয়ে সেখানে যাওয়া যায়।

–তারা গাছটাকে বদলাতে বলছে– ব্র্যান্ট কৈফিয়তের সুরে বলল। কিছু গাছ খুব ভালো হয়, কিন্তু বাকীগুলি যত রাসায়নিকই দেই না কেন মরে যায়। মাছ নিয়েও এই একই সমস্যা। মিষ্টি পানির মাছ ভালোই টেকে, কিন্তু তাদের জন্য তো জায়গাই নেই। এতো মিলিয়ন গুণ বড় সাগর, কিন্তু আমরা ব্যবহারই করতে পারছি না।

লোরেনের ব্যক্তিগত মত হচ্ছে যে, যখন ব্র্যান্ট ফ্যাকনর সাগর নিয়ে কথা বলে তখন তার মতো বিরক্তিকর আর কেউ নেই। তবে মিরিসার প্রসংগের চাইতে এটা অনেক নিরাপদ।

লোরেন নিজেকেই শুধায়, কখনও স্বপ্নেও কি সে এরকম একটা অবস্থায় পড়বে বলে ভেবেছিল? সে আগেও প্রেমে পড়েছে। কিন্তু সেই স্মৃতি এমনকি নামগুলোও

মহাকাশযানের অন্যান্য সবার মতোই যত্ন করে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। তার মনে করার ইচ্ছাও নেই। যে অতীত নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে তাকে মনে করার দরকারটা কি?

এমনকি কিতানির মুখও ঝাপসা হয়ে গেছে। যদিও মাত্র এক সপ্তাহ আগেই তাকে সে শীতল প্রকোষ্ঠে দেখে এসেছে। কিন্তু সে হচ্ছে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সাথী। যার বাস্তবায়ন এমনকি কখনো নাও হতে পারে। আর মিরিসা এখন, এখানেই উপস্থিত তার সব হাসি আর উচ্ছলতা নিয়ে। কোন অন্তহীন শীতনিদ্রায় নয়। সে তাকে আবার একবার পরিপূর্ণ করেছে পৃথিবীর নিষ্ঠুর শেষ দিনগুলো, যা তার তারুণ্যকে মুছে ফেলেছিল তাকে আবার জাগিয়ে তুলেছে।

প্রতিবার দেখা হলেই তার বলতে ইচ্ছে হয় যে, সে আবার একজন নতুন মানুষ হয়েছে। এই চাপটা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, সে তার কাজও ঠিকভাবে করতে পারছে না। ম্যানগ্রোভ উপকূলের পরিকল্পনা আর তথ্য দেখার সময় কতবার মিরিসার ছায়া তাকে "স্থগিত" নির্দেশ দিতে বাধ্য করেছে। আর কথাগুলো মনে মনেই বলতে বাধ্য হয়েছে। মিরিসার কয়েক মিটারের মধ্যে থেকেও, কয়েকটা ভদ্রতাসূচক কথার বেশী বলতে না পারাটা এক ধরনের অত্যাচার।

লোরেনকে বাঁচাতেই ব্র্যান্ট হঠাৎ তাকে ছেড়ে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল। লোরেনও অবশ্য দ্রুতই কারণটা বুঝতে পারল।

–কমান্ডার লোরেনসন, মেয়র ওয়াডের্ন বললেন। আশা করি তারনা ভালো লাগছে। লোরেন ভদ্রতা করে মাথা ঝাকালো। সে জানে মেয়রের প্রতি তার আরও নম্র হওয়া উচিত। তবে সামাজিকতা বড় কোন ব্যাপার নয়।

–হ্যাঁ অবশ্যই, ধন্যবাদ। আমার মনে হয় না, আপনি এই ভদ্রলোকদের সঙ্গে পরিচিত। প্রয়োজনের চাইতে অতিরিক্ত জোরেই সে একদল সহকর্মীকে ডাকল। ভাগ্য ভালো যে নতুন দলটার সবাই লেফটেন্যান্ট। কাজে না থাকলেও উপরের র‍্যাঙ্ক সবসময়ই সুবিধা পায়, আর সেটা ব্যবহারে তার কোন সঙ্কোচও নেই।

–মেয়র ওয়াডের্ন এ হচ্ছে লেঃ ফ্লেচার। ওয়েন তোমার তো এই প্রথম নীচে নামা? লেঃ ওয়েরনার, লেঃ রঞ্জিত উইলসন, লেঃ কার্ল বোসেলি...সবসময় লুকোচুরি খেলা। নতুন ছেলেগুলো অবশ্য ভালোই। আর তার মনে হয় না যখন সে চুপিসাড়ে কেটে পড়ল মেয়র তা লক্ষ্য করতে পারল।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গেই কথা বলতে চাচ্ছিল ডোরেন চ্যাং। কিন্তু তিনি দ্রুত আসলেন, একটা ব্রিফ নিলেন, তার পরই গৃহকর্তার কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিলেন।

–কেন তিনি আমাকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন না? সে ক্যালডরকে জিজ্ঞেস করল। ক্যালডরের অবশ্য তেমন কাজ নেই এবং এর মধ্যেই কয়েকদিন ভি.ডি.ও বা অডিও এর সামনে তিনি বসেছেন।

–ক্যাপ্টেন সিরডার বে-সে উত্তর দিল, একজন বিশেষ ব্যক্তি। আমাদের অন্যদের মতো, তাকে ব্যাখ্যাও দিতে হয় না বা মাপও চাইতে হয় না।

–তোমার গলায় কিছুটা ভয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে? থ্যালসা ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের সবচে দামী সংবাদপাঠিকা জিজ্ঞেস করল।

–না তা নয়। আমি তাকে বেশ পছন্দ করি। এমনকি আমার সম্বন্ধে মন্তব্যগুলোও মেনে নেই– পুরোপুরি নয় অবশ্য, এ্যাই তুমি কি রেকর্ড করছো?

–এখন না। খুব বেশী গোলমালের শব্দ হচ্ছে।

–ভাগ্য ভালো যে আমি তোমাকে বলিনি।

–অবশ্যই এটা রেকর্ডের বাইরে থাকবে। মোজেস, তোমার সম্বন্ধে সে কি ভাবে?

–সে আমার দৃষ্টিভঙ্গী পছন্দ করে, আমার অভিজ্ঞতাও। কিন্তু খুব গুরুত্বের সঙ্গে কখনোই নেয় না। এটা আমিও জানি কেন। সে একবার আমাকে বলেছিল "মোজেস, তুমি ক্ষমতা পছন্দ কর কিন্তু দায়িত্ব না। কিন্তু আমি দুটোই উপভোগ করি" এটা খুব রুক্ষ কথা। কিন্তু এটাই আমাদের পার্থক্যের মূল কথা।

–তুমি কি উত্তর দিলে?

–আমি কি বলব? এটা একদম সত্যি। সত্যিকারের রাজনীতিতে আমি একবারই যোগ দিয়েছিলাম, সেটা ভয়ংকর নয়–তবে আমি সত্যিই সেটা উপভোগ করিনি।

–ক্যালডর ক্রুসেড সমন্ধে?

–ওহ তুমিও জানো। ফালতু বিশেষণ আর আমাকে সেটাই ভয় পাইয়ে দেয়। ওটা আমার আর ক্যাপ্টেনের মধ্যকার আরেকটা পার্থক্য। সে ভাবত এবং আমি জানি এখনও ভাবে, জীবন সম্পন্ন যে কোন গ্রহ সরাসরি আমাদের এড়িয়ে যাবার নির্দেশ একটা মানবীয় ফালতু দুর্বলতা।

–আশ্চর্য। তুমি একদিন এটাকে রেকর্ড করতে দেবে।

–কক্ষনো না। ওখানে কি হচ্ছে?

ডোরেন চ্যাং একজন সহনশীল মহিলা। এবং সে জানে কখন থামতে হবে।

–ওটা হচ্ছে মিরিসার প্রিয় গ্যাসীয় ভাস্কর্য। তোমাদের পৃথিবীতেও নিশ্চয়ই ছিল।

–অবশ্যই। আর রেকর্ডের বাইরে বলছি আমার মনে হয় না, ওটা কোন শিল্প। তবে আকর্ষণীয়।

উঠোনের এক অংশের মূল বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। আর প্রায় ডজন খানেক অতিথি প্রায় এক মিটার চওড়া, সাবানের বুদবুদের মতো একটা জিনিসের কাছে জড়ো হয়েছে। চ্যাং আর ক্যালডর সেদিকে আগাতে আগাতেই তারা দেখল, একটা রঙীন ফিতা ভেতরে তৈরী হচ্ছে। একটা স্পাইরাল নেবুলার জন্মের মতো।

–এটাকে "জীবন" বলা হয়, ডোরেন বলল। মিরিসার পরিবার প্রায় দু'শ বছর ধরে এটা রাখছে। গ্যাসটা অবশ্য লীক হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে আছে এটা আরও অনেক উজ্জ্বল ছিল।

তা হলেও এটা এখনও আকর্ষণীয়। ইলেকট্রন বন্দুক আর লেজারকে এর গোড়ায় কোন পুরোনো শিল্পী এমন ভাবে বসিয়েছেন, যাতে একসারি জ্যামিতিক

আকৃতি ধীরে ধীরে জটিল জৈব যৌগের আকৃতি নিতে থাকে। কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে আরও জটিল রূপ দেখা যায়। আর একটা আরেকটাকে ক্রমাগত প্রতিস্থাপিত করতে থাকে। এক পর্যায়ে, একটা পেচানো জিনিস দেখা যায়, যাকে অনেকটা ডি.এন.এ অনুর মতো মনে হয়। আর প্রতিটা পদক্ষেপেই কিছু নতুন জিনিস যুক্ত হয়ে সেটা কয়েক মিনিটের মধ্যে অ্যামিবা থেকে মানুষ হবার মহাকাব্য দেখিয়ে দেয়।

শিল্পী তার পরেও যেতে চেয়েছেন। ক্যালডর অবশ্য সেটা বুঝল না। উজ্জ্বল গ্যাসের আলো খুব বেশী জটিল আর বিমূর্ত হয়ে গেছে। আরও কয়েকবার দেখলে হয়তো একটা প্যাটার্ন ধরা যেতে পারে।

–শব্দের কি হলো? ডোরেন সব আলো নিভে গেলে জিজ্ঞেস করল। এখানে কিছু খুব সুন্দর সুর ছিল, বিশেষত শেষে।

–আমার আশঙ্কা ছিল কেউ জিজ্ঞেস করবে। মিরিসা কৈফিয়তের সুরে বলল, –আমরা বুঝতে পারছিনা, সমস্যাটা কি আবহ সঙ্গীতের না প্রোগ্রামের ভেতরে।

–নিশ্চয়ই একটা বিকল্প ছিল।

–হ্যাঁ ছিলো তো বটেই। কিন্তু বাড়তি মডেলটা কুমারের রুমে। হয়তো তার ক্যানুর কোথাও হবে। তার রুম না দেখলে এন্ট্রপি কি জিনিস তোমরা বুঝবেনা।

–ওটা ক্যানু নয় কায়াক, কুমার প্রতিবাদ করল। সে মাত্রই একটা সুন্দর স্থানীয় মেয়েকে নিয়ে ঢুকেছে–আর এন্ট্রপিটা কি জিনিস?

একজন তরুণ বোকার মতোই জিনিসটা বোঝাতে চাচ্ছিল। কিন্তু বেশী দূর যাবার আগেই একটা সুর ভেসে আসল।

–তোমরা দেখলে–কুমার জোরে চেচালো, অবশ্যই একটু গর্বের সঙ্গে–ব্র্যান্ট যে কোন জিনিস সারাতে পারে।

যে কোন জিনিস? লোরেন ভাবল। মনে হয় না....

১৭. নিয়মের শৃংখল

উৎস: ক্যাপ্টেন
লক্ষ্য: সকল কর্মীবৃন্দ

ক্রমপঞ্জী

এ ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় সন্দেহ দেখা দেয়ায় আমি নিম্নলিখিত জিনিসগুলো পরিষ্কার করছি।

১. মহাকাশযানের সব রেকর্ড ও সময় পৃথিবী সময় (পৃ.স.) অনুযায়ী থাকবে আপেক্ষিকতার প্রভাবকে সংশোধিত করে। এ যাত্রার শেষ পর্যন্ত সব ঘড়ি এবং সময় সংরক্ষক ব্যবস্থা পৃ.স. হিসাবে রাখবে।

২. গ্রহে অবস্থানকারী কর্মীরা সুবিধার জন্য থ্যাসলার সময় (থ্যা. স.) ব্যবহার করলেও তাদের সব রেকর্ড পৃ.স. হিসাবে রাখবে।

৩. সবার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে থ্যালসার সৌর দিবস পৃ.স. ২৯.৪৩২৫ ঘন্টা। ৩১৩.১৬৬১ দিনে থ্যালসায় বছর হয়। যেটাকে ২৮ দিনের ১১ মাসে ভাগ করা হয়েছে। ক্যালেন্ডার থেকে জানুয়ারী বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ৩১৩ দিনের হিসাবের জন্য ডিসেম্বরের শেষ দিনের পর বাড়তি পাঁচ দিন যোগ করা হয়। ছয় বছরে লিপ ইয়ারের বাড়তি দিন যোগ হয়। তবে আমাদের অবস্থানের মধ্যে এটা হবে না।

৪. যেহেতু থ্যালসার দিনগুলো পৃথিবীর দিনের চাইতে ২২%বেশী আর অন্যদিকে দিনের সংখ্যা ১৪% কম, সেহেতু থ্যালসার বছর পৃথিবীর চাইতে মাত্র ৫% বেশী। তোমাদের সবার বোঝা উচিত, জন্মদিনের বেলায় এর একটা গুরুত্ব আছে। থ্যালসা ও পৃথিবীর সময়পঞ্জী প্রায় এক। একজন ২১ বছর বয়সী থ্যালসান পৃথিবীবাসী হলে ২০ বছরের হতো। ল্যাসান ক্যালেন্ডার ৩১০৯ পৃ.স. প্রথম অবতরণ থেকে গণনা করা হয়। বর্তমান বছর হচ্ছে ৭১৮ থ্যা.স., ৭৫৪ পৃথিবী সময় পরে।

৫. সবশেষে আমি একটা ব্যাপারকে ধন্যবাদ দেই কারণ থ্যালসার সময় ভাগ মাত্র একটাই।

সিরডার বে (ক্যাপ্টেন)

৩৮৬৪.০৫.২৬.২০৩০ পৃ.স.
৭১৮.০০.০২.১৫.০০ থ্যা.স.

একটা সহজ জিনিসকে কিভাবে কেউ এতো জটিল বানাতে পারে, মিরিসা হেসে দিল। তখন টেরা নোভা বুলেটিন বোর্ডে মাত্র নোটিশটা উঠেছে– আমার মনে হয় এটা একটা সেই বিখ্যাত বে'র বজ্র। ক্যাপ্টেন কেমন মানুষ? আমি তার সঙ্গে কখনো কথা বলার ঠিকমতো সুযোগ পাইনি।

–তাকে খুব সহজে চেনা যায় না. মোজেস ক্যালডর বলল। আমার মনে হয় না ডজনখানেকের বেশী আমি তার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ করেছি। এবং সেই হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তি যাকে মহাকাশযানের প্রত্যেকে "স্যার" বলে ডাকে–সবসময়। অবশ্য একান্তে থাকলে ডেপুটি ক্যাপ্টেন ম্যালিনা হয়তোবা বলেনা। এটা অবশ্য সে অর্থে বে'র বজ্র নয়। এটা প্রধানত তত্ত্বীয়। সিনিয়র অফিসার ভার্লে আর সেক্রেটারী লেলিরয় মিলে নিশ্চয়ই এটা লিখেছে। ক্যাপ্টেন বের প্রাযুক্তিক জ্ঞান আমার চাইতে অনেক বেশী ভালো হলেও, সে প্রধানত একজন প্রশাসক। আর মাঝে মাঝে সর্বাধিনায়ক।

–তার দায়িত্বকে আমি ঘৃণা করি।

–এটা কাউকে না কাউকে তো করতেই হবে। সাধারণ সমস্যা সাধারণত সিনিয়র অফিসার বা কম্পিউটার ব্যাঙ্কের সাহায্যেই সমাধান করা যায়। কিন্তু কখনো কখনো একজনকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং তাকেই তা প্রয়োগ করতে হয়। তাই একজন ক্যাপ্টেন দরকার। তুমি সব সময় একটা মহাকাশযান একটা কমিটি দিয়ে চালাতে পারবে না।

–ভাগ্য ভালো যে থ্যালসা এভাবে চলছে না। প্রেসিডেন্ট ফারাদীনকে তুমি কি একজন ক্যাপ্টেন হিসেবে চিন্তা করতে পার?

–পীচগুলো ভারী সুস্বাদু, ক্যালডর চালাকী করল। যদিও সে জানে ওগুলো লোরেনের জন্য আনা হয়েছে। কিন্তু তোমরা ভাগ্যবান। গত সাতশ বছরে তোমরা সত্যিকারের কোন বিপদে পড়নি। তোমাদের নিজেদের লোকেরাই কি বলে না যে থ্যালসার কোন ইতিহাস নেই, আছে শুধু উপাত্ত।

–এটা ঠিক না। ক্র্যাকান পর্বতের অগ্ন্যুৎপাতকে তুমি কি বলবে?

–ওটা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অবশ্যই বড় ধরনের। আমি রাজনৈতিক সমস্যা বা গৃহযুদ্ধ এধরনের কথা বলছি।

–সেজন্য আমরা পৃথিবীকে ধন্যবাদই দেই। জেফারসন মার্ক-৩ এর সংবিধান যেটাকে অনেকে দুই মেগাবাটের ইউটোপিয়া বলতো, খুব ভালো কাজ করেছে। তিনশ বছরেও ঐ প্রোগ্রামে কেন পরিবর্তন করতে হয়নি। মাত্র ছ'টা সংশোধনী আনা হয়েছে।

–যতদিন আমরা এখানে আছি, ক্যালডর বলল, আমার ভাবতে ভালো লাগবে না যে, সপ্তমটি আমাদের জন্য হবে।

–যদি এটা হয় প্রথমে এটাকে আর্কাইভের মেমরী ব্যাঙ্কে দিতে হবে। তোমরা আবার কখন আমাদের এখানে বেড়াতে আসবে? কত কিছু যে আমি তোমাকে দেখাতে চাই।

–আমি যতটা দেখতে চাই ততটা নিশ্চয়ই নয়। সাগান-২ এ লাগবে এমন অনেক কিছুই নিশ্চয়ই আছে, যদিও সেটা একেবারে অন্যরকমের গ্রহ, অনেক আকর্ষণহীনও বটে। সে স্বগত বলল।

তাদের কথা বলার সময়ই লোরেন ব্যস্তভাবে অভ্যর্থনা কক্ষে এল। নিশ্চয়ই খেলার রুম থেকে গোসলে যাবার পথে।

–নিশ্চয়ই সবগুলোতে জিতেছ বরাবরের মতো। তোমার একঘেয়ে লাগে না? লোরেন মাথা চুলকালো।

–কিছু তরুণ ল্যাসান প্রতিশ্রুতি ভালোই দেয়। একজন তিন পয়েন্ট তো নিয়েই নিয়েছিল– অবশ্য আমি বা হাতে খেলছিলাম।

–এটা অবশ্য অসম্ভব মিরিসা, যে কেউ তোমাকে বলেনি লোরেন পৃথিবীতে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন ছিল।

–বাড়িয়ে বলো না মোজেস। প্রথম পাঁচজনের মধ্যে ছিলাম। আর শেষের দিকে মান খুব নীচুতে নমে গিয়েছিল। তৃতীয় শতকের যে কোন চীনা খেলোয়ার আমাকে হারাতে পারবে।

–নিশ্চয়ই তুমি ব্র্যান্টকে শেখানো আরম্ভ করনি– ক্যালডর হঠাৎ বলল, সেটা বেশ আকর্ষণীয় হতো।

বেশ বড় একটা নিস্তব্ধতা গ্রাস করল সবাইকে। লোরেন আস্তে করে বলল, এটা ঠিক না।

মিরিসা বলল, ব্র্যান্ট তোমাকে কিছু দেখাতে চায়।

–তাই।

–তুমি নাকি কখনো বোটে চড়নি।

–হ্যাঁ।

–তাহলে ব্র্যান্ট এবং কুমার তোমাকে কাল সকালে সাড়ে আটটায় পিয়ের তিন এ আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

লোরেন ক্যালডরের দিকে তাকাল,

–এটায় যাওয়া কি আমার জন্য নিরাপদ? সে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, আমি সাঁতার জানি না যে।

–দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই–ক্যালডর ভরসা দিল। তারা যদি তোমার চিরযাত্রার পরিকল্পনা করেই থাকে, তাহলে ওতে কোন লাভ হতো না।

১৮. কুমার

আঠারো বছরের জীবনে কুমার লিওনার্দের একটিই মাত্র দুঃখ আছে। সে তার প্রত্যাশার চাইতে দশ সেন্টিমিটার ছোট। তাকে পেছনে যখন কেউ "ছোট্ট" সিংহ বলে ডাকে তখন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। অবশ সামনাসামনি ডাকার সাহস কারও নেই। তার উচ্চতার এই ঘাটতি পূরণ করতেই সে স্বাস্থ্যের প্রশস্ততার প্রতিই বেশী মনোযোগ দিয়েছে। মিরিসা বহুবার বলেছে "কুমার শরীর চর্চার সময়টা যদি তুমি মস্তিষ্ক চর্চায় দিতে তাহলে থ্যালসার সবচে বড় প্রতিভা তুমিই হতে।" তবে যেটা কখনোই সে কুমারকে বলেনা, এমনকি নিজের কাছেও নিজে স্বীকার করেনা সেটা হল প্রতিদিনের সকালের ব্যায়াম দেখার সময় তার বুকেও একটা অ-ভগ্নীসুলভ ব্যাপার জেগে ওঠে এবং আশেপাশের প্রশংসা তাদের প্রতি তার একটা হিংসাই লাগে। কুমারের আশেপাশে অবশ্য তার বয়সীরাই থাকে। তারনার সমস্ত মেয়ে আর অর্ধেক ছেলের সঙ্গে তার যে প্রেমকাহিনী বাতাসে ছড়িয়ে আছে তার মধ্যে সত্যের বদলে অতিরঞ্জনই বেশী।

তবে কুমারের সঙ্গে তার বোনের মস্তিষ্কের ক্ষমতায় বিশাল পার্থক্য থাকলেও সে হাবা নয়। কোন কিছু তার একবার সত্যিকারের পছন্দ হলে, যত সময়ই লাগুক না

কেন সেটার শেষ সে দেখে ছাড়ে। গত দুবছর ধরে সে একজন দুর্দান্ত ডুবুরী। ব্র্যান্টের বিচ্ছিন্ন কিছু সাহায্য নিয়েই সে চার মিটার লম্বা একটা কায়াকও বানাচ্ছিল। হাল হয়ে গেছে তবে পাটাতনের কাজ সে এখনও ধরেনি।

একদিন সে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে এটাকে পানিতে ভাসিয়ে সবার হাসি বন্ধ করে দেবে। কারণ ইতিমধ্যেই "কুমারের কায়াক" তারনায় যে কোন অসমাপ্ত কাজ বোঝাতে বাগধারায় পরিণত হয়েছিল।

এটা অবশ্য থ্যালসানদের সাধারণ দীর্ঘসূত্রিতার অভ্যাসের জন্য নয়। কুমারের মূল সমস্যা হল তার অভিযাত্রী মানসিকতা আর কিছুটা বিপজ্জনক বাস্তব রসিকতা করার অভ্যাস। এবং সবাই বিশ্বাস করে এটাই তাকে একদিন একটা বড় বিপদে ফেলবে।

কিন্তু তার সবচেয়ে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া দুষ্টুমীতেও কেউ রাগ করতে পারে না। কেননা সেগুলোর ভেতর একদমই কোন বিদ্বেষের চিহ্ন থাকেনা। সে একদম খোলামেলা স্বচ্ছ। কেউ তাকে মিথ্যা বলতে স্বপ্নেও চিন্তা করবে না। এটার জন্যই সে প্রায়ই এবং আসলে সব সময়ই ক্ষমা পেয়ে যায়।

আগন্তুকদের আসাটাই হচ্ছে তার জীবনের সবচে বড় রোমাঞ্চকর ঘটনা। সে তাদের যন্ত্রপাতি, শব্দ ভিডিও, সুক্ষ্ম রেকর্ডিং, তাদের গল্প–আসলে তাদের সবকিছু দিয়েই অত্যন্ত মুগ্ধ। আর যেহেতু লোরেনের সঙ্গে তার সবচে বেশী দেখা হতো সে স্বাভাবিক ভাবেই তার সঙ্গে জুটে গেল।

লোরেন অবশ্য এই সম্পর্ক গড়াটায় খুব বেশী খুশী হয়েছে তা নয়। কারণ অসহিষ্ণু সাথীর চাইতেও অগ্রহণযোগ্য হল একটা প্রশ্রয়ে বখে যাওয়া, গায়ে পায়ে লেপ্টে থাকা বাচ্চা ভাই।

১৯. সমুদ্র যাত্রা

আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না লোরেন– ব্র্যান্ট ফ্যাকনর বলল– তুমি কখনো বোটে এমনকি জাহাজেও চড়নি।

–একটা রাবারের ডিঙিতে একটা পুকুর পার হয়েছিলাম এমন একটা জিনিস মনে পড়ে। অবশ্য তখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ।

–তাহলে তোমার ভালোই লাগবে। শরীর খারাপ করার মতো কোন ঢেউ নেই। সম্ভবত তুমি আমাদের সঙ্গে ডুবও দিতে পার।

–না, ধন্যবাদ একবারে একটা জিনিস হজম করাই ভালো। আর অন্যরা কাজ করার সময় শেখার নামে তাদের বিরক্ত করার কোন মানে নেই।

ব্র্যান্ট ঠিকই বলেছিল। তার ভালোই লাগছে। পানির ইঞ্জিন প্রায় নিঃশব্দে তাদের রীফ থেকে বের করে নিয়ে এল। তবে খুব শিগিগিরি স্থলভাগের নিশ্চিত নিশ্চয়তা ছোট হয়ে এল। সে সামান্য একটু ভয় অনুভব করল।

শুধু একটা অদ্ভুত চিন্তা তাকে স্থির রাখল। এই গ্রহে আসতে সে পঞ্চাশ আলোকবর্ষ পাড়ি দিয়েছে– এ পর্যন্ত কোন মানুষের জন্য সবচে দীর্ঘযাত্রা। আর সে কিনা স্থল থেকে মাত্র কয়েকশ' মিটার যেতে ভয় পাচ্ছে।

অবশ্য কোন ভাবেই সে চ্যালেঞ্জটা ফেলতে পারছিল না। সে গলুই এ বসে ফ্যাকনরের হাল ধরা দেখতে লাগল (তার কাঁধে ওই সাদা দাগটা কিসের। ওহ্ হো বছরখানেক আগে একটা ছোট ওড়ার যন্ত্রের ভূপাতিত হবার গল্প করেছিল...) এই ল্যাসানের মনে কি বয়ে যাচ্ছে জানতে তার আগ্রহ হচ্ছে।

এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, কোন মানব সভ্যতা তা যতই আলোকপ্রাপ্ত বা সহজ সরল হোক না কেন, সেটা হিংসা বা যৌন আধিপত্যের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।

অবশ্য এখন পর্যন্ত এমন কিছু হয়নি যার জন্য ব্র্যান্ট হিংসা করবে।

মিরিসার সঙ্গে মনে হয় সে একশ শব্দের বেশি কথা বলেনি। তারও বেশির ভাগই তার স্বামীর সঙ্গে থাকা অবস্থায়। ভুল হয়ে গেল –থ্যালসায় প্রথম সন্তান না হওয়া পর্যন্ত কাউকে স্বামী-স্ত্রী বলা হয় না। যদি কোন ছেলে হয়, তাহলে মা সাধারণত (তবে সব সময় নয়) ছেলের বাবার পদবী গ্রহণ করে। আর মেয়ে হলে দু'জনেই মায়ের পদবী রাখে অন্ততঃ দ্বিতীয় (এবং সেটাই শেষ সন্তান) জন্ম পর্যন্ত।

খুব কম জিনিসই আছে যা ল্যাসানদের আঘাত করে। আঘাত করার মতো সেরকম একটা জিনিস হল বাচ্চাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা। আর তৃতীয় গর্ভধারণ হচ্ছে আরেকটা –বিশেষতঃ এরকম মাত্র দু'শহাজার বর্গকিলোমিটারের একটা বিশ্বে। এখানে শিশু মৃত্যুর হার এতোই কম যে, দুটো সন্তানই একটা নির্দিষ্ট জনসংখ্যা রাখতে যথেষ্ঠ। থ্যালসার ইতিহাসে একটিই কেবল বিখ্যাত ঘটনা আছে–সেটায় একবার এক মহিলা পাঁচ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। বেচারী মাকে এর জন্য দায়ী না করা গেলেও এলাকায় তার নাম বেশ মজার স্মৃতি হিসেবে চিহ্নিত।

আমাকে খুব, খুব সাবধানে চলতে হবে– লোরেন মনে মনে ভাবল। সে ইতিমধ্যেই জানে যে মিরিসা তকে খুব পছন্দ করেছে। তার গলার স্বর আর ভঙ্গিই তা বুঝিয়ে দেয়। আর আচমকা হাত বা শরীরের নরম কোন স্পর্শ প্রয়োজনের চাইতে বেশিক্ষণ লেগে থেকে সেটাকেই একদম প্রমাণিত করে দেয়।

তারা দু'জনেই জানে যে, এটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এবং লোরেন নিশ্চিত যে ব্র্যান্ট সেটা জানে। অবশ্য তাদের মধ্যে এ দ্বন্দ্ব থাকলেও তারা এখনও যথেষ্ঠ বন্ধুত্ব রেখেই চলছে। জেটের শব্দ থেমে গেছে। পানিতে হাবুডুবু খাওয়া একটা বড় কাঁচের বয়ার কাছে এসে বোটটা থামল।

–এটাই আমাদের শক্তির উৎস, –ব্র্যান্ট বলল। মাত্র কয়েকশ' ওয়াটের ব্যাপার তো–সৌরকোষ দিয়েই হয়ে যায়। মিষ্টি পানির সমুদ্রের সুবিধা এটা। পৃথিবী হলে সম্ভব হতো না। তোমাদের সমুদ্র তো খুব লবণাক্ত ছিল –সেটা প্রচুর কিলোওয়াট খেয়ে নিত।

–কাকু তুমি মন পরিবর্তন করনিতো? কুমার খোঁচা দিল।

লোরেন মাথা নাড়ল। অল্পবয়সী ল্যাসানদের এই সাধারণ ব্যবহৃত বিশেষণটি প্রথমে তাকে একটু ধাক্কা দিলেও, এখন অবশ্য হঠাৎ করে এতোগুলো ভাইঝি, ভাইপো পেতে ভালই লাগছে।

–না থাক। আমি এখান থেকেই দেখব, যদি তোমাদের হাঙরে খায় আর কি।

–হাঙর! কি চমৎকার প্রাণী। আমাদের এখানে যদি কিছু থাকতো! এটা ডুব দেয়াটা আরও উত্তেজনাকর করে ফেলত।

ব্র্যান্ট আর কুমারের যন্ত্রপাতি ঠিক করার ব্যাপারটা লোরেন একজন প্রযুক্তিবিদের উৎসাহ নিয়েই দেখল। মহাশূন্যে বের হতে যা পরতে হয় তার চাইতে এটা অনেক সহজ। প্রেসার ট্যাঙ্কটা এতোই ছোট যে হাতের তালুতে এটে যায়।

সে মন্তব্য করল,

–অক্সিজেন ট্যাঙ্কটা তো কয়েক মিনিটের বেশি কাজ করবে না।

ব্র্যান্ট আর কুমার পরস্পরের দিকে তাকাল।

–অক্সিজেন! ফোঁস ফোঁস করে ব্র্যান্ট চেঁচাল। ওটাতো বিশ মিটার পানির নিচে মারাত্মক বিষ। বোতালটায় আছে কেবল বাতাস– তাও জরুরী প্রয়োজনে। পনেরো মিনিটের মতো চলে।

সে কানের পেছনের কানকোর মতো যন্ত্রটা দেখাল।

–তোমার যা অক্সিজেন দরকার তা তো সমুদ্রের পানিতেই আছে। অবশ্য যদি তুমি তা বের করতে পার। পাম্প আর ফিল্টার চালানোর মতো শক্তি সম্পন্ন শক্তিকোষ থাকলেই হল। এরকম একটা যন্ত্র দিয়ে আমি দরকার হলে একসপ্তাহও থাকতে পারব। তার বাঁ হাতের কব্জিতে জ্বলজ্বল করা কম্পিউটার ডিসপ্লেতে সে চাপ দিল।

–এটা আমাকে সব তথ্য দেয়। গভীরতা, শক্তিকোষের অবস্থা, ওঠার সময়।

লোরেন আরেকটা বোকার মতো প্রশ্ন করে বসল,

–তুমি একটা মুখোস পড়েছ! কুমার পরোনি কেন?

–না, আমি পড়েছি–কুমার হাসল। ভালো ভাবে খেয়াল কর।

–ওহ, আচ্ছা...খুব সূক্ষ্ম তো!

–তবে ওটা ফালতু– ব্র্যান্ট বলল। যদি তুমি কুমারের মতো সত্যিকার অর্থেই পানিতে থাকতে চাও। আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পানিটা খুব চোখে লাগে। সেজন্য আমি পুরনো মডেলটাই পছন্দ করি। ঝামেলা কম। তৈরি!

–তৈরী, কাপ্তান!

তারা একই সঙ্গে ঢালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। তাদের গতি এতোই মসৃণ যে, নৌকাটা মৃদু দুলল মাত্র। হালের কাচ দিয়ে লোরেন দেখল দু'জনে রশি ধরে সহজ ভাবে চলে যাচ্ছে। সে জানে দেখতে অনেক কম মনে হলেও তারা এখন প্রায় বিশ মিটার নীচে।

যন্ত্রপাতি তার আগেই ফেলা আছে। দুই ডুবুরী দ্রুত মেরামতে লেগে গেল। মাঝে মাঝে ইশারায় কথা বললেও, অধিকাংশ সময়েই তারা নিঃশব্দে কাজ করছিল। প্রত্যেকে নিজের এবং সঙ্গীর কাজ জানে, তাই কথার প্রয়োজনটা কি!

লোরেনের সময় খুব দ্রুত কাটছিল। তার মনে হচ্ছিল আসলেই সে একটা নতুন বিশ্বের দিকে তাকাচ্ছে। প্রাচীন সমুদ্রের ওপর অসংখ্য ভিডিও সে দেখলেও তার নীচের বয়ে যাওয়া এ জীবন সম্পূর্ণই তার অপরিচিত। সেখানে ছন্দময় গোলাকার জেলিফিস, তরঙ্গায়িত গালিচা বা স্ক্রুর মতো প্যাঁচ থাকলেও দ্রুত গতির সত্যিকার মাছ বলতে কোন জিনিস যা কল্পনায় আসে–তার অস্তিত্ব নেই। শুধু একটা টর্পেডোর মতো একটা জিনিস সে একবার দেখল। মনে হয় ওটা পৃথিবীরই কিছু। পানির তলের ইন্টারকমের মধ্যে কথা না শুনলে সে ভাবত, ব্র্যান্ট আর কুমার বুঝি তার কথা ভুলেই গেছে।

–আসছি। বিশ মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে। সবকিছু ঠিক আছে?

–হ্যাঁ। যে মাছটা একটু আগে গেল সেটা কি পৃথিবীর?

–আমি দেখিনি।

–কাকু ঠিক বলেছে ব্র্যান্ট। পাঁচ মিনিট আগে প্রায় বিশ কেজির একটা ট্রাউট মাছ গেছে। তুমি তখন ওয়েল্ডিং করছিলে।

তারা এখন নোঙরের রশি বেয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসছে। পাঁচ মিটার বাকী থাকতে তারা থামল।

–প্রতিটি ডুবের এটা হচ্ছে সবচে একঘেয়ে অংশ –ব্র্যান্ট বলল। আমাদের প্রায় পনের মিনিট থাকতে হবে এখানে। চ্যানেল ১২তে দাও, আর আস্তে–।

চাপমুক্ত হবার সময়কার গানটা নিশ্চয়ই কুমারের পছন্দ। এর তীব্র ঝংকার পানির নীচের ঐ শান্তির জীবনে একদম বেমানান। এর সুরের মধ্যে বন্দী না হওয়ায় লোরেন বেঁচে গেল এবং দুই ডুবুরী ওঠা শুরু করতেই সে ওটা বন্ধ করে দিল।

–সকালের কাজ বেশ ভালো হল –ব্র্যান্ট কাঁপতে কাঁপতে বলল। ভোল্টেজ আর বিদ্যুৎ সমান। এবার আমরা ফিরতে পারি।

যন্ত্রপাতি খুলে রাখাতে লোরেন এর সাহায্য তারা কৃতজ্ঞ চিত্তেই নিল। দু'জনেই কয়েক কাপ উষ্ণ, মিষ্টি তরল (ল্যাসানে চা নামে পরিচিত হলেও পৃথিবীর ওজাতীয় কোন তরলের সঙ্গে তা মেলে না) খেতেই চাঙ্গা হয়ে উঠল। কুমার ইঞ্জিন চালিয়ে রওয়ানা দিল আর ব্র্যান্ট গিয়ারের কাছে একটা ছোট রঙীন বাক্স খুলল।

–না, ধন্যবাদ–লোরেন বলল। যখন তাকে ব্র্যান্ট হালকা নেশার ট্যাবলেট দিল।

–আমি এমন কোন স্থানীয় অভ্যাস নিতে চাইনা যা কিনা সহজে ছাড়া যাবে না। কথাটা বলেই সে অনুতপ্ত হল। তার অবচেতন মনের পাপবোধই তাকে এই মন্তব্যটা করিয়েছে। ব্র্যান্ট অবশ্য এর অন্তর্নিহিত মানে বোঝার কোন লক্ষণ দেখালো না। সে মাথার নীচে হাত দিয়ে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

–দিনের বেলাতেও কিন্তু ম্যাগেলানকে দেখা যায়–প্রসংগটা ঘোরানোর আশায় লোরেন বলল। অবশ্য ঠিক কোন জায়গায় থাকবে, তা তোমাকে জানতে হবে।

–আমি অবশ্য কখনো চেষ্টা করিনি–মিরিসা প্রায়ই দেখে।

কুমার মাঝখানে বলে উঠল।

–আমাকে ও শিখিয়েছে। কোন মহাশূন্যচারীকে ফোন করে প্রদক্ষিণের সময়টা জানবে আর তারপর চিৎ হয়ে কেবল শুয়ে থাকলেই চলবে। ঠিক মাথার উপরে খুব উজ্জ্বল তারার মতো এটা চলতে থাকে। মনে হয় যেন, এটা একদম নড়ছে না। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও যদি অন্যদিকে তাকাও এটাকে তুমি হারিয়ে ফেলবে।

হঠাৎ করেই কুমার ইঞ্জিনটা পুরো বন্ধ করে দিল। লোরেন অবাক হয়ে দেখল যে তারনা অন্ততঃপক্ষে এখনও এক কিলোমিটার দূরে। এ জায়গাটার পাশেই "প" লেখা আর লাল পতাকা ওড়ানো একটা বড় বয়া ভাসছে।

–বন্ধ করলে কেন? লোরেন জিজ্ঞেস করল।

কুমার ছোট একটা পাত্রকে সমুদ্রে খালি করছিল। ভাগ্য ভালো যে এটা এতোক্ষন বন্ধ ছিল।

ভেতরের জিনিসটা অনেকটা রক্তের মতো দেখতে হলেও গন্ধটা খুবই ভয়ংকর। বোটের ছোট্ট সীমার মধ্যে লোরেন যতটা পারল চেপে গেল।

–একজন পুরোনো সাথীকে ডাকছি। ব্র্যান্ট খুবই নরম ভাবে বলল। নড়ো না, শব্দ করো না। সে আবার খুব নার্ভাস।

–সে? লোরেন চিন্তা করল। কি হচ্ছে এসব?

পাঁচ মিনিটের মধ্যে কিছুই হলো না। লোরেন না দেখলে বিশ্বাসই করত না যে কুমার এতোক্ষন নিথর হয়ে বসে থাকতে পারে। তারপর সে দেখল বোট থেকে কয়েক মিটার দূরে, পানির নীচে থেকে একটা কালো, বাঁকা মতো জিনিস উঠে আসছে। সে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে বুঝল, যে এটা একটা বৃত্ত তৈরী করে তাদের ঘিরে ফেলছে। একই সঙ্গে ঠিক ঐ মুহূর্তে বুঝতে পারল যে, কুমার আর ব্র্যান্ট ঐ জিনিসটা দেখছে না, দেখছে তাকে। আচ্ছা তাহলে তারা আমাকে অবাক করতে চাচ্ছে–সে নিজেকেই বলল। বেশ দেখা যাক...

তারপরও যখন লোরেন তার চারপাশে উজ্জ্বল–না, বরং বলা যায় পচে যাওয়া, গোলাপী মাংসের স্তুপকে সমুদ্র থেকে জেগে উঠতে দেখল, তার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে সে চিৎকার দেয়া থেকে বিরত হল। এটা তাদের চারপাশে প্রায় আধা মানুষ সমান উঁচু, গোলাপী একটা দেয়াল তৈরী করেছে। আর সবচে ভয়ংকর হল এর উপরের অংশটা প্রায় পুরোটাই লাল-নীল রং এর মোচরানো সাপ দিয়ে ঢাকা।

গভীর সমুদ্র থেকে অসংখ্য লতানো বাহুসহ একটা বিশাল মুখ তাদের গ্রাস করতে এল... তবে নিশ্চিত যে কোন বিপদ নেই। তার সঙ্গীদের ভাব-ভঙ্গীই তা প্রমাণ করে।

–ওহ ঈশ্বরের, ক্র্যাকানের কসম কি এটা? সে প্রাণপনে গলা স্বাভাবিক রেখেই বলল।

–তুমি চমৎকার সামলেছো? কুমার প্রশংসার সুরে বলল। অনেকে বোটের তলায় গিয়ে লুকায়। এটা অমেরুদন্ডী প্রানীর একটা সমষ্টি, বিশেষ ধরনের বিলিয়ন কোষের সমষ্টি যা একসঙ্গে কাজ করে। এধরনের জিনিস তোমাদের পৃথিবীতেও ছিল–তবে হয়তো এতো বড় নয়।

–তুমি নিশ্চিত থাক সে ব্যাপারে–লোরেন উত্তর দিল। আর যদি কিছু মনে না করো তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি? এটাকে কিভাবে এখানে আনলে? ব্র্যান্ট কুমারের দিকে মাথা ঝাঁকাল। সে তখন ইঞ্জিনকে পুরো শক্তিতে আনতে ব্যস্ত। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চারপাশের জীবন্ত দেয়ালটা অসম্ভব দ্রুততায় আবার গভীরে চলে গেল। একটা বৃত্তাকার পানির ঢেউ ছাড়া আর কোন চিহ্নই রইল না।

–এটা কম্পনকে ভয় পায়, ব্র্যান্ট ব্যাখ্যা দিল। পর্যবেক্ষণ কাচের মধ্য দিয়ে দেখ, পুরো প্রাণীটাকেই দেখতে পাবে।

তাদের নীচে দশ মিটার পুরু, কাঠের ঘড়ির মতো একটা জিনিস সমুদ্র তলের দিকে ফিরে যাচ্ছে। লোরেন এতোক্ষণে বুঝল যে "সাপ" গুলো হচ্ছে কেবল সাঁতারের জন্য লতানো বাহু। পানির ভেতর সেগুলো ভেসে আছে।

–কি দানবরে বাবা! এতোক্ষণ পরে সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল। একটা গর্ব, এমনকি প্রফুল্ল ভাব তার ওপর খেলা করছে। সে কুমার আর ব্র্যান্টের একটা পরীক্ষায় পাশ করেছে। ব্র্যান্ট আর কুমারের কাছ থেকে সে সম্মান আদায় করে নিয়েছে।

–জিনিসটা কি ভয়ংকর না?

–অবশ্যই। সে জন্যই তো ওই বিপদ সূচক বয়া দেয়া।

–সত্যি বলছি, ওটাকে আমার মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

–কেন? ব্র্যান্ট আহত স্বরে জিজ্ঞেস করল, এটা তো কোন ক্ষতি করেনি।

–বেশ, ওরকম আকৃতির প্রাণী নিশ্চয়ই প্রচুর মাছ শিকার করে।

–হ্যাঁ–তবে আমরা শুধুই মাছ খাইনা। আর এই জিনিসটা কিভাবে মাছ ধরে তা নিয়েও বেশ প্রশ্ন ছিল। কারণ সবচে ক্যাবলা মাছগুলোও তো এর ভেতর সাঁতরে যাবে না। মানে দেখা গেল যে, কিছু রাসায়নিক জিনিস এটা নিঃসরণ করে। এরপরই আমরা বৈদ্যুতিক ফাঁদের ব্যাপারে চিন্তা করি। যেটা আমাকে মনে করায়–ব্র্যান্ট তার যোগাযোগের যন্ত্রটার দিকে ঝুকল।

–তারনা তিন। তারনা স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডকে ব্র্যান্ট বলছি। তারটা ঠিক করা হয়েছে। সব কিছু স্বাভাবিক ভাবে চলছে। উত্তরের দরকার নেই। বার্তা শেষ। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে একটা পরিচিত স্বর সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিয়ে উঠল।

–হ্যালো ব্র্যান্ট, ড. লোরেনসন। শুনে খুশী হলাম। তোমাদের জন্য কিছু আকর্ষণীয় খবর আছে। শুনতে চাও?

–অবশ্যই মেয়র, দুজনের পারস্পরিক নিঃশব্দ সম্মতিতে ব্র্যান্ট উত্তর দিল। বলুন।

–কেন্দ্রীয় আর্কাইভ কিছু অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করেছে। এব্যাপারটা আগেও হয়েছে। আড়াই'শ বছর আগে উত্তর দ্বীপে বৈদ্যুতিক তলানী পদ্ধতির মাধ্যমে তারা রীফ বানাতে চেয়েছিল–যে পদ্ধতি পৃথিবীতে খুব ভালো কাজ দিয়েছিল। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর পানির নীচের তারগুলো ছেঁড়া পাওয়া গেল–কিছু চুরিও হয়েছিল। পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল বলে জিনিসটা নিয়ে আর কোন ঘাটাঘাটি করা হয়নি। পানিতে অত খনিজই নেই কাজ করার মতো। সুতরাং রক্ষণশীলদের তুমি দোষ দিতে পারছ না। তাদের ওসময় অস্তিত্বই ছিল না।

ব্র্যান্ট এতোটাই অবাক হল যে, লোরেন হেসে দিল।

–তুমি আমাকে অবাক করতে চাইছ! বেশ তুমি এটা অন্ততঃ প্রমাণ করেছ যে সাগরে অনেক জিনিস আছে যা আমার কল্পনারও বাইরে। কিন্তু এমন কিছু জিনিস ওখানে আছে, যার কল্পনা করা তোমারও অসাধ্য।

২০. স্বপ্ন সময়

তারনার লোকজন প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইল না। তারা মজা করেই বলল,

–প্রথমে তুমি বললে যে তুমি কখনো বোটে ওঠনি। আর আবার এখন তুমি বলছ যে, তুমি সাইকেল চালাতে জাননা।

–তোমার লজ্জা হওয়া উচিত– মিরিসা চোখ টিপে বিদ্রুপ করল। যাতায়াতের সবচাইতে কার্যকর পদ্ধতিটা তুমি কখনো চেষ্টাই করনি।

–মহাকাশযানে তো আর ব্যবহার হয় না। ওদিকে শহরের জন্য ওটা খুব বিপদজনক। লোরেন বাঁচতে চাইল, ঠিক আছে, শিখে নেব।

এবং খুব শিগগিরি সে আবিষ্কার করল, দেখতে যেমন সোজা লাগে বাইসাইকেলে চড়া তার চাইতে ঢের কঠিন। অবশ্য এই ছোট চাকার মেশিনটা যার ভারকেন্দ্র অনেক নীচে, সেখানে থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়া খুব সহজ নয়। তবে প্রাথমিক চেষ্টাটা তার জন্য বেশ হতাশাব্যঞ্জকই ছিল। সে হয়তো ছেড়েই দিত, যদি না মিরিসা তাকে বোঝাত যে এটাই দ্বীপটাকে চেনার জন্য সবচে ভালো বাহন। আর তার নিজস্ব আঁশাটা হল অবশ্য, মিরিসাকে চেনার জন্যও এটাই সবচে ভালো বাহন।

প্রাথমিক কিছু অসুবিধার পর সে বুঝতে পারল কৌশলটা আসলে চালানোর সমস্যাটাকে সজ্ঞান চিন্তার ওপর ছেড়ে না দিয়ে, শরীরের নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার ওপরই ছেড়ে দিতে হয়। এটাই যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত। কেউ যদি প্রতিটি পদক্ষেপই চিন্তা করে দিতে চায়, তবে স্বাভাবিক ভাবে হাঁটা একেবারেই অসম্ভব হবে। অবশ্য এই উপলব্ধিটাকে বুদ্ধি বৃত্তির ভেতর ঠাঁই দিতে লোরেনের কিছুটা সময় লাগল। আর একবার এই বাধা অতিক্রম করার পর, পরবর্তী অগ্রগতিটা হল দ্রুত। এবং সবশেষে তাঁর আশা অনুযায়ীই মিরিসা তাকে দূরের পথগুলোতে ঘোরার জন্য আমন্ত্রণ জানাল।

বসতি থেকে পাঁচ কিলোমিটারও তারা আসেনি। অথচ এর মধ্যেই মনে হচ্ছে যে এই বিশ্বে এখন শুধু তারাই দু'জন আছে। অবশ্য সত্যিকার অর্থে সাইকেল চালানোর সরু পথে তারা তার চাইতে বেশী পথই অতিক্রম করেছে। পথটা সবচাইতে লম্বা করার জন্যই ছবির করে মতো করে তৈরী করা হয়েছে। অবশ্য লোরেন খুব সহজেই তার তাৎক্ষণিক স্থান নির্ণায়ক যন্ত্রটির মাধ্যমে নিজের অবস্থান বের করতে পারে, কিন্তু তার তা করতে ইচ্ছে করছে না। হারিয়ে গেছে– এমন চিন্তা করতেই বরং ভালো লাগে।

যন্ত্রটাকে রেখে আসলেই মিরিসা খুশী হতো।

–ওটা কেন তোমাকে নিতেই হবে? তার বাম কব্জির ব্যান্ডটা দেখিয়ে সে বলল, মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন থাকতেই তো ভালো লাগে।

–আমি জানি, কিন্তু মহাকাশযানের নিয়ম কানুন খুব কড়া। যদি ক্যাপ্টেন বের জরুরী দরকার হয় আর আমি উত্তর দিতে না পারি?

–কি, কি করবে সে? তোমাকে জেলে ভরবে?

–তার ঝাড়ি খাবার চাইতে সেটাই আমি পছন্দ করব। আমি অবশ্য এটাকে নিষ্ক্রিয় রেখেছি। যদি তারপরও মহাকাশযান থেকে যোগাযোগ করে তাহলে সেটা অবশ্যই একটা জরুরী অবস্থায় করবে। আমাকে যেতেই হবে।

হাজার বছর ধরে সমস্ত তেরানদের মতোই লোরেন বরং জন্মদিনের পোশাকে থাকতে চাইবে, কিন্তু ওই যন্ত্রটা ছাড়া সে থাকবে না। পৃথিবীর ইতিহাস অসংখ্য বেপোরোয়া এবং নির্বোধ লোকদের ভয়ংকর মৃত্যুর কাহিনী দিয়ে পূর্ণ–যারা নিরাপদ স্থানের মাত্র কয়েক মিটারের মধ্যে মারা গেছে শুধু মাত্র লাল জরুরী বোতামটায় চাপ না দিতে পারায়।

সাইকেল চালানোর রাস্তাটা নিঃসন্দেহে কোন বড় যানবাহনের জন্য তৈরী হয়নি। এটা এক মিটারেরও কম চওড়া। লোরেনের প্রথম মনে হচ্ছিল সে যেন একটা রশির ওপর দিয়ে চলছে। ঠিক থাকার জন্য সে মিরিসার পেছন দিকে তাকিয়ে ছিল এবং সেটা খুব একটা প্রীতিকর কাজ নয়। তবে কয়েক কিলোমিটারের পর তার আত্মবিশ্বাস চলে এল। সে পাশের দৃশ্য উপভোগ আরম্ভ করল। অন্যদিক থেকে কাউকে আসতে দেখলে দু'পক্ষকেই নেমে যেতে হবে। পঞ্চাশ ক্লিক গতিবেগে চলা দুটো সাইকেলের সংঘর্ষ চিন্তাই করা যায় না। বিধ্বস্ত একটা বাই সাইকেল নিয়ে বাসার দূরত্বটা একটু বেশীই হয়ে যায়।

রাস্তাটা নিথর, নিস্তব্ধ, মিরিসা কোন অন্যরকমের গাছ বা সুন্দর জায়গা দেখানোর সময় থেমে যাচ্ছিল। এরকম নিস্তব্ধতার অভিজ্ঞতা লোরেনের সারা জীবনে হয়নি। পৃথিবী সব সময়ই শব্দময় ছিল–আর মহাকাশযানের জীবনতো পুরোটাই যান্ত্রিক শব্দের ছন্দে ভরা, কেবল মাঝে মাঝে ভয়ংকর সব অ্যালার্মের শব্দ ছাড়া।

আর এখানে গাছগুলো যেন একটা অদৃশ্য, শব্দশোষণ করা কম্বলে ঢাকা। তাই প্রতিটি শব্দই মুখ থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। প্রথম পথম এটা

ভালোই লাগে। কিন্তু লোরেনের এখন মনে হচ্ছে, এই শূন্যতা ভরার মতো কিছু থাকা উচিত। একবার সে মনে করল তার যোগাযোগের যন্ত্রের হালকা আবহ সঙ্গীতটা বাজায়। কিন্তু মিরিসার আপত্তির কথা মনে রেখে, সেটা আর করা হল না।

তাই যখন দূরের গাছগুলোর ভেতর দিয়ে পরিচিত হয়ে আসা থ্যালসানদের নাচের সুর শুনতে পেল সে রীতিমতো অবাকই হল। কিন্তু সরু রাস্তাটা যেহেতু দু'তিনশ মিটারের বেশি খুব একটা সোজা যায় না তাই একটা তীক্ষ্ণ বাঁক নেয়ার আগ পর্যন্ত সে বুঝতেই পারল না, সুরটা কোত্থেকে আসছে। বাঁকের পরই একটা বিশাল সুরময় যন্ত্র তাদের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল। তারা নেমে যখন এটাকে পাশ দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল, তখন লোরেন বুঝল যে, আসলে জিনিসটা কি। এটা একটা স্বয়ংক্রিয় রাস্তা মেরামতকারী।

–বাজনাটা কি জন্যে? সে জিজ্ঞেস করল, এর কাজের সঙ্গে তো খাপ খায় না। সে যখন এটা নিয়ে ঠাট্টা করছে তখন যন্ত্রটা তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল আর কয়েকবার বলল –আমার আশেপাশের একশ' মিটারের সীমার মধ্যে রাস্তায় উঠবেন না। ওটা এখনো শক্ত হচ্ছে। আমার আশেপাশের একশ' মিটারের সীমার মধ্যে রাস্তায় উঠবেন না। ওটা এখনো শক্ত হচ্ছে। ধন্যবাদ। মিরিসা হেসে উঠল তার অবাক হওয়া দেখে।

–তুমি ঠিকই বলেছ। এটা খুব বুদ্ধিমান নয়। সুরটা হচ্ছে রাস্তার অন্যদের সাবধান করার জন্য।

–এর জন্য সাইরেন কি আরও ভালো হতো না?

–হতো, কিন্তু ওটা কেমন অবঙ্কুসুলভ মনে হয়।

তারা সাইকেল থামিয়ে সংযুক্ত ট্যাঙ্ক, কন্ট্রোল মেশিন, রাস্তা মসৃণ করার যন্ত্র চলে যাবার জন্য অপেক্ষা করল। লোরেন রাস্তাটা স্পর্শ না করে থাকতে পারল না। নতুন রাস্তাটা উষ্ণ, সামান্য ফুলে ওঠা এবং দেখতে ভেজা হলেও একদম শুকনো। অবশ্য সেকেন্ডের মধ্যে এটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল। লোরেনের আঙ্গুলের ছাপ হালকা ভাবে ফুটে রইল রাস্তায়। তার মনে হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল –থ্যালসায় আমার চিহ্ন রয়ে গেল–যতদিন না রোবটটা আবার ফিরে আসে। রাস্তাটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাচ্ছিল। লোরেন তার উরু আর পায়ের অপরিচিত মাংসপেশীগুলোর আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিল। এর জন্য বাড়তি শক্তির দরকার হলেও মিরিসা বৈদ্যুতিক শক্তি হিসেবে কাজ করল। মিরিসা যেহেতু গতি এতোটুকুও কমায়নি, লোরেন কিভাবে কমায়? সুতরাং জোরে শ্বাস নিয়ে লোরেন তাকে ধরে ফেলল।

সামনের হালকা গুঞ্জনটা কিসের? নিশ্চয়ই দক্ষিণ দ্বীপে কেউ কোন রকেট ইঞ্জিন পরীক্ষা করছে না! তারা সামনে প্যাডেল মারতেই আওয়াজটা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। দেখার এক মুহূর্ত আগে লোরেন জিনিসটা বুঝতে পারল। পৃথিবীর মানদন্ডে

জলপ্রপাতটা খুব আহামরি নয়–সম্ভবত একশ' মিটার উঁচু আর বিশ মিটার চওড়া। এর শেষ মাথায় ঝকঝক করা একটা ধাতব ব্রীজ আছে।

মিরিসা সাইকেল দিয়ে নেমে তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে বলল,

–অদ্ভুত কিছু দেখছ?

–কি অদ্ভুত? চারদিকে দেখতে দেখতে লোরেন উত্তর দিল। যা দেখা যাচ্ছে তা হলো গাছ আর গুল্মের ঘন জঙ্গল, আর রাস্তাটা জলপ্রপাতের অপর পাশে চলে গেছে।

–গাছ, গাছগুলো!

–কি তাতে? আমি উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নই।

–আমিও না। কিন্তু ভালোভাবে দেখো–তাহলেই বুঝবে।

সে তবুও হতবুদ্ধি হয়েই তাকাল। আর হঠাৎই সে বুঝতে পারল–কারণ গাছগুলো প্রতিটি একটা প্রাকৃতিক প্রকৌশলের অংশ। আর সে নিজেও একজন প্রকৌশলী। জলপ্রপাতের এপাশে কোন অন্য প্রকৌশলী কাজ করেছে। সে যদিও গাছগুলোর নাম বলতে পারবেনা, কিন্তু সেগুলো চেনা চেনা লাগছে –নিশ্চয়ই ওগুলো পৃথিবীর ...হ্যাঁ নিশ্চয়ই ওটা ওক। আর বহু আগে কোন জায়গায় সে ওই ছোট ঝোপের চমৎকার হলুদ ফুলগুলো দেখেছিল।

কিন্তু ব্রীজের ওপাশে একটা আলাদা জগৎ। গাছগুলো– ওগুলো কি সত্যিই গাছ?

কেমন অসম্পূর্ণ আর কদর্য। কিছু আছে খুব ছোট মোটা কান্ডবিশিষ্ট যা দিয়ে ছোট কিছু শাখা বের হয়েছে। অন্যগুলো বিশাল ফার্ণের মতো। অন্যগুলো দানব বিশেষ, কঙ্কালসার শাখার সংযোগে গর্ত আর কোন ফল নই...

–বুঝতে পেরেছি। থ্যালসার আসল উদ্ভিদ।

–হ্যাঁ, সমুদ্র থেকে মাত্র কয়েক মিলিয়ন বছর হল এরা ডাঙায় এসেছে। আমরা এটাকে পার্থক্য রেখা বলি। কিন্তু আসলে এটা হল মুখোমুখি যুদ্ধরত দুটো সেনাবাহিনী। এবং কেউই জানে না, কে জিতবে। আমরাও সাহায্য করতে পারব না। পৃথিবীর উদ্ভিদগুলো উন্নত প্রজাতির। কিন্তু স্থানীয়গুলো গ্রহের আবহাওয়ার সঙ্গে ভালো পরিচিত। সময় সময় একদল আরেকটা গ্রাস করতে চায়। তবে তখন আমরা থামিয়ে দেই।

–কি অদ্ভুত, ছোট্ট ব্রীজটার ওপর দিয়ে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে লোরেন ভাবল। থ্যালসায় নেমে আমার মনে হচ্ছে যে, সত্যি আমি এক ভিনগ্রহে এসেছি... এই অগোছাল গাছ আর বিকট ফার্ণগুলো কয়লা খনি তৈরী করে, যা মানব জাতিকে শিল্পবিপ্লবের শক্তি দিয়েছিল–তাই এক সময়ে মানবজাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তার মনে হচ্ছিল যেন এখনই একটা ডাইনোসর এসে আক্রমণ করবে–অবশ্য তারপরই তার মনে পড়ল যে, ঐ ভয়ংকর সরীসৃপ আসতে আরও একশ' মিলিয়ন বছর লাগবে যদি পৃথিবীর মতো এই গ্রহ ফুলে ফলে শোভিত হয়। ফিরে আসার সময় লোরেন বিরক্তি প্রকাশ করল–ধুত্তোর! ক্র্যাকান!

–কি হয়েছে?
লোরেন মসের মতো দেখতে একটা ঘন আস্তরে আটকা পড়েছে।
–উহ! দাঁতে দাঁত চেপে সে পায়ের পেশীগুলোকে চেপে ধরল।
–দেখি। মিরিসা আত্মবিশ্বাসী মনোযোগের সুরে বলল।
তার আরামদায়ক, অভিজ্ঞ যত্নে খিচ লাগাটা ছেড়ে গেল।
–ধন্যবাদ, লোরেন কিছুক্ষণ পর বলল–অনেকটা ভালো লাগছে। বন্ধ করো না।
–তোমার কি সত্যি তাই মনে হয়? মিরিসা ফিসফিসিয়ে বলল।
এবং দুই বিশ্বের মাঝে তারা হঠাৎ এক হয়ে গেল।

ক্র্যাকান

২১. একাডেমী

থ্যালসার একাডেমীর সদস্যপদ অত্যন্ত কঠোর ভাবে একটা সুন্দর বাইনারী নম্বর ১০০০০০০০০–বা আঙ্গুলে গুনলে ২৫৬-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ম্যাগেলানের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এই কড়াকড়িটাকে সমর্থন করেন। এটা মান বজায় রাখতে সাহায্য করে। একাডেমী তাদের দায়িত্বটাকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নেয়। এবং প্রেসিডেন্ট তার কাছে স্বীকার করলেন যে এই মুহূর্তে মাত্র ২৪১ জন সদস্য আছে এবং শূন্য স্থানগুলোর জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন লোক পাওয়া যায়নি।

২৪১ জনের মধ্যে ১০৫ জনের মতো সশরীরে মিলনায়তনে উপস্থিত আছেন–আর ১১৬ জন তাদের যোগাযোগের যন্ত্রের সাহায্যে সংযোগে আছেন। এটা একটা রেকর্ড উপস্থিতি –ড. অ্যানি ভার্লে খুব পুলকিত হচ্ছিলেন। যদিও বাকি বিশ জনের অনুপুস্থিতির ব্যাপারে তার কৌতুহল ছিল।

আর পৃথিবীর একজন অন্যতম জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হতেও তার সামান্য অস্বস্তি লাগছিল –যদিও ম্যাগেলানের পৃথিবী ত্যাগের পর কথাটা সত্যিই। প্রাক্তন স্কলোডস্কি লুনার মানমন্দিরের, প্রাক্তন পরিচালক হিসেবে কেবলমাত্র সময় ও সুযোগের কারণেই সে এরকম একটা সুযোগ পেয়েছে। সে খুব ভালো ভাবেই জানে সে আর্কলে বা চন্দ্রশেখর বা হার্শেলের মতো বিশালদের সঙ্গে তুলনা করার মতোই যোগ্য নয় –গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস বা টলেমীর কথাতো বাদই।

'টা দেখুন, সে আরম্ভ করল। আমি নিশ্চিত যে, আপনারা সবাই সাগান-২ এর ৩২ ম্যাপটা দেখেছেন। বেতার হলোগ্রাম আর বিকিরণ থেকে এপর্যন্ত করা গেছে। বিস্তারিত কিছুই নেই–বড়জোড় দশ কিলোমিটার পার্থক্য করা যায়। তবে আমাদের মূল তথ্যের জন্য এটাই যথেষ্ঠ।

এর ব্যাস হচ্ছে পনেরোশো কিলোমিটার –পৃথিবীর চেয়ে সামান্য বড়। নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ অত্যন্ত ঘন আবহাওয়ামন্ডল। এবং সৌভাগ্যই বলতে হবে যে কোন অক্সিজেন নেই।

"সৌভাগ্য" কথাটা সব সময়ই মনোযোগ আকর্ষণ করে। শ্রোতারা একটু নড়ে চড়ে বসলেন।

আমি বুঝতে পারছি, আপনারা অবাক হয়েছেন। শ্বাস নেবার ব্যাপারে প্রতিটি মানুষেরই একটা পক্ষপাতিত্ব আছে। কিন্তু ধ্বংসের আগের দশকগুলোতে মহাবিশ্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ঘটনার কারণেই বদলে গিয়েছে।

বর্তমান এবং অতীতে যেহেতু কোন জীবিত প্রাণীর খোঁজ আমাদের সৌরজগতে পাওয়া যায়নি এবং ষোলটি দেশের "সেটি" (SETI) প্রোগ্রামের ব্যর্থতা প্রত্যেককে মানতে বাধ্য করল যে, মহাবিশ্বের অন্য কোথাও জীবন থাকার সম্ভাবনা খুবই কম, আর তাই জীবন অত্যন্ত মূল্যবান।

তাই বলা হলো যে, সব ধরনের জীবনকেই সম্মান করতে হবে এবং তাদের যত্ন নিতে হবে। অনেকে এমনও বললেন যে, ক্ষতিকর পরজীবি এবং অসুখের পোষকগুলোও ধ্বংস করা ঠিক না –বরং তাদের কঠিন সতর্কতার মধ্যে রেখে দেয়া উচিত। "জীবনের প্রতি সম্মান" শ্লোগানটি শেষের দিকে পৃথিবীতে একটা জনপ্রিয় শ্লোগান ছিল। এবং অনেকে বিশেষতঃ মানুষের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করতেন।

জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারটি যখন একটি নীতিতে পরিণত হল, তখনই কিছু বাস্তব ঘটনার জন্ম হলো। সিদ্ধান্ত হলো, মানুষ কোন বুদ্ধিমান জগতে বসতি স্থাপন করবে না। নিজস্ব পৃথিবীতেই মানুষের অত্যন্ত খারাপ ইতিহাস আছে। সৌভাগ্যবশতই হোক আর দুর্ভাগ্যবশতই হোক সে অবস্থা অবশ্য আর হচ্ছে না।

কিন্তু তর্কটা এখানেই থামল না। ধরা যাক, মাত্র প্রাণীজগৎ হয়েছে, এমন একটা গ্রহ আমরা পেলাম। আমরা কি বিবর্তনকে তার নিজস্ব পথে এগুতে দেবো, যাতে বহুবছর পরে যদি বুদ্ধিমান জীব জন্মায়, সেই আশায়।

কিংবা আরও পেছনে যাই যেখানে কেবল উদ্ভিদ জগৎ বা শুধু আণুবীক্ষনিক জীব আছে। আপনাদের হয়তো অবাক লাগছে যে, যখন মানুষের নিজের জীবনই বিপন্ন তখনও মানুষ এধরণের বিমূর্ত আদর্শ আর দার্শনিক প্রশ্ন নিয়ে তর্ক করছিল। কিন্তু মৃত্যুই মনকে সত্যিকারের সব প্রশ্নের দিকে একত্রীভূত করে –আমরা কেন এখানে আছি এবং আমাদের কি করা উচিত?

"সর্বোচ্চ আইন" আমার ধারণা আপনারা সবাই শব্দটা শুনেছেন –খুব জনপ্রিয় শব্দ ছিল। সমস্ত বুদ্ধিমান প্রাণীর জন্য কোন নৈতিক নির্দেশনা তৈরী করা সম্ভব, শুধুমাত্র পৃথিবী গ্রহে রাজত্ব করা দ্বিপদ, বায়ু গ্রহণকারী প্রাণীর জন্য যা প্রযোজ্য হবে না। ঘটনাক্রমে, ড. ক্যালডর ছিলেন এই বিতর্কের একজন নেতা। যারা ভাবত "হোমোস্যাপিয়েন" একমাত্র বুদ্ধিমান জীব হিসেবে গণ্য থাকায় তাদের বেঁচে থাকাটাই সবকিছুর ওপর প্রাধান্য পাওয়া উচিত, তাদের বিরুদ্ধাচারণ তাকে বেশ অজনপ্রিয় করে তুলেছিল। "মানুষ না নোংরা জেলি–আমরা মানুষের পক্ষে" এধরনের শ্লোগানও তোলা হল। তবে সৌভাগ্যবশতঃ আমরা যতদুর জানি যে কোন সরাসরি সংঘাত হয়নি। সমস্ত বীজ বহনকারী মহাকাশযান হতে তথ্য পেতে আরও শতাব্দী লাগবে। আর যদি কেউ কোন সংবাদ নাই পাঠায় –বেশ, ধরে নেয়া হবে যে নোংরা জেলি ফিসগুলোই জিতে গেছে...

৩৫০৫ সালে, বিশ্ব সংসদের চূড়ান্ত অধিবেশনে কিছু মূলনীতি– যা জেনেভা ঘোষণা হিসেবে বিখ্যাত তাতে ভবিষ্যতে অন্য গ্রহে বসতি গড়ার ব্যাপারে কিছু নীতি গৃহীত হল। মনে হতে পারে এটা খুব বেশী মাত্রায় আদর্শিক, তবে আর কোন দিকে যাবার রাস্তা তাদের ছিল না। সেটা ছিল মহাবিশ্বের প্রতি মানুষের শেষ ভালোবাসার প্রকাশ, যা উপলব্ধির ক্ষমতা এর কোনদিনই হবে না। সেই নিদের্শনাগুলোর একটি নীতি আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। যদিও এটা সবচাইতে অভিনন্দিত আর বিতর্কিত তবে এটাই আমাদের আরও কয়েকটা সম্ভাবনাময় লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দিয়েছে। কোন গ্রহের আবহাওয়া মন্ডলে কয়েক ভাগ অক্সিজেন, সে গ্রহে জীবনের নির্ভুল চিহ্ন। এ জিনিসটা এতো বেশী মাত্রায় বিক্রিয়াশীল যে এটাকে মুক্ত অবস্থায় পেতে হলে একে ক্রমাগত উদ্ভিদ বা ওই জাতীয় কোন উৎস হতে আসতে হবে। অবশ্যই অক্সিজেন মানে প্রাণী জগৎ নয়, তবে তার জন্য একটা ইশারা। এবং যদিও প্রাণী জগৎ খুব কমই বুদ্ধিমত্তার দিকে যায়, তবে অন্য কোন পদ্ধতি এখনও দেখা যায়নি।

তাই সর্বোচ্চ আইন অনুসারে অক্সিজেন সমৃদ্ধ গ্রহগুলো নিষিদ্ধ। অবশ্য আমার মনে হয় যে, কোয়ান্টাম ড্রাইভ যদি আমাদের অসীম ক্ষমতা আর শক্তি না দিত তাহলে এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়া হতো না। ।

এখন আমি আমাদের পরিকল্পনা বলছি। সাগান-২-তে আমরা যখন পৌঁছাবো, আপনারা সবাই ম্যাপে দেখছেন যে অর্ধেকের বেশী গ্রহ বরফে ঢাকা –প্রায় তিন কিলোমিটার পুরু। চূড়ান্ত কক্ষ ঠিক করার সময় ম্যাগেলান তার কোয়ান্টাম ড্রাইভ ব্যবহার করবে। ড্রাইভের পুরোটা বা আংশিক একটা টর্চ হিসেবে কাজ করে বরফকে গলিয়ে ফেলবে এবং একই সঙ্গে বাষ্পটাকে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে পরিণত করবে। হাইড্রোজেন খুব শিগগিরি মহাবিশ্বে উড়ে যাবে। প্রয়োজনবোধে আমরা এটাকে লেজার দিয়ে আরও দ্রুত করতে পারি। অক্সিজেন থেকে যাবে।

বিশ বছরেই সাগান-২ আবহাওয়া মন্ডলে দশ ভাগ অক্সিজেন থাকবে। যদিও নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসে এটা ভর্তি থাকবে। আমরা সে সময় বিশেষভাবে অভিযোজিত ব্যাকটেরিয়া বা এমনকি গাছও নামাতে পারি পদ্ধতিটাকে দ্রুত করতে। তবে এতো উত্তাপ সরবরাহের পরও গ্রহটার তাপমাত্রা থাকবে অত্যন্ত শীতল। নিরক্ষীয় অঞ্চলে দুপুরে কয়েক ঘন্টা ছাড়া সমস্ত গ্রহের তাপমাত্রা থাকবে শুন্যের নীচে।

তাই তখন আমরা আমাদের কোয়ান্টাম ড্রাইভ ব্যবহার করব– সম্ভবতঃ শেষ বারের মতো। ম্যাগেলান–যা তার সারা জীবন মহাশূন্যে কাটিয়েছে– অবশেষে গ্রহের মাটিতে নেমে আসবে।

এবং তারপর কোন পাথুরে ভূমির উপর প্রতিদিন পনেরো মিনিটের জন্য কোয়ান্টাম ড্রাইভ চালানো হবে। আমরা জানি না পুরো অভিযানে কত সময় লাগবে,

যতক্ষন না আমরা প্রথম পরীক্ষাটা করব। এমনকি প্রথম জায়গাটা ভূতাত্ত্বিকভাবে স্থির না হলে, আমাদের জাহাজকে আবারও সরাতে হতে পারে।

প্রাথমিক ভাবে মনে হয়, ড্রাইভটাকে প্রায় তিরিশ বছর ধরে ব্যবহার করতে হবে। যতক্ষণ না গ্রহের ঘূর্ণন যথেষ্ঠ পরিমান আস্তে হয়, যাতে সূর্যের রশ্মি এর পৃষ্ঠে উষ্ণতা আনবার মতো সময় পায়। এরপর গ্রহের কক্ষপথকে বৃত্তাকার করতে আরও প্রায় পঁচিশ বছর ড্রাইভ চালাতে হবে। তবে তার অনেক আগেই সাগান-২ বাসযোগ্য হবে –অবশ্য চূড়ান্ত কক্ষে না আসা পর্যন্ত শীতটা ঠিকভাবে কাটবে না।

তাহলে আমরা পাচ্ছি একটা কুমারী গ্রহ–পৃথিবীর চাইতে বড়, চল্লিশ ভাগ সমুদ্র আর পঁচিশ ডিগ্রী তাপমাত্রাসহ। আবহাওয়া মন্ডলে পৃথিবীর তুলনায় সত্তর ভাগ অক্সিজেন থাকবে– যেটা আরও বাড়বে। সে সময় শীতনিদ্রায় থাকা মানুষকে জাগিয়ে তোলা হবে এবং তাদের দেয়া হবে নতুন এক গ্রহ।

এটা হচ্ছে সম্ভাব্য চিত্র, যদি না কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা আবিষ্কার ঘটে, যার জন্য আমরা সরে দাঁড়াতে বাধ্য হব। আর যদি সবচাইতে খারাপটা আসে তাহলে তো

ড. ভার্লে ইতস্ততঃ করলেন, তারপর মৃদু হাসলেন।

–না, যাই হোক না কেন, আপনারা আমাদের আর দেখবেন না। যদি সাগান-২ সম্ভব না হয়, তাহলে আরেকটা লক্ষ্য আছে। সেটা আরও তিরিশ আলোক বর্ষ দূরে। সেটা হয়তো আরও ভালো হবে।

হয়তো আমরা দুটোতেই বসতি করব। তবে তা বলার সময় এখনও হয়নি।

আলোচনাটা আরম্ভ হতে একটু সময় নিল। সভ্যদের অধিকাংশই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

তাদের প্রেসিডেন্ট, দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যিনি আগে থেকেই কিছু প্রশ্ন তৈরী করে রাখেন– তিনিই আরম্ভ করলেন।

–একটা সামান্য প্রশ্ন, ড. ভার্লে। সাগান-২ কার বা কিসের নামে রাখা?

–তৃতীয় শতাব্দীর একজন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীকারের নামে।

প্রেসিডেন্টের প্রত্যাশা মতোই এটা জমাট বরফকে ভেঙ্গে দিল।

–ড. আপনি বলেছেন সাগান-২ এর একটা উপগ্রহ আছে। আপনারা কক্ষ পরিবর্তনের সময় ওটার কি করবেন?

–কিছু না, অল্প এদিক সেদিক করতে পারি হয়তো! এটা তার আপন পথেই ঘুরবে।

–যদি নীতিমালা –কত যেন–৩৫০০, ৩৫০৫ এর আগে প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে আমরা কি এখানে থাকতাম? মানে থ্যালসাও কি নিষেধের আওতায় পড়ত?

–এটা খুব ভালো প্রশ্ন। আমরাও এটা নিয়ে তর্ক করি। ২৭৫১ সালে যে মহাকাশযানটা –অর্থাৎ আপনাদের দক্ষিণ দ্বীপের মহাকাশযানটা অবশ্যই এই নীতির বিরুদ্ধে যেত। তবে সৌভাগ্যবশতঃ তখন সমস্যাটা জাগেনি। আর যেহেতু এখানে কোন স্থলচর প্রাণী নেই, সেহেতু হস্তক্ষেপের প্রশ্ন এখানে উঠছে না।

—এটা তো অনুমানমূলক। একজন তরুণ সদস্য বয়স্কদের হাসাহাসি সত্ত্বেও বলে উঠল। অক্সিজেন মানেই যে জীবন তা মেনে নিলেও, তার উল্টোটা যে সম্ভব নয় সেটা সম্বন্ধে আপনারা কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন ? কোন অক্সিজেন এমনকি কোন আবহাওয়ামন্ডল ছাড়া গ্রহেও তো প্রাণী—এমনকি বুদ্ধিমান প্রাণীও থাকতে পারে। অনেক দার্শনিকও তো বলেছেন যে, যদি আমাদের পূর্বপুরুষরা মেশিন হতেন তা হলে তারা জং পড়ে না এমন আবহাওয়া পছন্দ করতেন। সাগান-২ কত পুরোনো? যদি এমন হয় যে তারা অক্সিজেন ভিত্তিক জীবন পেরিয়ে গেছে— সেখানে একটা যান্ত্রিক সভ্যতা অপেক্ষা করছে।

দর্শকদের মধ্য থেকে কিছু গোঙানীর শব্দ ভেসে এল, কেউ বিদ্রুপের সুরে বলল "কল্পকাহিনী।" দর্শকদের বিরক্তি দূর হবার জন্য ড. ভার্লে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বিস্তারিত ভাবে বললেন,

—সেটা ভেবে আমরা ঘুম নষ্ট করতে রাজি নই। আমরা যদি কোন সম্পূর্ণ যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে গিয়ে পড়ি তাতে আমাদের হস্তক্ষেপ না করার নীতি কোন প্রভাব ফেলবে না। বরং আমি বেশী ভয় পাব যে ঐ সভ্যতা আমাদের প্রতি কি করবে।

একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি—থ্যালসায় ড. ভার্লের দেখা সবচে বয়স্ক লোক, রুমের পেছন দিকে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। চেয়ারম্যান একটা দ্রুত নোট পাঠালেন, প্রফেসর ডেরেক উইন্সলেড ১১৫—সজেব থ্যাব, বিজ্ঞান-ঐতিহাসিক। ড. ভার্লে 'সজেব'-এর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎই তিনি বুঝতে পারলেন 'সজেব' মানে হচ্ছে সর্ব জেষ্ঠ্য ব্যক্তি।

তিনি ভাবলেন, এটাই স্বাভাবিক যে ল্যাসান বিজ্ঞানের ডীন কোন ঐতিহাসিকই হবেন। সাতশ' বছরের ইতিহাসে তিনটা দ্বীপ হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র মৌলিক চিন্তাবিদের জন্ম দিয়েছে।

এটা অবশ্য মেধার সমালোচনা নয়। ল্যাসানদের শূন্য থেকে অবকাঠামো তৈরি করতে হয়েছে। বাস্তব প্রয়োগ নেই এমন কোন গবেষণার সুযোগ বা চেষ্টা ছিল না। এছাড়া আর একটা বড় সমস্যা হল জনসংখ্যা। কোন মৌলিক গবেষণা করার জন্য যতগুলো নূন্যতম মস্তিষ্কের প্রয়োজন তা কখনোই থ্যালসায় পাওয়া সম্ভব নয়।

কেবলমাত্র গণিত-সঙ্গীতের মতোই একটা বিরল ব্যতিক্রম। রামানুজ বা মোজার্টের মতো একজন নিঃসঙ্গ প্রতিভাবান হঠাৎ করে এরকম একটা অদ্ভুত সাগর পাড়ি দেবার ক্ষমতা রাখে। ফ্র্যান্সিস জোলান (২১৪-২৪২) এমন একজন বিখ্যাত ল্যাসান বিজ্ঞানী। পাঁচশ বছর পরও তার নাম উচ্চারিত হয়। তবে তার সন্দেহাতীত প্রতিভা সমন্ধেও ড. ভার্লের কিছু মন্তব্য আছে। তা হলো, তার পর্যবেক্ষণে, কেউই এখানে হাইপারট্রান্সফিনেট সংখ্যার ওপর তার কাজকে বুঝতেই পারেনি। সেগুলো আর সম্প্রসারিতও হয়নি। সেটা তার মেধাকেই অবশ্য প্রমাণ করে। এমনকি, এখন পর্যন্ত তার শেষ 'প্রস্তাবিত তত্ত্ব' কে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হিসেবে ধরা হয়।

সে সন্দেহ করে– যদিও সেটা তার ল্যাসান বন্ধুদের সামনে খুব সতর্কতার সাথে তুলে ধরে যে জোলানের দুঃখজনক মৃত্যু তার খ্যাতিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বেঁচে থাকলে তার মাথা আরও কি বের করত-- এই ভেবে। উত্তর দ্বীপে সাঁতার কাটার সময় তার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নিয়ে অনেক রোমান্টিক মিথ আর তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে– ভালোবাসায় ব্যর্থতা, প্রতিহিংসা, জটিল আবিষ্কারের ব্যর্থতা, হাইপার ইনফিনেটের ভীতি– অবশ্য কোনটাই আসল সত্যটাকে তুলে ধরে না। তবে সবাই থ্যালসার জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বকে এভাবেই দেখে– সবচে মেধাবী যে কিনা তার সাফল্যের চূড়ায় থেকে বিদায় নিলেন।

বৃদ্ধ প্রফেসর কি বলছেন? ওহহো–সব সময়ই আলোচনার সময় এমন একজনকে পাওয়া যাবে যে কিনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বা নিজস্ব কোন তত্ত্ব হাজির রাখবে। সাধারণতঃ একটা হাসি দিয়েই ড. ভার্লে এদের মোকাবেলা করেন। কিন্তু তাকে তো সজেব'র এর প্রতি আরও নম্র হতে হবে –যেখানে তিনি তার অনুজপ্রতিম সহকর্মীদের মাঝে সম্মানিত আসনে আছেন।

–প্রফেসর-অ্যাঁ-উইন্সডেল-"উইন্সলেই"–চেয়ারম্যান ফিসফিসিয়ে বললেন।

অবশ্য ড. ভার্লে জানেন যে কোন শোধরানোর চেষ্টা ব্যাপারটাকে আরও ঘোলাটে করবে।

–আপনার প্রশ্ন খুব ভালো হলেও তা আরেকটা আলোচনার ব্যাপার। বা আসলে অনেকগুলো আলোচনার ব্যাপার– এমনকি তারপরও বিষয়বস্তুটা ভালোভাবে বোঝা যাবে কিনা সন্দেহ।

তবে আপনার প্রথম পয়েন্টটার ব্যাপারে বলছি। এই সমালোচনা প্রায়ই আমরা শুনলেও, জিনিসটা ঠিক নয়। আপনাদের কথামতো কোয়ান্টাম ড্রাইভের গোপন তত্ত্ব আমাদের ভেতরে আমরা লুকিয়ে রাখতে চাইছি–কথাটা ঠিক নয়। পুরো তত্ত্বটা মহাকাশযানের আর্কাইভে আছে।

আপনাদের যে জিনিসগুলো দেয়া হয়েছে তার মধ্যেও তত্ত্বটা আছে।

কিন্তু এটা বলে আমি আপনাদের হতাশ করতে চাই না। মহাকাশযানের কোন ক্রু এই তত্ত্বটা পুরোপুরি বোঝে না। আমরা কেবল এটা ব্যবহার করতে পারি মাত্র। কেবল মাত্র তিনজন বিজ্ঞানী শীতনিদ্রায় আছে যারা এই ড্রাইভের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। সাগান-২-এ পৌঁছার আগে তাদের জাগিয়ে তোলাটা আমাদের জন্য বিশাল অসুবিধার ব্যাপার।

সুপারস্পেসের জিওমেট্রোডাইনামিক কাঠামোকে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ দিতে গিয়ে মানুষ পাগল হতে বাকী থেকেছে। মহাবিশ্ব কেন এগার মাত্রার, যেখানে দশ বা বার মাত্রার সুন্দর সাম্য নেই– এ কথার প্রশ্ন এখনো অজানা। আমি যখন উৎক্ষেপণের প্রাথমিক প্রশিক্ষণে যাই, আমার প্রশিক্ষক বলেছিলেন, "কোয়ান্টাম ড্রাইভ যদি তুমি বুঝতেই পারতে, তাহলে তুমি এখানে আসতেই না। তুমি ল্যাগরেঞ্জ-১ এর অগ্রসর

বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে থাকতে। এবং তার এই কথাটা আমাকে ঘুমাতে সাহায্য করেছিল। কারণ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি থ্রি সেন্টিমিটার জিনিসটার কল্পনার চেষ্টা আমার দুঃস্বপ্নের ভেতর দেখা দিচ্ছিল।

আমার প্রশিক্ষক আমাকে বলেছিলেন, "ম্যাগেলানের ক্রুরা শুধু ড্রাইভটা কিভাবে কাজ করে সেটা জানবে। বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলীদের মতো তাদের কাজ। শক্তিটা কিভাবে ব্যবহার করা যায় এটা জানলেই হবে। শক্তিটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে তা জানার দরকার নেই। সাধারণ তেল চালিত ডায়নামো, কিংবা সৌর শক্তি বা জলবিদ্যুতের মতো সহজ ভাবে সেটা তৈরী হতে পারে।

অথবা আরও কোন জটিল ভাবেও বিদ্যুৎ আসতে পারে। যেমন ফিউশন রিএ্যাক্টর, বা থার্মোনিউক্লিয়র ফিউশন বা মাও ক্যাটালাইজার বা পেনরোজ নোড অথবা হকিং স্করশিল্ড কারনেল–মানে অনেক ভাবেই। কোন এক জায়গায় তাদের বোঝার চেষ্টা ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু তা হলেও তারা প্রত্যেকে যোগ্য প্রকৌশলী, প্রয়োজন মতো তারা বৈদ্যুতিক শক্তি চালু বা বন্ধ করার যোগ্যতা রাখে।

ঠিক সে ভাবেই আমরা ম্যাগেলানকে পৃথিবী থেকে থ্যালসা পর্যন্ত নিয়ে এসেছি, আশা করি সাগান-২ পর্যন্ত নিতে পারব–কিন্তু কিভাবে করছি, সেটা না জেনেই। তবে হয়তো একদিন, সম্ভবতঃ শতাব্দীর মধ্যেই আমরা কোয়ান্টাম ড্রাইভ তৈরীর মতো মেধাবীদের তৈরী করতে পারব।

আর-কে জানে? আপনারা হয়তো আমাদের আগেই পারবেন। ভবিষ্যতে একজন ফ্র্যান্সিস জোলান হয়তো থ্যালসায় জন্মাবে। তখন আপনারাই আমাদের দেখতে আসবেন। সে অবশ্য তা বিশ্বাস করে না। তবে শেষ করার জন্য এটা একটা সুন্দর উপায়–তুমুল করতালির মধ্যে দিয়ে।

২২. ক্র্যাকান

কোনো সমস্যা ছাড়াই এটা আমরা করতে পারব, ক্যাপ্টেন বে চিন্তিত স্বরে বললেন, পরিকল্পনা হয়ে গেছে– কম্প্রেসারের কম্পনের সমস্যাটার সমাধান হয়েছে– এর পরে জায়গা দেখতে যাওয়া হবে।

বাড়তি মানুষ আর যন্ত্র আমাদের আছে–কিন্তু দেয়াটা কি ঠিক হবে? টেরানোভার কনফারেন্স রুমের উপবৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসা তারা পাঁচজন সিনিয়র অফিসারদের দিকে তিনি তাকালেন। তারপর সবাই ড. ক্যালডরের দিকে তাকালেন। তিনি হাত ছড়িয়ে বসে ছিলেন।

–তা হলে এটা কেবলমাত্র যান্ত্রিক সমস্যা নয়। আমার যেটা জানার দরকার সেটা জানাও আগে।

–এই হচ্ছে অবস্থা –ডেপুটি ক্যাপ্টেন ম্যালিনা বললেন। বাতিগুলো ম্লান হয়ে গেল। আর টেবিলের মাঝখানে, সেন্টিমিটার খানেক উচুঁতে তিন দ্বীপ ভেসে উঠল।

এটাকে একটা মডেলের মতো মনে হলেও এটা কোন মডেল নয়। যদি যথেষ্ঠ বড় করা হয় তাহলে কেউ ল্যাসানদের ব্যস্ততা দেখতে পাবে।

–আমার ধারণা ল্যাসানরা এখনও ক্র্যাকানকে ভয় পায়। যদিও এটা খুব লক্ষ্মী একটা আগ্নেয়গিরি। যাই হোক না কেন, এটা তো কাউকে মেরে ফেলেনি। আর এটাই হচ্ছে আন্তঃদ্বীপ যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল চাবি। সাগরপৃষ্ঠ হতে ছয় কিলোমিটার উঁচুতে এর চূড়াটা হচ্ছে গ্রহের সবচাইতে উঁচু জায়গা। তাই এটাই হচ্ছে এ্যান্টেনা বসাবার আদর্শ জায়গা। দূরের যে কোন জিনিস এটায় ধরে আবার দ্বীপগুলোয় পাঠানো যাবে।

–আমার মাঝে মাঝে খুব অবাক লাগে যে, ক্যালডর বললেন–দু'হাজার বছর পরও আমরা বেতার তরঙ্গের চাইতে ভালো কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি।

–মহাবিশ্ব কেবলমাত্র একটা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিচ্ছুরণ দিয়ে ভর্তি ড. ক্যালডর। আমাদের এর সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। আর ল্যাসানরা ভাগ্যবান–কারণ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সব শেষের বিন্দুটাও তিনশ কিলোমিটারের মধ্যে–ক্র্যাকান পর্বত তাদের দুটোকেই পুরোপুরি ঢাকতে পারে। কোন বিশেষ যন্ত্র ছাড়াই কাজ চালাতে পারবে।

কেবল যাওয়াটা–অর্থাৎ আবহাওয়াটাই সমস্যা। আর চালু রসিকতা হচ্ছে যে ক্র্যাকানই হচ্ছে গ্রহের একমাত্র জায়গা যেখানে আবহাওয়া বলে কোন বস্তু আছে। কয়েক বছর পর পর কাউকে পাহাড়ে উঠতে হয়। অ্যান্টেনা ঠিক করে কিছু ব্যাটারী আর সৌর কোষ বদলায় এবং একগাদা বরফ নিয়ে নেমে আসে। কঠিন কাজ তবে ঝামেলা নেই।

–যেটা, সার্জন কমান্ডার নিউটন বললেন, ল্যাসানরা পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। অবশ্য আমি তাদের দোষ দিচ্ছি না। কারণ তারা তো আবার আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ জিনিস –যেমন খেলা বা শরীরচর্চার জন্য শক্তি জমিয়ে রাখে। সে অবশ্য 'প্রেম করা' শব্দটা যোগ করতে চাইছিল। কিন্তু সেটা ইতিমধ্যেই তার কয়েক জন সহকর্মীর জন্য যথেষ্ঠ সংবেদনশীল শব্দতে পরিণত হয়েছে সুতরাং ওটা ব্যবহার না করাই ভালো।

–তারা পাহাড়ে চড়বে কেন? ক্যালডর জিজ্ঞেস করলেন। তারা ওড়ে না কেন? তাদের কি সোজা উপরে উঠে যাবার মতো বিমান নেই?

–আছে, কিন্তু ওখানে বাতাস খুব পাতলা। কিছু বড় ধরনের দুর্ঘটনার পর ল্যাসানরা কঠিন পথটাই বেছে নিয়েছে।

–আচ্ছা ক্যালডর চিন্তিত ভাবে বললেন, সেই পুরোনো হস্তক্ষেপ করা না করার প্রশ্ন। আমরা কি তাদের আত্মশক্তি কমিয়ে দিচ্ছি? অবশ্য খুব কম মাত্রায়, অন্ততঃ আমি বলব। আর আমরা যদি তাদের এই সামান্য অনুরোধটাও না শুনি তাহলে তিক্ততার জন্ম হতে পারে। তারা বরফ কলের জন্য যে সাহায্য করেছে তাতে এটা করা যেতে পারে।

–আমারও ঠিক তাই মনে হয়। কোন আপত্তি? বেশ। তা মি. লোরেনসন–আপনি ব্যবস্থা নিন। যে কোন মহাশূন্যবিমান প্রয়োজনে আপনি নিয়ে নিন। বরফের জন্যতো ওগুলোর দরকার নেই।

মোজেস ক্যালডর পাহাড় ভালোবাসেন। এটা তাকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাবার অনুভূতি দেয়–যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতার ব্যাপারটাও সে এখন তিক্ততার সঙ্গে স্বীকার করে। চূড়া থেকে সে লাভার সমুদ্রের দিকে তাকালো। যেটা অনেক আগেই জমে গেলেও এখনও ধোঁয়া ছাড়ছে। তারও দূরে পশ্চিমে বড় দুটো দ্বীপই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ঠান্ডা আর নিঃশ্বাসের সক্রিয় চেষ্টা প্রতিটি মুহূর্তকেই আনন্দময় করে তুলেছে। বহু আগের প্রাচীন কোন ভ্রমণ বা অ্যাডভেঞ্চার বই এ 'মাতাল করা' বাতাস পড়ার সময় তার মনে হয়েছিল লেখককে জিজ্ঞেস করে সে নিজে কতটা গিলেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে কথাটা মিথ্যে নয়।

–সবকিছু গুছিয়ে ফেলা হয়েছে মোজেস। আমরা ফিরব।

–ধন্যবাদ লোরেন। ইচ্ছে করছে সবাইকে সন্ধ্যায় নেয়ার সময়টা পর্যন্ত থাকি। তবে এত উচ্চতায় ততক্ষণ থাকাটা বিপদজনক।

–ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে অক্সিজেন আছে।

–আমি সেটা ভাবছি না। একটা পাহাড়ের ওপর আমার সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছিল।

–দুঃখিত, বুঝলাম না।

–বাদ দাও, ওটা অনেক, অনেক আগের কথা।

পাহাড় থেকে উড়ে যাবার সময় কাজের লোকজন খুশিতে হাত নাড়ল। সব জিনিস নামানো হয়েছে। তারা ল্যাসান প্রজেক্টের প্রাথমিক কাজগুলি করছে। কেউ কেউ চা বানাচ্ছিল। লোরেন সাবধানে এ্যান্টেনার জটিল কাঠামো বাঁচিয়ে উপরে উঠতে লাগল। যদি কোন কাঠামোতে লেগে যায় তাহলে দূরের দুটো দ্বীপের দিকে তাক করা এ্যান্টেনাগুলো অসংখ্য গিগাবাইটা তথ্য হারাবে। আর ল্যাসানরা তখন সাহায্য চাওয়ার জন্যই পস্তাবে।

–তুমি তারনার দিকে যাচ্ছ না?

–কি? ওহ, ক্র্যাকান।

শব্দটা দুটো দিক থেকেই ঠিক। তাদের নীচের মাটি শ'খানেক মিটার চওড়া উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। আর এর চূড়ায় আছে নরক।

নতুন একটা বিশ্বের হৃদয়ের উত্তাপ ঠিক এর নীচেই জ্বলছে। একটা হলদে জ্বলন্ত নদী ধীরে সাগরের দিকে যাচ্ছে। ক্যালডর অবাক হয়ে ভাবল, কিভাবে এরা নিশ্চিত যে আগ্নেয়গিরিটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, আর কখনো এটা বিস্ফোরিত হবেনা। তবে লাভার নদীটা তাদের উদ্দেশ্য নয়। এরপর আরেকটা ছোটা খাদ –প্রায় কিলোমিটার খানেক চওড়া। যার মাঝে একটা প্রায় ধ্বসে যাওয়া টাওয়ার। কাছে গিয়ে তারা আরও বুঝতে পারল যে, সেখানে মোট তিনটা টাওয়ার ছিল। তবে বাকী দুটোর কেবল ভিত্তিটাই আছে।

খাদের মেঝে ধাতব পাত আর বাঁকানো তার দিয়ে ভর্তি। নিশ্চয়ই এটা সেই বিশাল বেতার প্রতিফলক যা এখানে বসানো হয়েছিল। প্রেরক আর গ্রাহক যন্ত্রটা বৃষ্টির পানি নেমে যাবার পুকুরে পড়ে আছে।

পৃথিবীর শেষ সূত্রের অবশেষ–কেউই কোন কথা বলল না। অবশেষে লোরেন নিস্তব্ধতা ভাঙল।

–এটা ভেঙে গেছে কিন্তু সারানো অসম্ভব নয়। সাগান-২ মাত্র ১২ ডিগ্রি উত্তরে– পৃথিবীর চাইতেও কাছে। একটা খারাপ এ্যান্টেনাও লক্ষ্যভেদ করবে।

–দারুণ পরিকল্পনা। আমরা আমাদের বর্ম শেষ করে, তাদের সাহায্য করতে পারি।

অবশ্য তাদের তাড়াহুড়ো নেই, খুব সাহায্যও তাই লাগবে না। আসলে চারশ বছর লাগবে তাদের আমাদের কাছে থেকে আবার তথ্য পেতে– তাও যদি আমরা নেমেই তথ্য পাঠাই।

লোরেন জায়গাটা রেকর্ড করে নিল। প্রায় একহাজার মিটার নামার পর ক্যালডর দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

–উত্তরে ধোঁয়াটা কিসের? একটা সংকেত এর মতো লাগছে।

দিগন্তের মাঝামাঝি, থ্যালসার নীল আকাশের বিপরীতে সাদা একটা স্তম্ভ তৈরী হয়েছে।

কয়েক মিনিট আগেও নিশ্চিত একটা ছিল না।

–চল দেখা যাক। হয়তো কোন বোট সমস্যায় পড়েছে।

–আমার কি মনে হচ্ছে জান? –ক্যালডর বলল।

লোরেন একটা শ্রাগ করে উত্তর দিল।

–একটা তিমি। সেগুলো যখন শ্বাস নিতে আসত তা তখন পানির বাষ্পের একটা স্তম্ভ তৈরী করত। এটা একদম সেরকম।

–তোমার আকর্ষণীয় তত্ত্বটায় দুটো ভুল আছে। স্তম্ভটা প্রায় কিলোমিটার উঁচু –তিমি!

–মানছি এবং তিমিরটা মাত্র কয়েক সেকেন্ড থাকে আর এটা অবিরাম। দ্বিতীয় আপত্তিটা কি?

–চার্ট অনুযায়ী– ওটা কোন মুক্ত পানির এলাকা নয়। অতএব বোটতো নয়ই।

–কি বলছ থ্যালসাতো পুরোটাই সাগর। ও আচ্ছা গ্রেট ইস্টার্ণ প্রেইরী....

–হ্যাঁ ওটা তার প্রান্ত।

–কিন্তু তুমি যেভাবে বললে যেন ওটা কোন জমি।

তারা দ্রুত ভাসমান সামুদ্রিক আগাছার কাছে চলে এল। এগুলো প্রায় সারা সাগর ঢেকে আছে– এবং গ্রহের অক্সিজেন তৈরী করছে। দেখতে প্রায় শক্ত সবুজ পাতের মতো– মনে হয় যেন হাঁটা যাবে। কোন পাহাড় বা উঁচু জিনিস না থাকায় এমন অবস্থা।

কিন্তু এক কিলোমিটার দূরে, ভাসমান প্রেইরী– সমতলও নয় বা অবিচ্ছিন্নও নয়। একটা জল ফুটছে যা বাষ্পের বিশাল মেঘ তৈরী করছে।

–আমার মনে থাকা উচিত ছিল, ক্যালডর বলল। ক্র্যাকানের সন্তান।

–হুঁ। আমরা আসার পর এই প্রথম এটা সক্রিয় হয়েছে। দ্বীপগুলো তাহলে এভাবে তৈরী হয়েছে।

হ্যাঁ, আগ্নেয়গিরিটি পূবদিকে এগুচ্ছে। কয়েক হাজার বছর পর হয়তো ল্যাসানরা পুরো একটা মহাদেশ পাবে।

তারা আরও কয়েকবার চক্কর দিয়ে পূর্ব দ্বীপের দিকে ফিরল। অধিকাংশ দর্শকের কাছেই একটা ডুবন্ত আগ্নেয়গিরি –যা কিনা জন্মাতে চেষ্টা করছে, খুব একটা দর্শনীয় ঘটনা না।

তবে যে মানুষেরা একটা সৌরজগতের ধ্বংস দেখেছে তাদের কাছে এই জন্ম একটা ঘটনার চাইতে অনেক বেশী কিছু।

২৩. বরফ দিবস

গত তিনশ বছরের মধ্যে, প্রেসিডেন্টের প্রমোদতরী, অ্যালিয়াস আন্তদ্বীপ ফেরী নং এক, কোনদিন এতো সুন্দর সাজেনি। ফেস্টুন ওড়ানো ছাড়াও এটাকে নতুন সাদা রং করা হয়েছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রং বা উৎসাহ –যেটার ঘাটতির কারণেই হোক না কেন কাজটা সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। তাই ক্যাপ্টেনকে বাধ্য হয়েই সতর্কভাবে রং করা দিকটাকেই পাড়ের দিকে রেখে নোঙর করতে হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ফারাদীনও বিশেষ উপলক্ষ্য হিসেবে চমকপ্রদভাবে সেজে এসেছেন। মিসেস প্রেসিডেন্টের ডিজাইনে তৈরী পোশাকটিকে রোমান সম্রাট আর প্রথম দিককার নভোচারীদের পোষাকের মিশ্রণ বলা যেতে পারে। এবং তিনি এই পোশাকে যে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন তাও বোধ হচ্ছে না। ক্যাপ্টেন বে সাদা প্যান্ট, খোলা গলার জামা, কাঁধের ব্যাজ আর স্বর্ণখচিত ক্যাপ পরে বেশ ভালো বোধ করছিলেন। সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেও কবে শেষ এই পোশাক তিনি পরেছিলেন তা তার খেয়ালও নেই।

প্রেসিডেন্টের পোশাক ছাড়া আনুষ্ঠানিক এই ভ্রমণটি অত্যন্ত ভালো হয়েছিল। আর বরফ তৈরীর কলটির মডেলটা একেবারে ঠিকঠাক কাজ করছিল। পানীয় ঠান্ডা করার জন্য ছোট্ট ও পাতলা বরফের টুকরো এটা অন্তহীনভাবে তৈরী করছিল। অবশ্য তুষারপাত নামটি দেয়ার সার্থকতা অতিথিরা কেউই বুঝল না। সেটা তাদের দোষ নয় –তারা জীবনে অনেকেই বরফ দেখেনি।

এরপর তারা মডেল ছেড়ে আসল জিনিসটা দেখতে গেল। এটা তারনার উপকূলের কয়েক হেক্টর জায়গা নিয়ে নিয়েছে। প্রেসিডেন্ট এবং তার সঙ্গীরা, এবং তার অফিসারদের এবং সকল অতিথিদের নিতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। এখন দিনের শেষ আলোয় বিশ মিটার চওড়া, দুই মিটার পুরু ছ'কোনা বরফ পাতের সামনে তারা সবাই সশ্রদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এটা তাদের দেখা সবচাইতে বড় বরফখন্ডই নয় –সম্ভবত: সত্যিকার অর্থেই গ্রহের বৃহত্তম। কারণ এমনকি মেরু

অঞ্চলেও বরফ তৈরী হবার খুব সুযোগ পায় না। স্রোতের তোড়ে সেগুলো খুব দ্রুতই ভেসে বা গলে যায় পানির সঙ্গে।

–কিন্তু এটার এই আকৃতি কেন? প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন।

ডেপুটি ক্যাপ্টেন ম্যালিনা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। নিশ্চয়ই এই জিনিসটা তাকে কয়েকবার বোঝাতে হয়েছে।

–কোন তলকে একইরকম টুকরো দিয়ে ঢাকার ব্যাপারে এটা একটা পুরোনো ধা। আপনি তিন ধরনের টুকরো নিতে পারেন। চতুর্ভুজ বা ত্রিকোন বা ষড়ভুজ। আমাদের ক্ষেত্রে ছ'কোনা জিনিস বেশী সুবিধার আর কাজের। এই টুকরোগুলো প্রায় দু'শর ওপর, প্রতিটির ওজন ছয়শো টন। বর্মটা তৈরী করতে একটার সঙ্গে আরেকটাকে লাগিয়ে দিতে হবে। এটা হবে একটা তিনপ্রস্থ স্যান্ডুইচের মতো। আমরা যখন চলব, তখন সব টুকরোগুলো মিশে গিয়ে একটা বিশাল পাত তৈরী করবে। কিংবা একটা বড় কোণও হতে পারে।

–আপনি আমাকে বেশ ভালো একটা পরিকল্পনা দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট সারা বিকালের মধ্যে সবচাইতে মনোযোগ দিয়ে বললেন। থ্যালসায় কোন আইস-স্কেটিং হয়না। এটা খুব সুন্দর খেলা। এছাড়া আইস-হকি নামেও একটা খেলা আছে। অবশ্য ভিডিও দেখে সেটা আমরা আবার আবিষ্কার করতে পারব কিনা কে জানে। তবে আপনারা যদি একটা বরফ-মাঠ করে দিতে পারেন অলিম্পিকের জন্য তাহলে খুব ভালো হয়। সেটা কি সম্ভব?

–আমি চিন্তা করব, ডেপুটি ক্যাপ্টেন ম্যালিনা ম্লানভাবে উত্তর দিলেন। এটা চমৎকার চিন্তা। কতটুকু বরফ লাগবে সেটা আমাকে জানাবেন।

–আনন্দের সঙ্গে। কাজ শেষ হয়ে গেলে বরফ কলটাকে আমরা এতে ব্যবহার করতে পারি। একটা হঠাৎ বিস্ফোরণ ম্যালিনাকে উত্তর দেয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। আতশবাজী আরম্ভ হয়ে গেছে। পরবর্তী বিশ মিনিট দ্বীপের ওপরের আকাশ বহুবর্ণের আলোয় ভাস্বর হয়ে উঠল।

ল্যাসানরা আতশবাজী খুব পছন্দ করে আর সুযোগ পেলেই ব্যবহার করে। তারা লেজার প্রতিরূপ ব্যবহার করে যা সূক্ষ্ম এবং নিরাপদ, কিন্তু গানপাউডারের শেষের সেই সুন্দর পোড়া গন্ধ হতে বঞ্চিত। সব শেষ হয়ে গেলে যখন ভিআইপিরা জাহাজ ত্যাগ করছে, ডেপুটি ক্যাপ্টেন ম্যালিনা অন্যমনষ্কভাবে বলল,

–প্রেসিডেন্ট অদ্ভুত লোক, যদিও এক ধরনের নির্দিষ্ট চিন্তার বাইরে যেতে পারে না। তার ওই ঘোড়ার ডিমের কাল্পনিক কথা শুনে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। তবে বরফের মাঠ তৈরীর চিন্তাটা দারুণ এবং আমাদের জন্য অনেক সুনাম বয়ে আনবে।

–তবে আমি আমার বাজী জিতেছি, লেঃ কমান্ডার লোরেন লোরেনসন বলল।

–কি বাজী? ক্যাপ্টেন বে জিজ্ঞেস করলেন।

ম্যালিনা হেসে ফেললেন। –এটা কখনো বিশ্বাস করিনি। কখনো কখনো ল্যাসানরা কোন কৌতুহল দেখায় না। সবকিছুই তারা মেনে নেয়। অবশ্য আমাদের

প্রাযুক্তিক জ্ঞানের ওপর তাদের বিশ্বাসের জন্য আমার বোধহয় গর্ব হওয়া উচিত। তারা বোধহয় ভাবে যে আমাদের অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি বল আছে।

লোরেন বলেছিল বর্ণনার সময় বাদ দিতে। এবং সেই ঠিক। প্রেসিডেন্ট ফারাদীন কোন প্রশ্নই করলেন না, যে কিভাবে আমরা একশ পঞ্চাশ হাজার টন বরফ ম্যাগেলানের জন্য ওপরে নিয়ে যাব।

২৪. আর্কাইভ

মোজেস ক্যালডর একাকী থাকতেই পছন্দ করে। উপাসনালয়ের মতো সমাহিত জায়গায় যত ঘন্টা বা দিন কাটানো যায়। মানুষের সব শিল্প আর জ্ঞানের সামনে নিজেকে তার আবার ছাত্রের মতো মনে হয়। অভিজ্ঞতাটা উত্তেজনাকর এবং অবসন্নময়। সমগ্র বিশ্ব তার আঙ্গুলের ছোঁয়ায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু একজীবনে এর সামান্যটাই দেখা যায়। মাঝে মাঝে সে প্রবল ইচ্ছায় তাড়াহুড়ো করে বসে। তার অবস্থা হল একজন ক্ষুধার্ত মানুষের মতো, যাকে এতো খাবার দিয়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যে তার খাবার ইচ্ছেই মরে গেছে।

এবং এই সভ্যতা আর কৃষ্টির সম্পদও মানব জাতির সমগ্রের ভগ্নাংশ মাত্র। মোজেস ক্যালডর যা জানে আর ভালোবাসে তার অনেকটাই নেই। এবং সে জানে সেটা কোন দুর্ঘটনাবশতঃ নয় বরং ইচ্ছাকৃত।

হাজার বছর আগে মেধাবী আর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইতিহাসকে ঢেলে লিখেছিলেন, আর লাইব্রেরীর সংগ্রহের মধ্যে কোনগুলো থাকবে আর কোনগুলো আগুনে পুড়বে তাও ঠিক করলেন। বাছাইয়ের পদ্ধতিটা সোজা হলেও ব্যাপারটা ছিল দুরূহ। নতুন বিশ্বের টিকে থাকা আর সামাজিক স্থিরতায় সাহায্য করবে এমন সাহিত্য, ইতিহাস বীজ বহনকারী মহাকাশযানে দেয়া হল।

কাজটা ছিল অসম্ভব এবং হৃদয়বিদারক। চোখের জলে ভেসে বাছাই কমিটি বেদ, বাইবেল, ত্রিপিটক, কোরান এবং এদের ওপর ভিত্তি করে সব সাহিত্যকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এগুলো যতই সৌন্দর্য্য ধারণ করুক না কেন, তারা আবার সেই প্রাচীন ধর্মীয় ঘৃণা, ঐশ্বরিক বিশ্বাস, আর অর্থহীন পবিত্রতা–যা বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষকে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মৃত্যু ঘটিয়েছে, তাকে পুনরায় নতুন একটা গ্রহকে দূষিত করার সুযোগ দিতে পারেন না।

প্রধান ঔপন্যাসিক, কবি এবং নাট্যকারদের সৃষ্টির বহু কিছু বাদ পড়ল। যা কিনা দার্শনিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমি ছাড়া অর্থহীন। হোমার, তলস্তয়, শেক্সপিয়ের, মিল্টন, মেলেভী, প্রাউস্ট –ইলেকট্রনিক মাধ্যম ছাপাখানাকে উঠিয়ে দেবার আগেকার শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা বাছাই করা কয়েকশ হাজার প্যারাগ্রাফের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো। যুদ্ধ, অন্যায়, নৃশংসতা এবং ধ্বংসাত্মক সব কিছুই বাদ দেয়া হল। যদি নতুনভাবে পরিকল্পিত এবং আশানুযায়ী উণ্নত সভ্যতা তৈরী হয়, তাদের

নিজেদেরই সাহিত্য হবে। তাদের তাতে পুরোনো অপরিণত উৎসাহ দেবার কোন দরকার নেই।

অপেরা ছাড়া সঙ্গীত এবং শিল্পকর্ম এর চাইতে ভালো করল। তবুও এর পরিমাণ এতোই বেশী যে বাছাই করাটা অপরিহার্য। যদিও কখনো বিতর্কিত। অনেক বিশ্বের বহু প্রজন্মই মোজার্টের প্রথম আট সিম্ফনী, বেটোফেনের দ্বিতীয় ও চতুর্থ এবং সিবেলিসের তিন থেকে ছয় শুনে আশ্চর্য হবে।

মোজেস ক্যালডর গভীরভাবে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে এবং একইসঙ্গে তার অক্ষমতা সম্বন্ধেও বা যে কোন মানুষের অক্ষমতা সম্বন্ধে জানে–যত মেধাবীই সে হোক না কেন। উপরে ম্যাগেলানের বিশাল মেমরী ব্যাঙ্কে যা নিরাপদে রাখা আছে, তার অধিকাংশই থ্যালসার মানুষ দেখেনি। এমনকি তারা বুঝতেও পারবে না। পঁচিশশো সালের পুনর্নির্মিত ওডেসী, কেইন বার্গের শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডীর অনুবাদ: লি কোসের ওয়র এন্ড পিস –পুরো দিন কেটে যাবে শুধু নাম বলতেই।

প্রথম অবতরণের লাইব্রেরীতে বসে মাঝে-মাঝে ক্যালডরের এই যৌক্তিক কারণে সুখী আর নির্ঝঞ্ঝাট মানুষগুলোর মধ্যে দেবতার মতো হতে ইচ্ছে করে। এখানে বসে মহাকাশযানের মেমরী ব্যাঙ্কের সঙ্গে সে মিলিয়ে দেখে যে কি বাদ বা পরিবর্তন করা হয়েছে। যদিও নীতিগতভাবে সে কোন সেন্সরশীপ সমর্থন করেনা –তবে অন্ততঃ কোন কলোনী হবার প্রাথমিক সময়ে সে একে মেনে নেবে। তবে এখন যেহেতু জিনিসটা হয়ে গেছে সেহেতু কিছুটা ধাক্কা বা সৃষ্টির বেদনা হয়তো দেয়া যায়....

কখনো কখনো সে অবশ্য মহাকাশযান হতে তরুণ ল্যাসানদের দল যারা তাদের ইতিহাস ভ্রমণে এসেছে তাদের ডাকে বাধাগ্রস্ত হয়। সে অবশ্য বিরক্ত হয় না এবং অন্ততঃ একজন আছে যার ডাক ভালোই লাগে।

খুব কাজে তারনায় আটকে না গেলে, অধিকাংশ বিকেলেই মিরিসা তার চমৎকার "বুবি" চড়ে বেড়াতে আসে। থ্যালসায় ঘোড়া দেখে আগন্তুকরা অবাক হয়েছিল। কারণ তারা পৃথিবীতেই জীবিত ঘোড়া দেখেনি। কিন্তু ল্যাসানরা প্রাণী পছন্দ করে। জেনেটিক ফাইলের বিশাল স্তুপ ঘেঁটে তারা আবার তা তৈরী করেছে। মাঝে মাঝেই তারা অপ্রয়োজনীয় এমনকি বিরক্তিকর। যেমন, থ্যালসার বাড়ী ঘরের ওপর বসে থাকা ছোট বাঁদরগুলো।

মিরিসা সাধারণত কিছু নিয়ে আসে –ফল বা পানীয়, ক্যালডর যা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। তবে তার চাইতেও আনন্দের সঙ্গে সে তার সঙ্গ উপভোগ করে। কে বিশ্বাস করবে যে পাঁচ মিলিয়ন মানুষ –শেষ প্রজন্মের অর্ধেক লোকের সামনে সে ভাষণ দিত। আর এখন মাত্র একজন শ্রোতাকেই...

মোজেস বলছিল, 'যেহেতু তুমি অনেকদিন ধরে লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত, তুমি শুধু মেগাবাইটের কথাই চিন্তা কর। কিন্তু তুমি কি জান পাঠাগার শব্দটি এসেছে 'বই' থেকে। তোমাদের থ্যালসায় কি কোন বই আছে?'

–অবশ্যই আছে. মিরিসা ক্ষুণ্ন স্বরে বলল। বেচারী এখনও ক্যালডরের কৌতুকগুলো ঠিক ধরতে পারে না। মিলিয়ন... না হোক, হাজারের বেশি। উত্তর

দ্বীপে একজন লোক আছে। সে প্রতিবছর দশটার মতো ছাপে। কয়েকশ' করে কপি। সেগুলো খুবই সুন্দর আর খুব দামী। সেগুলো বিশেষ সব দিনের উপহার হিসেবেই চলে যায়। আমার একুশতম জন্মদিনে আমি একটা পেয়েছিলাম –অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড।

–আমি একদিন সেটা দেখব। আমি সব সময় বই পছন্দ করি। মহাকাশযানে প্রায় শ'খানেক আছে। তাই বোধহয় যখন কেউ 'বাইট' শব্দটা উচ্চারণ করে আমি মনে মনে সেটাকে বইয়ের আকারে ভাগ করে ফেলি... এক গিগাবাইট প্রায় মানে হাজার খানেক বই।

–তোমাদের লাইব্রেরীটা কত বড়?

ক্যালডরের ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই মিরিসা কি বোর্ডের ওপর তার আঙ্গুল বুলিয়ে গেল।

–এটা একটা জিনিস যা আমি পারি না, মোজেস বলল –কেউ একজন বলেছিল যে একুশ শতকের পর থেকে মানব জাতি দুই প্রজাতিতে ভাগ হয়ে গেছে। মৌখিক এবং ডিজিটাল। আমি ডিজিটাল কিবোর্ড ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আমি মৌখিক নির্দেশেই কাজ করতে পছন্দ করি।

–শেষ ঘন্টার হিসেব হচ্ছে ছয়শ' পঁয়তাল্লিশ টেরাবাইট, মিরিসা বলল।

–হুম, প্রায় এক বিলিয়ন বই। আচ্ছা প্রথমে এর আকার কেমন ছিল?

–এটা অবশ্য না দেখেই আমি বলতে পারি। ছয়শ' চল্লিশ।

–তার মানে সাতশ' বছরে

–হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরা কেবল কয়েক মিলিয়ন বই লিখেছি।

–আমি সমালোচনা করছি না। তাছাড়া গুণগত মানের ব্যাপারটা সংখ্যার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই তুমি তোমাদের ল্যাসানদের সবচে ভালো বই, সঙ্গীত আমাকে দেখাবে। আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা তোমাদের কি দেব। ম্যাগেলানের সাধারণ ডাটা ব্যাঙ্কে প্রায় হাজারটা টেরাবাইট রয়েছে। তুমি কি চিন্তা করতে পার ব্যাপারটা?

–হ্যাঁ বললে তো তুমি চুপ করে যাবে। আমি অতটা নিষ্ঠুর নই।

–ধন্যবাদ। সত্যি বলছি। এটা একটা ভীতিকর সমস্যা যা আমাকে বছরব্যাপী তাড়িত করেছে। মাঝেমাঝে আমি ভাবি যে, পৃথিবী কারও জন্য আগে ধ্বংস হয়নি, মানবজাতি ধ্বংস হয়েছে যে তথ্য তারা উৎপাদন করত তা দিয়েই।

দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষ দিকে, এটা বছরে মাত্র মিলিয়ন খানেক বই উৎপাদন করত। এবং এগুলো হচ্ছে যে তথ্য বা বই সংরক্ষণ করা হত তার হিসেব। তৃতীয় সহস্রাব্দে সংখ্যাটা প্রায় একশ' গুণ বেড়ে গেল। লেখা আবিষ্কার হবার পর থেকে পৃথিবী ধ্বংস হবার আগ পর্যন্ত, ধরা হয় যে প্রায় দশ হাজার মিলিয়ন বই লেখা হয়েছে। আর তার মাত্র দশ ভাগ আমাদের জাহাজে আছে। এর সব যদি তোমাদের আমরা দিয়ে দেই, ধরা যাক তা রাখার জায়গাও তোমাদের ডাটা ব্যাঙ্কে হল –তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। এটা কোন সৌজন্য হবে না। বরং এটা তোমাদের

সাংস্কৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতিকে থামিয়ে দেবে। এবং এর অধিকাংশই তোমরা কিছু বুঝবে না। শত শত বছর লাগবে তোমাদের সেখান থেকে মূল বস্তুটি বের করতে।

আশ্চর্য–ক্যালডর মনে মনেই নিজেকে বলল, এই সাদৃশ্যটা কখনওতো আমি ভাবিনি। এই কারণেই ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান জীবদের সন্ধানের ব্যাপারে একটা বিপরীত মত গড়ে উঠেছিল। আমরা অবশ্য কখনোই কোন গ্রহান্তরের জীবের দেখা পাইনি, এমনকি সন্ধানও নয়। কিন্তু ল্যাসানরা সেটা পেয়েছে –আর ভিনগ্রহের জীবগুলো হচ্ছি আমরা...

অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে আসলেও, তার এবং মিরিসার অনেক কিছুই মিলে যাবে। মিরিসার কৌতুহল এবং বুদ্ধি অবশ্যই উৎসাহব্যঞ্জক। তার মহাকাশযানের অনেক সদস্যের সঙ্গে কথা বলেও সে এমন উৎসাহ পায় না। অনেক সময় উত্তর দিতে গিয়ে ক্যালডর এমন বিপদে পড়ে যে, পাল্টা প্রশ্ন করে এড়ানো ছাড়া আর উপায় থাকে না। একদিন নাক্ষত্রিক রাজনীতির ব্যাপারে অনেকটা আলোচনার পর মোজেস বলল, –আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে তুমি এখনও তোমার বাবার কাছ থেকে এ জায়গাটার পুরো দায়িত্ব নাওনি। এটাই তোমার উপযুক্ত জায়গা।

–আমার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বাবাকে দেখেছি তো। সারা জীবন অন্যদের কৌতুহল মেটাতে আর উত্তর দ্বীপের আমলাদের ফাইল তৈরী করতে গিয়ে বেচারা নিজের জন্য কিছু করার সময় পেল না।

–আর তুমি?

–তথ্য জোগাড় করতে আমারও ভালো লাগে। কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করতে আরও ভালো লাগে। সেজন্যই তারা আমাকে তারানা উন্নয়ন কমিটির উপ-পরিচালক বানিয়েছে।

–সেটা মনে হয় আমাদের আসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মেয়রের অফিস থেকে আসার সময় পরিচালক আমাকে বলছিলেন।

–তুমি তো জান ব্র্যান্ট অতটা গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে না। এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, যার শুধু কয়েকটা সম্ভাব্য সমাপ্তি তারিখ আছে। যদি অলিম্পিক বরফ ষ্টেডিয়াম আমাদের এখানে হয় তাহলে পরিকল্পনা আবার বদলাতে হবে; অবশ্য ভালোর জন্যই। অবশ্য উত্তরের লোকজন চায় ওটা তাদের ওখানে হোক। তারা মনে করে প্রথম অবতরণের জায়গাই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ।

ক্যালডর মৃদু হাসল। সে দুই দ্বীপের মধ্যকার বহু পুরোনো রেষারেষির কথাটা জানে।

–তাই নয় কি? এছাড়া এখন তোমরা আমাদেরকে বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে পাচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই খুব হিংসুক নও।

তারা পরস্পরকে এতোটাই চিনেছে যে, তারা থ্যালসা বা ম্যাগেলানকে নিয়ে নিরপেক্ষভাবে কৌতুক পর্যন্ত করতে পারে। তারা এমনকি ব্র্যান্ট এবং লোরেনকে নিয়েও কথা বলে। এবং অবশেষে মোজেস ক্যালডর পৃথিবীর কথাও বলা আরম্ভ করল।

–ওহ মিরিসা, আমি আমার বিভিন্ন কাজের কথা ভুলেই গেছি। অবশ্য তার অধিকাংশই খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সবচে বেশিদিন কাজ করেছিলাম মঙ্গলের কেমব্রিজের সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে। এবং বোঝো ব্যাপারটা কি পরিমাণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, কারণ ইংল্যান্ডে এই নামে একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বহু আগে।

অবশ্য শেষের দিকে, আমি আর ইভলিন তৎকালীন সামাজিক সমস্যার ব্যাপারে বেশি জড়িত হয়ে পড়েছিলাম; বিশেষত মহাপ্রস্থানের পরিকল্পনা তৈরীতে। আর দেখা গেল, আমার একটা বাগ্মিতার প্রতিভা আছে –যা কিনা মানুষকে তার অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎকে মেনে নিতে সাহায্য করে।

যদিও আমরা বিশ্বাস করতাম না যে আমাদের জীবনকালেই সব শেষ হয়ে যাবে–কেই বা বিশ্বাস করে বল। আর কেউ যদি বলত যে, আমাকে পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে, যেখানে আমার সব ভালোবাসার জিনিসগুলো ছড়িয়ে আছে...

এক পশলা আবেগ তার মুখের ওপর খেলা করে গেল। মিরিসা সহানুভূতির সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার এতো প্রশ্ন করার আছে, যার উত্তর দিতে একটা জীবন কেটে যাবে –কিন্তু নক্ষত্রের পথে উড়ে যাবার আগে তার হাতে আছে মাত্র একটি বছর।

তারা যখন বলল, আমাকে তাদের প্রয়োজন আমি আমার সমস্ত তার্কিক এবং দার্শনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলাম তাদের ভুল প্রমাণ করার জন্য। আমি অনেক বৃদ্ধ। আমার যা জ্ঞান আছে তা ওই মেমরী ব্যাঙ্কেই জমা আছে, অন্যরা আরও ভালো কাজ করবে... সবকিছুই বলেছিলাম, আসল কারণটা ছাড়া।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইভলিন আমার সিদ্ধান্ত তৈরী করে দিয়েছিল। এটা সত্যি মিরিসা যে, মেয়েরা অনেক দিক থেকেই ছেলেদের চাইতে শক্তিশালী, কিন্তু আমি তোমাকে এগুলো বলছি কেন?

–তাদের তোমাকে প্রয়োজন–তার শেষ কথা। আমরা চল্লিশ বছর এক সাথে আছি। আর এখন মাত্র একমাস বাকী। তুমি আমার ভালোবাসাকে নিয়ে যাও তোমার সাথে। আর কখনো আমাকে খুঁজো না।

আমি আর কখনোই জানব না, সৌরজগত ছেড়ে আসার সময় পৃথিবী শেষ হয়ে যাবার যে দৃশ্য আমরা দেখেছি, সেটা সে দেখেছে কিনা।

২৫. কাঁকড়া

এর আগের সমুদ্রযাত্রায় সে ব্র্যান্টের উদোম শরীর দেখেছে, কিন্তু সেটা যে এতোটা চমৎকার পেশীবহুল তা সে বুঝতে পারেনি। যদিও লোরেন সব সময়ই শরীরের যত্ন নেয়, কিন্তু পৃথিবী ত্যাগের পর কোন খেলাধুলা বা ব্যায়ামের সুযোগ কমই ছিল। তবে ব্র্যান্ট যে প্রতিদিন কোন না কোন আয়াসসাধ্য কাজে জড়িত ছিল, তা বোঝা

যায়। তার সঙ্গে মুখোমুখি লড়তে গেলে প্রাচীন পৃথিবীর মার্শাল আর্ট না জানলে লোরেনের কোন আশাই নেই এবং সেই আর্ট সে জানেও না।

পুরো ব্যাপারটাই কিম্ভুত। এখানে তার জুনিয়র অফিসাররা দেঁতো হাসি হাসছে। ক্যাপ্টেন বে একটা স্টপওয়াচ নিয়ে বসে আছেন। আর মিরিসা এমন একটা ভাব নিয়ে আছে যেন একটা তৃতীয় শ্রেণীর নায়িকা।

...দুই...এক...শূন্য...শুরু! ক্যাপ্টেন বললেন। ব্র্যান্ট একটা আহত কোবরার মতো মুচড়ে উঠল। লোরেন আঘাত এড়ানোর চেষ্টা করল এবং ভীতির সঙ্গে দেখল যে তার শরীরের কোন নিয়ন্ত্রণ তার নেই... তার পাগুলো যেন সীসার তৈরী... সে শুধু মিরিসাকে নয় সমগ্র মানবজাতিকেই হারাতে চলেছে...

ঠিক সে মুহূর্তে লোরেনের ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। কিন্তু স্বপ্নটা তাকে তাড়াতে থাকে। সে এখনও এ ব্যাপারে মিরিসাকে বলেনি।

সে ব্র্যান্টকেও এখন পর্যন্ত কিছু বলেনি। যদিও সে এখনও পুরোপুরি বন্ধুসুলভ তবুও তার সঙ্গে দেখা হলে একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরে। তবে সে আজকে নিশ্চিত যে, নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাপার ছাড়াও আরও বড় কিছু নিয়েই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব।

বরফ কলে সমুদ্রের পানি আনার একশ' মিটারের মতো লম্বা, বাঁধাই করা নালাটা একটা পুকুরের মতো জায়গায় এসে শেষ হয়েছে। সেই গোলাকার জায়গাটা একটা বরফ চাকতি তৈরীর মতো পানি ধারণ করে। যেহেতু শুধুমাত্র পানি দিয়ে চাকতিগুলো তৈরী হয়, তাই সামুদ্রিক গুল্মের আঁশ মিশিয়ে দিয়ে এদের শক্ত করা হয়। এই বরফের খন্ডগুলোকে কেউ কেউ বরফের ইট বলে, যা কিনা ম্যাগেলানের দীর্ঘ যাত্রায় হিমবাহের মতো নড়াচড়া করবে না। সেই পুকুরটার পাশে দাঁড়িয়ে জলজ উদ্ভিদের সবুজ আবরণের একটা ভাঙ্গা অংশের দিকে দেখিয়ে লোরেন ব্র্যান্টকে বলল –ঐযে, দেখ'।

সামুদ্রিক গুল্ম খেতে থাকা প্রাণীটা দেখতে অনেকটা কাঁকড়ার মতো কিন্তু আকারে মানুষের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ!

–এরকম কিছু আগে কি তুমি দেখেছ?

–না, ব্র্যান্ট শিউরে উঠে বলল, এবং সেজন্য আমি দুঃখিত নই। কি দানব একটা! ধরলে কিভাবে?

–আমরা ধরিনি। এটা নিজেই হেঁটে অথবা সাঁতরে নালা বেঁয়ে চলে এসেছে। তারপর এটা গুল্ম পেয়েছে এবং একটা ভালো নাস্তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা যে সে পছন্দ করছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে ওগুলো খুব শক্ত।

–যাক তবুও এটা নিরামিষশাসী।

–আমার সেটা পরীক্ষা করার কোন খায়েস নেই। আমি মনে করি, তুমি এটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে।

—ল্যাসান সাগরের শতশত জীব সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। আমরা ভবিষ্যতে একটা গবেষণাগার বানাবো গভীর পানির জন্য। কিন্তু সব সময়ই আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকে এবং খুব কম লোকই আগ্রহ দেখায়। তারা খুব শিগগিরি করবে—লোরেন ভাবল। লোরেন ভাবছিল, দেখা যাক ব্র্যান্ট কতক্ষণে নিজে নিজে বের করতে পারে...

—বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ভার্লে রেকর্ড খুঁজে দেখেছে। সে আমাকে বলেছে মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে এ ধরনের কিছু একটা ছিল। জীবাশ্মবিজ্ঞানীর এর একটা ভালো নাম দিয়েছেন। সমুদ্র কাঁকড়া। প্রাচীন সমুদ্র নিশ্চয়ই খুব উত্তেজনাকর ছিল।

—কুমার যে ধরনের জিনিস চায়। তোমরা এটাকে নিয়ে কি করবে?

—দেখব এবং যেতে দেব।

—তোমরা তো এটাকে চিহ্ন দিয়ে দিয়েছ।

আচ্ছা! ব্র্যান্ট তাহলে দেখেছে। ভালো!

—না আমরা করিনি। ভালোভাবে দেখ।

চৌবাচ্চার পাশে ঝুঁকে থাকা ব্র্যান্টের মুখে একটা হতভম্ব ভাব ফুটে উঠল। অবশ্য সেই দানব কাঁকড়া ব্র্যান্টকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে তার খাওয়া চালিয়ে যেতে লাগল।

প্রাণীটার একটা দাঁড়া অন্যান্যগুলোর মতো নয়। এর ডান দাঁড়ার মধ্যে একটা ধাতব তার এমনভাবে কয়েকবার পেঁচানো হয়েছে; যেটাকে প্রাচীন ধরনের ব্রেসলেট বলা যায়।

ব্র্যান্ট ধাতব তারটাকে চিনতে পারল। এবং তার মুখ হা হয়ে গেল—কয়েক সেকেন্ড সে কোন কথাই বলতে পারল না।

—তাহলে আমি ঠিকই অনুমান করছিলাম, লোরেন বলল। তোমার প্রথম ফাঁদের কি হয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই তুমি এখন বুঝেছ। আমার মনে হয় আমরা ড. ভার্লের সঙ্গে আবার কথা বলতে পারি, তোমাদের বিজ্ঞানীদের কিছু না জানিয়েই।

—আমি একজন জ্যোতির্বিদ, ম্যাগেলানের অফিসে বসে অ্যানি ভার্লে আপত্তি জানালেন, তোমাদের যা দরকার তা হচ্ছে প্রাণীবিদ, জীবাশ্মবিদ, নৃতত্ত্ববিদ এবং আরও কিছু 'বিদ'দের খিঁচুড়ী। আমার পক্ষে যতটুকু ভালোভাবে খোঁজা যায় তা আমি খুঁজেছি। এবং তোমরা সে তথ্য জমা-২ এর 'কাঁকড়া' নামের ফাইলে পাবে। এখান তোমাদের যা করতে হবে তা হলো 'খোঁজা' আশা করি সেটা তোমরা ভালোই করবে।

ড. ভার্লে চেঁচামেচি সত্ত্বেও যে কাজ করেছেন তা তার যোগ্যতার পরিচয়ই দেয়; বিশেষতঃ মূল তথ্য ভান্ডারের বিশালত্বের পরিমাপে। একটা ব্যাপার অবশ্য এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, প্রাণীটার সমস্ত আগ্রহ চৌবাচ্চাটাকে ঘিরে, যারা আসছে যাচ্ছে বা তাকে পর্যবেক্ষণ করছে, সে ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই।

যদিও সে দেখতে ভয়ংকর, তার দাঁড়াগুলোই প্রায় এক মিটার লম্বা এবং এক আঘাতেই সম্ভবত যে কারও মাথা পড়ে যাবে। তবে এটা মোটেও আক্রমণাত্মক নয়। এর পালাবার কোন ইচ্ছে নেই, সম্ভবতঃ প্রচুর খাবারের কারনেই। সাধারণভাবে ধরা হচ্ছে যে, সামুদ্রিক গুল্ম থেকে বের হওয়া কোন রাসায়নিক নিঃসরণই তাকে এখানে আকৃষ্ট করেছে।

সে যদিও বা সাঁতার কাটতে জানে তা দেখাবার কোন চেষ্টা এখনও পর্যন্ত সে করেনি। ছয় দাঁড়া দিয়েই সে ক্রমাগত হেঁটে চলছে। এর চার মিটার লম্বা দেহটা রঙ্গীন বহিঃকঙ্কাল দিয়ে আবৃত। আর এর সংযোগগুলো একে বিস্ময়কর রকম নমনীয়তা দিয়েছে।

আরেকটা বিস্ময়কর জিনিস হচ্ছে এর ঠোঁটের মতো মুখের পাশে আঙ্গুলের মতো বা বলা যায় শুঁড়ের মতো জিনিসটা। এর অস্বস্তিকর রকমের সাদৃশ্য আছে মানুষের আঙ্গুলের সঙ্গে। খাবার নেয়াটাই যদিও এর প্রাথমিক কাজ বলে মনে হয়, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, এটা তার চাইতে অনেক বেশি কাজই করতে পারে। আর কাঁকড়াটা তার দাঁড়ার সঙ্গে যেভাবে সেটাকে কাজ করায় তাও আশ্চর্যজনক।

এর দুজোড়া চোখ আছে। এক জোড়া বড় এবং সম্ভবতঃ ম্লান আলোর জন্য, কারণ দুপুরের সময় সে দু'টো বন্ধ আছে–এবং সম্ভবতঃ খুব ভালো কাজ দেবে সেগুলো। সব মিলিয়ে, প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে এবং প্রভুত্ব করতে প্রয়োজনীয় সব অঙ্গই এর আছে, যা বুদ্ধিমত্তার প্রাথমিক চিহ্ন।

অবশ্য ডান দাঁড়ায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার লাগান না থাকলে কেউই এই কিম্ভুত জীবটার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা খুঁজত না। তবে সেটাও কিছু প্রমাণ করে না। কারণ, রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতেও মানুষের তৈরী জিনিসপত্র সংগ্রহ করে এবং ব্যবহার করে এমন বহু প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। ঠিকমতো প্রমাণ না দেয়া না থাকলে সম্ভবতঃ কেউই বিশ্বাস করত না অস্ট্রেলিয়ার দর্জি পাখী বা উত্তর আমেরিকার এক জাতের ইঁদুরের রঙ্গীন এবং উজ্জ্বল জিনিস সংগ্রহের বাতিক ছিল; এমনকি সেগুলো তারা বেশ শৈল্পিক ভাবেই সাজাত। পৃথিবীতে এমন বহু রহস্য ছিল। যার সমাধান অবশ্য আর কখনোই হবে না। থ্যালসার দানব কাঁকড়া সম্ভবত সেই মননশূন্য ধারারই এক দুর্বোধ্য অংশ মাত্র।

বেশ কয়েকটা তত্ত্ব এখন এসেছে। সবচে জনপ্রিয়টা হল যে এটা একটা গহনার মতো–যেহেতু এটাই এর মননশীলতাকে সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেয়। এটাকে এমনভাবে সাজাতে নিশ্চয়ই বেশ পরিমাণ দক্ষতা লাগে এবং তার জন্য কোন সাহায্যকারী লাগে কিনা তা নিয়ে বেশ ভালো রকম বিতর্ক চলছে।

অবশ্য সে সাহায্যকারী মানুষও হতে পারে। হতে পারে কাঁকড়াটা কোন প্রাচীন বিজ্ঞানীর পোষা প্রাণী। যদিও তা বাস্তবিকই অসম্ভব। যেহেতু থ্যালসায় সবাই সবাইকে চেনে, সেজন্য কোন গোপন ব্যাপারই দীর্ঘদিন গোপন থাকে না।

আরেকটা কষ্ট-কল্পিত তবে সেটাই সবচে দুশ্চিন্তার–তথাপি সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যা–ব্রেসলেটটা কোন ধরনের পদমর্যাদার চিহ্ন!

২৬. তুষার

লেঃ ইয়েন ফ্লেচারের কাজটায় যেমন দক্ষতার দরকার আছে, তেমনি এটায় আছে প্রচুর একঘেঁয়ে অবসর। যার ফলে লেঃ ফ্লেচার অনেক সময় ধরেই অনেক কিছু ভাবে।

তার কাজ হচ্ছে, প্রায় ছয়শ টন ওজনের অসম্ভব শক্তিশালী একটা তারকে গুটানো। যেটা দিনে একবার স্বয়ংক্রিয়ভাবেই থ্যালসায় নেমে যায়। সেসময় প্রায় তিরিশ হাজার কিলোমিটার লম্বা একটা বাঁকা, জটিল তারের পথ তৈরী হয়। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এটা নিচের অপেক্ষমান ওজনের সঙ্গে লেগে যায় এবং সব ঠিকঠাক হলে তা ওপরে ওঠানো আরম্ভ হয়।

এর মধ্যে তুষার ফলকগুলোকে বরফ কল থেকে ওঠানোর মুহূর্তটা আর ম্যাগেলানের এক কিলোমিটারের মধ্যে বিশাল তুষারফলকগুলোকে চূড়ান্তভাবে রাখার সময়টা হচ্ছে সবচেয়ে সূক্ষ্ম কাজ। ওঠানোর কাজ শুরু হয় মধ্যরাতে। ছয় ঘন্টার মধ্যে সেটা সম্পন্ন হয়।

এই কাজটা দিনে করা হয় না, কারণ তাহলে ওই বরফকে থ্যালসার সূর্যের তাপে বাষ্প হওয়া থেকে রক্ষা করতে আরেকটা বর্ম বানাতে হবে। তাই গ্রহের নিরাপদ ছায়ার নীচে রোবট পরিবহনকারীরা তাপ-নিরোধক পাত দিয়ে ঘেরা বরফগুলোকে উপরে নিয়ে যায়।

উপরে যাবার পর, ওঠানোর যন্ত্রটাকে বরফ থেকে সরিয়ে নিয়ে আবার ফেরত পাঠানো হয়। কখনো কখনো ওঠানোর যন্ত্রটা, যাকে দেখতে কোন দানবের রান্নাঘরের বিশাল ধাতব ছ'কোনা সসপ্যানের মতো লাগে, বরফের সঙ্গে এমনভাবে আটকে যায়, যে খুব সাবধানে সামান্য গরম করে সেটাকে ছাড়াতে হয়।

সবশেষে নিখুঁত ছ'কোনা বরফপাতগুলো ম্যাগেলান থেকে একশ' মিটার দূরে নিশ্চল হয়ে ভেসে থাকে। এবং তখনই সত্যিকারের সূক্ষ্ম কাজ আরম্ভ হয়। ছয়শ' টন বরফপাতকে মাধ্যাকর্ষণবিহীন অবস্থায় কোন মানুষ এক করতে পারে না। একমাত্র কম্পিউটারই বলতে পারে কতটুকু শক্তি কোনদিক থেকে দিতে হবে। তারপরও একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়, যে এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, যার সমাধান সবচে বুদ্ধিমান রোবটের পক্ষেও সম্ভব নয়। অবশ্য ফ্লেচারের সামনে এমন কোন পরিস্থিতি আসেনি, তবে সে তার অপেক্ষায় আছে।

সে নিজেকেই বলল, আমি একটা বিশাল বরফের মৌচাক তৈরী করছি। এই মৌচাকের প্রথম পরত তৈরী হয়ে গেছে প্রায়, আরও দুই পরত বাকী। কোন দুর্ঘটনা

না হলে আর একশ' পঞ্চাশ দিন পর পুরোটাই তৈরী হয়ে যাবে। তারপর ম্যাগেলানকে আস্তে চালিয়ে এর দৃঢ়তাটা পরীক্ষা করেই শুরু হবে নক্ষত্রের পথে যাত্রা।

ফ্লেচার তার কাজটা ঠিকভাবেই করছে, বেশ মনোযোগ দিয়েই করছে, তবে মন দিয়ে নয়। কারণ সেটা আপাতত থ্যালসায় হারিয়ে গেছে।

সে জন্মেছিল মঙ্গলে, তার মাতৃভূমিতে যে সব সুন্দর জিনিস ছিল না, তার প্রতিটিই এই গ্রহে বর্তমান। সে দেখেছে তার পূর্বপুরুষদের প্রজন্মের পর প্রজন্মের শ্রমে গড়া সভ্যতাকে আগুনে পুড়ে যেতে। সেই সভ্যতাকে আবার একশ' বছর পরে গড়ার কি দরকার, যখন এখানেই একটা স্বর্গ বর্তমান!

এবং অবশ্যই তার জন্য একটি মেয়েও প্রতীক্ষায় আছে, নীচের দক্ষিণ দ্বীপে... সে প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে, যখন সময় আসবে, সে মহাকাশযান থেকে পালাবে। তেরানরা তাকে ছাড়াই যেতে পারবে; তাদের নিজস্ব জ্ঞান এবং দক্ষতা দিয়েই। এবং সম্ভবতঃ সাগান-২ এ তাদের হৃদয় এবং শরীর দুইই বিধ্বস্ত হবে সেই পাথুরে গ্রহে। সে তাদের সৌভাগ্যই কামনা করে। তবে তার কাজ শেষ হলে, তার গ্রহ হবে এটাই। তিরিশ হাজার কিলোমিটার নীচে, ব্র্যান্ট ফ্যাকনরও সে মুহূর্তে একটি স্পর্শকাতর সিদ্ধান্ত নিল। –আমাকে উত্তর দ্বীপে চলে যেতে হবে।

মিরিসা চুপচাপ শুয়ে ছিল। ব্র্যান্টের মনে হল অনেকক্ষণ পর মিরিসা জিজ্ঞেস করল।

–কেন? কোন বিস্ময়, কোন প্রশ্ন তাতে নেই। কতটাই পরিবর্তন, ভাবল ব্র্যান্ট। তবে সে কিছু জবাব দেবার আগেই মিরিসা বলল, তুমি সেখানেও এটা পছন্দ করবে না।

–সম্ভবতঃ এখানকার চাইতে ভালো হবে; অন্ততঃ এখন যা হচ্ছে। এটা এখন আর আমার বাড়িও নয়।

–এটা সব সময়ই তোমার বাড়ি থাকবে।

–যতক্ষণ ম্যাগেলান আকাশে আছে, ততক্ষণ নয়।

মিরিসা আস্তে করে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল।

–ব্র্যান্ট, আমি এটা চাইনি। এমনকি সম্ভবতঃ লোরেনও নয়।

–তাতে কি আমার কোন আনন্দিত হবার কারণ আছে? সত্যি বলতে আমি ভেবে পাইনা, তুমি তার মধ্যে কি পেয়েছ?

মিরিসা প্রায় হেসে দিচ্ছিল। আশ্চর্য! মানব ইতিহাসে কত পুরুষ কত নারীকে এবং কত নারী কত পুরুষকে এই কথাটা বলেছে, 'ওর মধ্যে তুমি কি পেয়েছ'?

কোন উত্তর অবশ্য সে দিল না। অবশ্য দেয়ার চেষ্টাও বোকামী। তা শুধু ব্যাপারটাকে আরও জঘন্য করে তোলে। তবে কখনো কখনো সে নিজেই নিজের সন্তুষ্টির জন্য সঠিকভাবে বের করতে চায় যে, কি জন্যে সে আর লোরেন সেই প্রথম চোখাচোখির পর এমনভাবে এক হয়ে গেল।

এর বেশীর ভাগটা অবশ্য ভালোবাসার সেই অজানা রসায়ন, যা কোন যৌক্তিক বিচারের বাইরে, যা অন্যকে বোঝানো যায় না, কল্পনার ভিন্নতার কারণেই। তবে

এছাড়াও অন্যান্য ব্যাপার আছে যা যুক্তির সাহায্যে বোঝা যায়। পরস্পরকে ভালোভাবে চেনা উচিত। সেটা পরবর্তী বিচ্ছেদকে সহজে মেনে নিতে সাহায্য করে।

প্রথমত, তেরানদের ঘিরে যে বিষাদময় গৌরব আছে, তার একটা প্রভাবতো আছেই। কিন্তু সেটাতো লোরেনের অন্যান্য সাথীদের মধ্যেও আছে। লোরেনের মধ্যে এমন কি আছে, যা ব্র্যান্টের মধ্যে নেই?

প্রেমিক হিসেবে দু'জনের মধ্যে ফারাক খুব কম। লোরেন একটু বেশি কল্পনাবিশ্বাসী, ব্র্যান্ট বেশী সহনশীল, যদিও শেষ কয়েক সপ্তাহে সে একটু খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে। সে দু'জনের সঙ্গে সুখী। তাহলে জিনিসটা কি?

সম্ভবতঃ সে এমন কোন উপাদান খুঁজছে যার কোন অস্তিত্ব নেই। কোন বাড়তি গুণ নয়, সামগ্রিক বিচারে হয়তো লোরেন ব্র্যান্টের চাইতে কয়েক পয়েন্ট বেশী পেয়ে এগিয়ে গেছে, ব্যাপারটা হয়তো এমনই হবে।

তবে একটা ব্যাপারে লোরেন ব্র্যান্টের চাইতে কয়েকগুণ এগিয়ে আছে। তার একটা গতি আছে, আকাঙ্খা আছে যা কিনা থ্যালসায় দুর্লভ। আসলে এজন্যই লোরেনকে সে পছন্দ করছে।

ব্র্যান্টের কোন উচ্চাকাংখা নেই; যদিও তার ইচ্ছাশক্তি কম নয়। তার এখনও অসমাপ্ত মাছ ধরার ফাঁদ সেটাই প্রমাণ করে। মহাবিশ্বের কাছে তার একমাত্র চাওয়া হল মজার কোন যন্ত্র। মিরিসার মনে হয়, সেও ব্র্যান্টের কাছে তেমন কোন মজার যন্ত্র।

বিপরীত দিকে লোরেন হচ্ছে বরেণ্য অভিযাত্রী আর আবিষ্কারকদের উত্তরসূরী। সে ইতিহাস তৈরী করছে, ইতিহাসের সঙ্গে চলছে না। এবং সে ক্রমেই আরও উষ্ণ এবং মানবীয় হয়ে উঠছে।

–উত্তর দ্বীপে তুমি করবে? ফিসফিসিয়ে সে এটাই প্রমাণ করল যে সে মেনেই নিয়েছে।

–তারা ক্যালিপসোকে ঠিক করতে সাহায্য চেয়েছে। উত্তরের লোকেরা সাগরকে বোঝে না।

মিরিসা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ব্র্যান্ট পালিয়ে যাচ্ছে না। কাজেই যাচ্ছে। কাজ তাকে স্মৃতির ব্যাপারটা ভুলিয়ে রাখবে–সম্ভবতঃ যতদিন আবার তাকে জাগিয়ে তোলার সময় না হবে।

২৭. পেছনের আয়না

মোজেস ক্যালডর মডিউলটাকে আলোর দিকে এমনভাবে তুলে ধরলেন, যেন তিনি তার মাঝের জিনিসটা পড়ে ফেলতে পারছেন। তিনি বলছিলেন,

আমার কাছে এটা একটা জাদুর মতো মনে হয় যে, আমি আমার বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনীর মাঝে প্রায় এক মিলিয়ন বই ধরে রাখছি। আমার অবাক লাগে যে, ক্যাক্সটন ও গুটেনবার্গ এটা দেখলে কি ভাবতেন?

–কে? মিরিসা জিজ্ঞেস করল।

–ওঁরাই মানব জাতিকে বই পড়তে শিখিয়েছেন। কিন্তু আমাদের প্রতিভাহীনতার কারণে এখন আমাদের মূল্য দিতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে আমি দুঃস্বপ্ন দেখি যে, এরকম একটা মডিউল, যাতে কোন মূল্যবান তথ্য ধর, মহামারী ঠেকানোর উপায় সমন্ধেই বলা আছে–তা বের করার ঠিকানাটা আমরা হারিয়ে ফেললাম। তথ্যটা ওই বিলিয়ন পৃষ্ঠার কোথাও আছে, কিন্তু ঠিক কোথায় সেটা আমরা জানি না। কি দুর্ভাগ্যজনক হবে চিন্তা কর যে, তথ্যটা তোমার হাতের মুঠোয় কিন্তু তুমি তা খুঁজে বের করতে পারবে না।

–সেটা কোন সমস্যাই না, ক্যাপ্টেনের সেক্রেটারী বললেন। জন লিরয় তথ্য জমা এবং খুঁজে বের করায় একজন এক্সপার্ট। এ মুহূর্তে তিনি মহাকাশযান এবং থ্যালসার আর্কাইভের ভেতর তথ্য বিনিময় করছেন। তুমি মূল শব্দগুলো জানলেই হল। আমরা তখন একটা খোঁজার প্রোগ্রাম করব। বিলিয়ন পৃষ্ঠার মধ্যেও কয়েক সেকেন্ডে তা তথ্য বের করে আনবে।

–তুমি আমার দুঃস্বপ্নটা মাটি করলে–হতাশ স্বরে ক্যালডর বলল। তারপরই আবার হঠাৎ অনুপ্রাণিত হয়ে জিজ্ঞেস করল–কিন্তু তুমি তো মূল শব্দ বা কি ওয়ার্ড হারিয়ে ফেলতে পার। আচ্ছা তুমিই বল, জীবনে তুমি কতবার এমন কোন তথ্যের সম্মুখীন হয়েছ, যা তোমার লাগবে, অথচ সেই প্রয়োজনটাই তুমি জানতে না।

–তোমার প্রোগ্রামিংটা একেবারেই গোলমেলে–লেঃ লিরয় মন্তব্য করল।

তারা এই তর্কটা বেশ উপভোগ করে। এবং মিরিসা প্রায়ই বোঝে না, কখন এটাকে গুরুত্ব দিয়ে নিতে হবে।

জন এবং মোজেস কখনোই চায় না, মিরিসা তাদের কথার বাইরে থাকুক। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতার পরিধি এতো বিশাল, যে মিরিসার মাঝে মাঝে মনে হয়, সে কোন দুর্বোধ্য ভাষা শুনছে।

–যাই হোক, এতে মূল সূচীটা অছে। অন্যান্য জায়গায় কি আছে, তা আমরা দু'জনেই জানি। এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কি তথ্য আমরা নিচে দেব। কারণ, পঁচাত্তর আলোক বর্ষ দূরে বসে কোন তথ্য দেয়াটা একটা কষ্টদায়ক কাজ হয়ে যাবে, খরচের কথা বাদই দিলাম।

–আমাকে তোমরা মনে করিয়ে দিলে, মিরিসা মুখ খুললো। যদিও তোমাদের বলা আমার উচিত না। তবে, গত সপ্তাহে উত্তর দ্বীপ থেকে একটা প্রতিনিধিদল এসেছে প্রেসিডেন্ট এবং বিজ্ঞান একাডেমীর কাছে।

–দাঁড়াও, অনুমান করছি। কোয়ান্টাম ড্রাইভ!

–ঠিক।

–তারা কি প্রতিক্রিয়া দেখাল।

–তারা আনন্দিত এবং অবাকও হয়েছে যে, এটা সত্যিই আছে। তারা একটা কপি নিয়ে গেছে।

–তাদের সৌভাগ্যই কামনা করি। এবং তুমি সেটা ওদের বলতে পার। একবার একজন বলেছিল যে, মহাবিশ্ব জয়ের জন্য কোয়ান্টাম ড্রাইভের আসলে কোন প্রয়োজন নেই।

আমাদের এই শক্তিটা লাগবে সেই দিন, যখন মহাবিশ্ব আদি ব্ল্যাকহোলে পরিণত হবার জন্য সংকুচিত হবে। তখন সেটাকে ঠেকিয়ে নতুন ভাবে মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটানোর জন্য আমাদের এটা প্রয়োজন হবে।

–এই প্রশাসনের জীবদ্দশায় নয়। এসো কাজ করা যাক। এখনও প্রায় গিগাবাইট বাকি।

আর কখনো কখনো ক্যালডর প্রথম অবতরণের পাঠাগার থেকে বেরিয়ে পড়ে বিশ্রামের জন্য। এরপর সে কম্পিউটার নির্দেশিত চিত্র প্রদর্শনীর একটা ভ্রমণ নেয় (কখনোই এক ভ্রমণ পথ নয়, সে যতটা সম্ভব দেখতে চায়)। যাদুঘরটা তাকে পুরানো দিনে নিয়ে যায়। সেখানে সারাক্ষণই ছাত্রদের বা বাচ্চাসহ বাবা-মায়ের বিশাল ভীড় থাকে। মাঝে মাঝে মোজেস ক্যালডরের অপরাধীই লাগে নিজেকে, যখন সে বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হিসেবে ভীড়ের একদম মাথায় ঢুকে যায়। সে নিজেকেই স্বান্তনা দেয় এই বলে যে, থ্যালসানদের সারা জীবনটাই পড়ে আছে এই অমূল্য সম্পদ দেখার, যে বিশ্বের সঙ্গে তারা কোন দিনই পরিচিত হতে পারবে না। অথচ তার হাতে আছে মাত্র এক বছর, এই পুরোনো স্মৃতি উসকে দেবার। তার নতুন বন্ধুদের মোজেস ক্যালডর মাঝে মাঝে বোঝাতে পারে না যে, অনেক কিছুই যা তারা একসাথে দেখছে, তা মোজেস আগে দেখেনি। যা কিছু সে দেখছে, তা অন্ততঃ আটশ' বছরের পুরোনো, তার সময় হতে। থ্যালসার মহাকাশযান পৃথিবী ছেড়েছে ২৭৫১ সালে; আর সে জন্মেছে ৩৫৪১ সালে। তারপরও মাঝে মাঝে এমন সব চেনা জিনিস দেখা যায়, যা তার স্মৃতিকে ধরে ভীষণ নাড়া দেয়।

'রাস্তার পাশের ক্যাফে' হচ্ছে সবচেয়ে অপ্রাকৃত প্রদর্শনী এবং সবচে স্পর্শকাতর। একটা চাঁদোয়ার নীচে এককাপ কফি বা ওয়াইন নিয়ে সে ছোট্ট টেবিলটায় বসে থাকে, আর তখন ব্যস্ত একটা নগরীর জীবন তার চারপাশ দিয়ে বয়ে চলে। যতক্ষণ না সে টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ায়, ততক্ষণ বাস্তব আর এই বিভ্রমের মধ্যে সে কোন ফারাক করতে পারে না। ক্ষুদ্র ভাবেই, পৃথিবীর বিখ্যাত শহরগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে। রোম, প্যারিস, লন্ডন, নিউইয়র্ক–গ্রীষ্মে এবং শীতে–দিনে এবং রাতের প্রেক্ষাপটে সে দেখে টুরিস্ট আর ব্যবসায়ী, ছাত্র আর প্রেমিক প্রেমিকারা হেঁটে চলছে। এটা যে রেকর্ড করা তা মনে থাকলেও যখন তারা শতাব্দীর প্রাচীন সময়ে থেকে তাঁর প্রতি হাসি ছুঁড়ে দেয়, সে সাড়া না দিয়ে পারে না। বাকি যে দৃশ্যগুলো ওখানে আছে, তাতে কোন মানুষ বা তার সৃষ্টি নেই।

মোজেস ক্যালডর আবার তাকিয়ে দেখে, যেমন সে দেখেছে আরেক জীবনে, ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের উঠে আসা ধোঁয়া, গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের উপরে উঠে আসা চাঁদ, হিমালয়ের তুষার মুকুট, অ্যান্টার্কটিকার বরফ। শহরের দৃশ্যের মতোই হাজার বছর পরেও রেকর্ডে তাদের এতোটুকু পরিবর্তন হয়নি। এবং যদিও তারা মানুষের চাইতে বহু আগে থেকেই বেঁচে ছিল, মানব সভ্যতা তাদের চাইতে বেশি বাঁচেনি।

২৮. ডুবন্ত অরণ্য

কাঁকড়াটার খুব একটা তাড়া ছিল না। পঞ্চাশ কিলোমিটার অতিক্রম করতে এটা দশ দিন সময় নিল। শব্দ তৈরীর যে যন্ত্রটা কিছুক্ষণ পর পর এর জায়গা বুঝিয়ে দেয় (যন্ত্রটা পরাতে কষ্ট না হলেও কাঁকড়াটা বেশ রেগে গিয়েছিল) সেটা দিয়ে একটা কৌতুহলোদ্দীপক যে তথ্য পাওয়া গেল–কাঁকড়াটা ঠিক সোজা পথে চলছে অর্থাৎ কোথায় যেতে হবে এটা জানে।

গন্তব্যটা যেখানেই হোক না কেন, বোঝা গেল এটা সেখানে পৌঁছে গেছে। প্রায় আড়াইশ' মিটার গভীরে, সেখানে যাবার পর এটা ঘোরাফেরা করছিল, কিন্তু খুব নির্দিষ্ট গন্ডীর ভেতরেই। এভাবে দুদিন যাবার পর হঠাৎ করেই একদিন সংকেত দেবার মাঝপথে যন্ত্রটা চুপ করে গেল।

কাঁকড়াটাকে এর চাইতেও বড় কিছু খেয়ে ফেলেছে, এমন একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল খুবই আদিম ধরনের। কারণ যন্ত্রটা শক্ত ধাতুর পাতে মোড়ানো। এটাকে কোন দাঁত বা দাঁড়া দিয়ে ভাঙ্গতে গেলেও মিনিটখানেক সময় লাগবে আর কেউ গিলে ফেললেও পেটের মধ্যেও এটা কাজ করবে।

আর দুটো ব্যাখ্যা ছিল। তার প্রথমটা উত্তরের সমুদ্র তলদেশের পরীক্ষাগারের লোকজন দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করল।

–প্রতিটি জিনিসের একটা করে বিকল্প ছিল। পরিচালক বলছিলেন, –তাছাড়াও মাত্র দু'সেকেন্ড আগে সব কিছু ঠিক থাকার সংকেত দিয়েছে যন্ত্রটা। এটা কোন যান্ত্রিক গোলযোগ হতেই পারে না।

তাহলে আর বাকী থাকল একটা অসম্ভব ব্যাখ্যা। যন্ত্রটার সুইচ অফ করে দেয়া হয়েছে। আর সেটা করতে হলে উপরের বন্ধ ঢাকনাটা খুলতে হবে।

আর সেটা কোনো দুর্ঘটনা হতে পারে না, সেটা হবে একটা ইচ্ছাকৃত চেষ্টা।

দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট, বিশ মিটার লম্বা ক্যালিপসো জাহাজটা থ্যালসার সবচে বড় জাহাজ না হলেও একমাত্র সামুদ্রিক গবেষণার জাহাজ। লোরেন অবাক হয়ে আবিষ্কার করল যে উত্তর দ্বীপে রাখা এই জাহাজটির বৈজ্ঞানিক সদস্যরা এবং তারানার যাত্রীদের মধ্যে যে পরিহাস চলে, তাতে বোঝা যায় এরা তাদের অশিক্ষিত জেলে বলেই ভাবে। যেমন, দক্ষিণের লোকেরা কখনোই মনে করিয়ে দিতে ভোলে না যে, তারা কাঁকড়াগুলোকে আবিষ্কার করেছে। লোরেন অবশ্য কখনোই বলেনা যে, ঘটনাটা ঠিক সে রকম নয়।

ব্র্যান্টের সঙ্গে আবার দেখা হওয়াটা অবশ্য সামান্য অনাকাংখিত। তবে লোরেন জানত যে এটা হবে। বিশেষতঃ সে যখন ক্যালিপসোর নতুন যন্ত্রপাতিগুলো দিয়েছে। তারা পরস্পরকে শীতল ভদ্রতার সঙ্গে স্বাগত জানাল–অন্যান্য যাত্রীদের উৎসুক দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করেই। থ্যালসায় গোপন জিনিস বলে খুব কম জিনিসই আছে। ইতিমধ্যেই সবাই জেনে গেছে যে, লিওনার্দদের প্রধান অতিথি রুমে এখন কে থাকছে।

জাহাজের পাটাতনে রাখা ছোট সাগরতলের অনুসন্ধানী যন্ত্রটা গত দু'হাজার বছরের মধ্যকার যে কোন অনুসন্ধানীর কাছে পরিচিতই মনে হবে। এতে আছে তিনটি টেলিভিশন ক্যামেরা, একটা ধাতব জাল–যার ভেতর একটা রোবট হাতের মাধ্যমে বিভিন্ন নমুনা রাখা হয় আর বিভিন্ন দিকে চালানোর জন্য একটা পানি চালিত জেট। পানিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে এর রোবটটা একটা ফাইবার অপটিক ক্যাবল–যা পেন্সিলের সীসার চাইতেও চিকন–সেটার সাহায্যে তথ্য ও ছবি পাঠাতে থাকে। প্রযুক্তিটা হাজার বছরের পুরোনো, কিন্তু কাজের জন্য যথেষ্ঠ।

ডাঙ্গার চিহ্ন একসময় মুছে গেল, এবং এই প্রথমবারের মতো লোরেন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমুদ্রের মধ্যে আবিষ্কার করল। তার মনে পড়ল ব্র্যান্ট আর কুমারের সঙ্গে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে গিয়েই সে কি ভয় পেয়েছিল। অবশ্য এবার সে কিছুটা ভালো বোধ করছে, সম্ভবত জাহাজটা একটু বড় বলেই।

আশ্চর্য ব্র্যান্ট বলল। –আমি এতো দক্ষিণে কখনো আগাছা দেখিনি।

প্রথমে লোরেন কিছুই দেখল না। তারপর সে পানির নিচে গাঢ় বর্ণটা ঠাহর করতে পারল। কয়েক মিনিট পর জাহাজটা এক ভাসমান গুল্মের সাগরের মধ্যে এগোতে থাকল এবং ক্যাপ্টেন এক পর্যায়ে গতি খুব কমিয়ে আনলেন।

–আমরা প্রায় এসে গেছি, তিনি বললেন, আমাদের উপস্থিতি জানানোর কোন প্রয়োজন নেই। তাই না ব্র্যান্ট?

–হ্যাঁ। আমরা সংকেত দেয়া যন্ত্রটা বন্ধ হয়ে যাবার জায়গা থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে আছি। গভীরতা দু'শ দশ। জিনিসটাকে ফেলা যাক।

–এক মিনিট! উত্তর দ্বীপের এক বিজ্ঞানী বলে উঠলেন। যন্ত্রটা বানাতে আমাদের অনেক সময় এবং অর্থ ব্যয় হয়েছে। এবং এর কোন দ্বিতীয়টি তৈরী হয়নি। যদি এটা এই হতচ্ছাড়া আগাছায় আটকে যায়?

একটা চিন্তাশীল নীরবতা নেমে এল। এরপর কুমার, যে কিনা আজকে বিসদৃশ রকমের চুপচাপ–সম্ভবতঃ উত্তরের দ্বীপের উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞান দেখে সে থমকে গেছে, কথা বলে উঠল, –এটাকে দেখতে বেশি খারাপ লাগছে। দশ মিটার নীচে কোন পাতাই নেই, শুধু কান্ড। জঙ্গলের মতোই তার মাঝে প্রচুর জায়গা আছে।

লোরেন ভাবল, সত্যিই এটা একটা ডুবন্ত অরণ্য। বিজ্ঞানীরা যখন প্রধান ভিডিও এবং যন্ত্রপাতিগুলোকে দেখছে, সে তখন একটা গগল্‌স্ পরে নিল, যাতে তার চোখের সামনে রোবটের সামনের দৃশ্যই শুধু ভেসে উঠল। মানসিকভাবে সে এখন

ক্যালিপসোতে নেই। তার পাশের লোকদের কথা যেন ভেসে আসছে অন্য এক জগৎ থেকে। সে এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করছে। এ জগতে কেবল নরম নীল আর সবুজ রং-এর খেলা, আর দৃষ্টিসীমা মাত্র তিরিশ মিটার।

–দু'শ পঞ্চাশ মিটার। আমরা খুব শিগগিরি তলদেশ দেখতে পাব। আমরা কি আলো জ্বালব, যে অবস্থা আলোর।

লোরেন কোন পরিবর্তন দেখল না। কারণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে উজ্জ্বলতা তার যন্ত্রে ঠিক করা হচ্ছিল। তবে সে বুঝতে পারল, এই গভীরতায় মানুষের চোখ কিছুই দেখবে না।

–না, দরকার না হওয়া পর্যন্ত কিছু পরিবর্তনের দরকার নেই। যতক্ষণ ক্যামেরা কাজ করছে ততক্ষণ এই আলোই থাক।

–আমরা তলদেশে চলে এসেছি। সবটাই প্রায় পাথর, বালি খুব কম।

–তাই তো হওয়া উচিত। ম্যাক্রোসিস্টিম থ্যালাসির জন্য পাথর লাগে। তারা বালিতে বাঁচতে পারবে না।

লোরেন বুঝতে পারল বক্তা কি বলতে চাইছে। পাথরগুলোকে শেকড়গুলো এমনভাবে আঁকড়ে রেখেছে যে, তারা স্রোতে ভেসে যাচ্ছে না। অরণ্যের সঙ্গে তুলনাটা আসলেই ঠিক।

খুব সাবধানে রোবট যন্ত্র এই শেকড়ের মধ্য দিয়ে চলতে লাগল। চলতে অবশ্য খুব একটা ঝামেলা হচ্ছিল না, কারণ এই বিশাল গাছগুলোর মধ্যে বেশ ভালো জায়গা খালি আছে। যেন মনে হয় ইচ্ছে করেই...

বিজ্ঞানীরা যারা মনিটর দেখছিল, তারাও এই অবিশ্বাস্য সত্যটি আবিষ্কার করল লোরেনের কয়েক সেকেন্ড পর! –ক্র্যাকান-কেউ ফিসফিসিয়ে উঠল–এটা কোন স্বাভাবিক অরণ্য নয়। এটা একটা বাগান।

২৯. স্যাব্রা

তারা নিজেদের বলত স্যাব্রা। প্রথম বসতি স্থাপনকারীদের পরে প্রায় দেড় হাজার বছর পর তারা জেগে ওঠে পৃথিবীর প্রতি আক্রমণাত্মক ভাব নিয়ে। অবশ্য মঙ্গলের স্যাব্রারা একদিক থেকে ছিল ভাগ্যবান। কারণ তাদের কোন মনুষ্য শত্রু ছিল না। শুধু ছিল গরম, কষ্টসাধ্য আবহাওয়া আর গ্রহের বিশাল বালিঝড়। আর এ সমস্ত বাধার সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা এটাই বলতে ভালোবাসত যে, তারা শুধু টিকেই থাকেনি, বরং তাঁরাই যোগ্যতম। এই মন্তব্যটি অবশ্য অসংখ্য জিনিসের মতো পৃথিবী থেকে আমদানিকৃত, যদিও তাদের হিংস্র স্বাধীনতা সেটাকে কখনোই স্বীকার করত না।

প্রায় হাজার বছর ধরে তারা একটা ঘোরের মধ্যে ছিল –প্রায় ধর্মের মতোই। এবং সব ধর্মের মতোই এটা তাদের সমাজে অত্যাবশ্যক ছিল। এটা তাদের জীবনকে একটা লক্ষ্য দিয়েছিল, জীবনের চাইতেও বড় কোন উদ্দেশ্য।

যতক্ষণ না হিসাব কিতাব দেখাচ্ছিল, ততক্ষণ তারা বিশ্বাস করত–অন্ততঃ আশা করত–মঙ্গল পৃথিবীর মতো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। যদিও দুটোই খুব কাছাকাছি, তবুও বাড়তি দূরত্বটুকু পঞ্চাশভাগ বিকিরণ কমিয়ে আনবে–সেটা হয়ত বাঁচিয়ে দেবে। দুই মেরুর প্রাচীন কিলোমিটার পুরু বরফের বাষ্প হয়ত রক্ষা করবে। সম্ভবতঃ মঙ্গলবাসী বাঁচতে পারবে যখন পৃথিবীবাসী বাঁচবে না। এমনকি সেখানে একটা ফ্যান্টাসী ছিল যদিও খুব কম লোকই তা বিশ্বাস করত–যে মেরুর সব বরফ গলে গিয়ে তাদের মৃত সমুদ্র আবার ভরে যাবে। এবং তখন হয়তো মানুষ খোলা আকাশের নিচে সাধারণ অক্সিজেন মাস্ক এবং তাপ-নিরোধক পোশাক পরেই ঘুরতে পারবে।

কিন্তু সব শেষে নির্ভুল হিসাব এই সত্যিটাকে নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলল। কোন চেষ্টা বা হিসাবই তাদের ধ্বংস হতে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল না। তারাও তাদের কোমল মাতৃগ্রহের মতোই বিলীন হয়ে যাবে।

অবশ্য এখন, ম্যাগেলানের নীচের গ্রহটা মঙ্গলবাসীদের শেষ প্রজন্মের স্বপ্নের আবার প্রতীক হয়ে এসেছে। ইয়েন ফ্লেচার যখনই নীচের অন্তহীন সাগর দেখে, একটা চিন্তা তার মাথায় বাড়ি দিতে থাকে।

নাক্ষত্রিক ছবি অনুযায়ী সাগান-২ অনেকটা মঙ্গলের মতো যেজন্য সে এবং তার সাথীদের এই অভিযানের জন্য নেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনশ বছর বা পঁচাত্তর আলোকবর্ষ পর সেই যুদ্ধ আবার আরম্ভ করার কি মানে হয়? যেখানে বিজয় এখানে এসে গেছে এখনই? ফ্লেচার এখন মোটেই শুধু পালানোর কথা ভাবছে না। তাতে অনেক কিছু ছাড়তে হবে। থ্যালসায় লুকিয়ে থাকাটা সহজ হবে। কিন্তু ম্যাগেলান যখন উড়ে যাবে তার যৌবনের বন্ধু এবং সাথীদের নিয়ে, কেমন লাগবে তার?

বারজন স্যাব্রা শীতনিদ্রায় আছে। যে পাঁচজন জেগে আছে তাদের মধ্যে দু'জনের সঙ্গে সে হালকা ভাবে কথাটা বলেছে এবং একটা ইতিবাচক উত্তর পাওয়া গেছে।

যদি আরও দু'জন রাজী হয়, ঘুমানো ডজনের পক্ষে তারাই কথা বলবে।

ম্যাগেলানের নক্ষত্র-যাত্রার সমাপ্তি এখানেই ঘটাতে হবে, এই থ্যালসায়।

৩০. ক্র্যাকানের সন্তান

ক্যালিপসো যখন তারনার দিকে বিশ ক্লিক গতিতে ফিরছে তখন খুব কম কথাবার্তাই হচ্ছিল। এর যাত্রীরা নীচ থেকে আসা ছবিগুলোর ব্যাপারেই চিন্তায় ডুবে ছিল। লোরেন তখনও গগলস পরে আগের ডুবন্ত জঙ্গলের দৃশ্য আবারও দেখছিল পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

যান্ত্রিক মাকড়সার মতো তার ছেড়ে দিয়ে রোবটটা বিশাল কান্ডগুলোর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। যেগুলো উচ্চতার কারণে অনেক চিকন মনে হলেও আসলে তা

মানুষের চেয়েও মোটা। এটা যে নিয়মিত সারিবদ্ধভাবে লাগানো তা এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তাই যখন একটা খালি জায়গায় এসে পৌছান হলো তখন কেউই অবাক হল না। এবং সেখানে কলকব্জাগুলো সব জড়ো হয়ে আছে।

আলো জ্বালানো ঠিক হবে না, কারণ প্রাণীগুলো অন্য কারও উপস্থিতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। কাঁকড়াগুলোর ব্যস্ততা লোরেনকে পিঁপড়ে, মৌমাছি বা উইয়ের ওপর দেখা ভিডিওর কথা মনে করিয়ে দিল। প্রথম দেখায় এটা বিশ্বাস করা কষ্ট যে কোন নিয়ন্ত্রণকারীর বুদ্ধিমত্তা ছাড়া একাজটি হচ্ছে। তবুও তাদের ব্যবহার পৃথিবীর গোষ্ঠীবদ্ধ পোকার মতোই সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হতে পারে।

কিছু কাঁকড়া বড় কাণ্ডগুলোকে ভাসিয়ে রেখেছে। অন্যরা সমুদ্র তলদেশে পাথর, পাতা এবং স্থূল কিন্তু নিশ্চিতভাবেই জাল ও ঝুড়ি জাতীয় জিনিস নিয়ে চলাচল করছে। তাহলে কাঁকড়াগুলো যন্ত্রপাতি বানাতে জানে। যদিও এটাও বুদ্ধিমত্তাকে নির্দেশ করে না। কিছু পাখী খুব সুন্দরভাবে বাসা বানাত, সাধারণ লতাপাতা দিয়েই। নিজেকে মহাবিশ্বের আগুন্তক বলে মনে হচ্ছে, লোরেন ভাবল। যে কিনা প্রস্তর যুগের পৃথিবীবাসীদের দেখছে, মানুষ যখন সবে কৃষি শিখেছে। সে কি ঠিকভাবে এধরনের একটা সার্ভে থেকে বুদ্ধিমত্তার আসল স্তরটা বের করতে পারত? অথবা নীচের এগুলো কি শুধুই স্বয়ংক্রিয় ব্যবহার?

প্রোবটা এখন এতই নীচে নেমে গেছে যে আশেপাশের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না। এরপর একজনের মুখ থেকে একটা হঠাৎ বেরিয়ে আসা শব্দ, যা পরবর্তীতে পরিচিতিমূলক বা বৈজ্ঞানিক রিপোর্টে স্থান পেত তাই সবার মনের কথা বলে দিল –কাকড়ার ডুবন্ত শহর।

এটা অনেকটা বসবাস ও বাণিজ্যকেন্দ্রের সমন্বয়। পাঁচ মিটার উঁচু একটি পাথরের বেরিয়ে থাকা অংশ এখানে বিরাজ করছে। এর মুখে অসংখ্য কাল ছিদ্র, যার ভেতর দিয়ে একটা কাঁকড়া যেতে পারে এমন গর্তে ভর্তি। যদিও সেগুলো অনিয়মিত কিন্তু তবুও তার আকারটা এতই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, তা যে প্রাকৃতিক নয় তা বলাই বাহুল্য। মনে হয় যেন পুরোটা একটা প্রাগৈতিহাসিক এপার্টমেন্ট।

কাঁকড়াগুলো গর্তগুলো দিয়ে ঢুকছে বেরুচ্ছে এমনভাবে যা টেলিযোগাযোগ বিহীন পুরোনো শহরের অফিস কর্মচারীদের ব্যস্ততা মনে করিয়ে দেয়। তাদের কাজকর্ম যদিও অর্থহীন মনে হচ্ছে, মানুষদের কাজকর্মও তাদের কাছে অর্থহীন মনে হবে– লোরেন ভাবল।

–আচ্ছা ওটা কি? কেউ একজন বলল। একদম ডানে, আরও কাছে যাওয়া যায় কি?

কথাটা ঝাকুনী দিয়ে মুহূর্তের জন্য লোরেনকে সমুদ্র তলদেশ থেকে জাহাজে নিয়ে এল।

প্রোব ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটা বদলে গেল। এটা একটা আলাদা পিরামিডের মতো পাথরের কাছে নিয়ে এল। পাথরটা দশ মিটারের মতো উঁচু। দুটো কাঁকড়া

নীচ থেকে সেটাকে দেখছে। এবং সেখানে একটা মাত্র ঢোকার গর্ত। লোরেনের কাছে প্রথমে কোন অস্বাভাবিকতাই ধরা পড়ল না। পরে ধীরে ধীরে কিছু ব্যতিক্রম তার কাছে স্পষ্ট হলো, আশপাশের কাঁকড়াপল্লীর পরিচিত দৃশ্যের চাইতে ভিন্ন।

অন্য সব কাঁকড়াই ব্যস্তভাবে চলাফেরা করছে। কিন্তু এদুটো চুপচাপ দাঁড়িয়ে ক্রমাগত মাথা নাড়ছে। এবং আরেকটা ব্যাপার হল কাঁকড়াগুলো অনেক বড়। যদিও এখানে কতটা বড় তা বোঝা কষ্টসাধ্য তবুও আশেপাশেরগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে ওগুলো প্রায় দেড় গুণ।

–ওগুলো কি করছে? কেউ ফিসফিসিয়ে বলল।

–আমি বলছি –ওগুলো গার্ড, সেন্ট্রি। অন্য একজন উত্তর দিল।

–আসলেই তাই, কেউ প্রতিবাদও করল না।

–কিন্তু ওরা কি পাহারা দিচ্ছে?

–রানী, যদি থাকে।

–কিভাবে বুঝব। যন্ত্রটা ভেতরে যাবার জন্য অনেক বড়।

এখান থেকে আলোচনাটা তত্ত্বীয় পর্যায়ে চলে গেল। রোবট প্রোবটা এখন পিরামিডের চূড়ার দশ মিটার ওপরে। আরও নীচে যাতে নেমে না যায় সেজন্য অপারেটর জেট কন্ট্রোলের ছোট্ট একটা মটর চালু করল। এর শব্দ বা কাঁপুনী সম্ভবতঃ পাহারাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দুজনেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। দ্রুতই তারা পিরামিডের চূড়ায় চলে এল। রোবট প্রোব থেকে মাত্র কয়েক মিটার নীচে।

–এরা লাফ দেবার আগে ভাগি, অপারেটর বলল। এরা তুলার মতোই আমাদের যন্ত্রটা ভেঙ্গে ফেলব।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। একটা ইতিমধ্যেই রোবটের তলা ধরে ফেলেছে এবং অন্যটা উঠছে। অপারেটরের মনুষ্য রিফ্লেক্স অবশ্য সমানই দ্রুত এবং উন্নত যান্ত্রিক সহায়তা প্রাপ্ত। সে দ্রুতই এটা ওপরে ওঠাল, রোবটের হাত বাড়িয়ে দিল যুদ্ধের জন্য এবং সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হিসেবে সে ফ্লাড লাইট জ্বেলে দিল।

কাঁকড়াগুলো নিশ্চয়ই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মানুষের মতোই বিস্ময়ে এর চোয়াল খুলে গেলে এবং এটা কোন যুদ্ধ ছাড়াই পাথরে নেমে গেল।

সেকেন্ডের জন্য লোরেনও অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর ক্যামেরা ঠিক হলে দূরে কাঁকড়াগুলো দেখা গেল। এবং এদের ডান দাঁড়ায় লাগানো ধাতব রিং-গুলো দেখে সম্ভবত কেউই অবাক হলো না।

ক্যালিপসো যখন তীরের দিকে ফিরছে সে তখনও এই দৃশ্যগুলো দেখায় এতই মগ্ন যে জাহাজের নীচ দিয়ে চলে যাওয়া মৃদু শকওয়েভ সে টেরই পেল না। কিন্তু এরপর সে চারপাশের চিৎকার হট্টগোল টের পেল। সে গগলস খুলে প্রখর রোদে প্রায় অন্ধ হয়ে গেল। কোনমতে তাকিয়ে দেখল যে দক্ষিণ দ্বীপ থেকে তারা এখনও কয়েকশ মিটার দূরে। তাহলে আমরা রীফে ধাক্কা খেয়েছি সে ভাবল। এরপর

পূবদিকে যা সে দেখল তা থ্যালসার শান্ত পরিবেশে একদম বেমানান। দু'হাজার বছর ধরে মানুষের দুঃস্বপ্নের মতো বিশাল এক ব্যাঙের ছাতার মতো ধোয়ার স্তম্ভ।

ব্র্যান্ট কি করছে? তীরের দিকে না গিয়ে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে সে সমুদ্রের দিকে ছুটছে।

—ক্র্যাকান। একজন উত্তরের বৈজ্ঞানিক বলল। প্রথমে লোরেন ভাবল এ বুঝি সেই ল্যাসান বাগধারা। তারপর সে বুঝল সাময়িক একটা স্বস্তিও পেল।

—না, কুমার বলল। লোরেনের প্রত্যাশার চাইতে সে বেশীই উদ্বিগ্ন। ক্র্যাকান না। এটা আরও কাছে, ক্র্যাকানের সন্তান। জাহাজের রেডিও এর মধ্যেই অবিরাম অ্যালার্ম শুনিয়ে চলছে, মাঝে মাঝে কিছু সতর্কবাণীসহ। লোরেন এতসব হজম করার সময় পেল না, যখন অদ্ভুত কিছু একটা দিগন্তে ঘটল। ওটা ঠিক জায়গায় নেই। পুরোটাই গোলমেলে। তার মনের অর্ধেকটা এখনও কাঁকড়ার রাজ্যে। রোদ মনে হয় তার চোখে এখনও কিছু সমস্যা করছে। কারণ যদিও এখনও ক্যালিপসো হালের ওপর আছে তার মনে হচ্ছে এটা সোজা সমুদ্রের তলদেশের প্রতি ছুটছে।

না আসলে তা নয়, সমুদ্রই ক্যালিপসোকে গিলে ফেলতে চাইছে। প্রচন্ড গর্জনে আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। তাদের ওপর যে জলোচ্ছ্বাস ভেঙ্গে পড়ছে তার উচ্চতা মাপার সাহস তার হল না। এতক্ষণে সে বুঝল কেন ব্র্যান্ট গভীর সমুদ্রের প্রতি ছুটছে। অগভীর পানিতে এই ঢেউ বোট ভেঙে ফেলবে।

একটা বিশাল হাত ক্যালিপসোকে শুন্যে উচিয়ে ধরল। লোরেন অসহায়ভাবে ডেকের ওপর পিছলে পড়ে গেল। আশে পাশে কিছু ধরবার আগেই সে নিজেকে আবিষ্কার করল পানিতে।

জরুরী ট্রেনিংএর কথা ভাবো, লোরেন ক্রুদ্ধভাবে নিজেকেই বলল। মহাশুন্য কি সমুদ্র সব জায়গাতেই জরুরী অবস্থা এক। আসল বিষয়টা হচ্ছে ঘাবড়ে না যাওয়া, সুতরাং মাথা ঠান্ডা রাখ...

ডুবে যাবার কোন ভয় নেই। তার গায়ে লাইফ জ্যাকেট আছে। কিন্তু এটা ফোলাবার লিভারটা কই। তার কাঁপা আঙ্গুলগুলো বহুকষ্টে কোমড়ের কাছে ঠান্ডা ধাতব বস্তুটা খুজে পেল। সেটা অবশ্য সহজেই ঘুরে গেল এবং স্বস্তিকর ভাবেই তার চারপাশে জ্যাকেটটা ফুলে গেল।

এখন একমাত্র সত্যিকারের বিপদের কারণ হবে ক্যালিপসো যদি তার মাথায় আছড়ে পরে। কোথায় সেটা?

দূরে ওটা ভাসছে। প্রায় সব ক্রুই ডেকে। এখন তারা তার দিকেই দেখাচ্ছে। কেউ একজন একটা লাইফ বেল্ট ছোড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পানিতে অনেক আবর্জনা, চেয়ার, বাক্স, যন্ত্রপাতির টুকরো। বুদবুদ তুলে সেগুলো ধীরে ডুবে যাচ্ছে। আশা করি তারা এগুলো উদ্ধার করতে পারবে, নাহলে এটা হবে অত্যন্ত ব্যয়বহুল যাত্রা, লোরেন ভাবল। কাঁকড়াদের কাছে আবার যেতে

তাহলে বহু সময় লাগবে। নিজেকে এত স্থির দেখে তার বেশ গর্ব হতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে।

কিছু একটা তার ডান পায়ে আটকে গেছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সে ডান পাটা ছুঁড়ল। এটা বেশ বিরক্তিকর তবু ভয়ের না, কারণ সেতো ভাসছেই আর প্রকাণ্ড ঢেউগুলো চলে যাচ্ছে।

আরেকটু সতর্কভাবে সে আবার পা ছুড়ল। এবার তার অন্য পা-টাও ঐ জিনিসে আটকে গেল। এবং এখন সে আর আগের অবস্থায় নেই। লাইফ জ্যাকেট সত্ত্বেও কিছু একটা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নীচে।

এবার প্রথম লোরেন লোরেনসন ভয় পেল। নীচের সেই বিশাল গুল্মের কথা তার এই প্রথম মনে এল। যদিও সেগুলো নরম কিন্তু তার চরিত্র দড়ির মতো।

সে হয়তো নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারত কিন্তু তার আগেই কিছু পানি তার মুখে এক অপ্রত্যাশিত ঢেউয়ের কারণে ঢুকে গেল। কাশতে কাশতে দম বন্ধ অবস্থায় সে ফুসফুস পরিষ্কার করতে চাইল এবং পানি ও বাতাস, জীবন ও মৃত্যুর মাঝে যে মাত্র মিটার খানেক দূরত্ব সেই দূরত্ব অতিক্রমের শক্তি তার আর রইল না।

এসময় মানুষ নিজে বাঁচা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। কোন স্মৃতি, কোন অনুশোচনা, এমনি মিরিসার কথাও তার মনে এল না।

যখন সে বুঝল সে মারা যাবে কোন ভয় তার লাগেনি। শুধু পঞ্চাশ আলোকবর্ষ পেরিয়ে এমন সাধারণ মৃত্যুর জন্য তার কিছু রাগই লাগল।

তাই লোরেন লোরেনসন দ্বিতীয়বার দুশ বছর পর থ্যালসার সাগরে দ্বিতীয় মৃত্যুবরণ করল।

অদৃশ্য যুদ্ধ

৩১. আবেদন

যদিও ক্যাপ্টেন সিরডার বে তার শরীরে কুসংস্কারের ছিটেফোঁটাও নেই বলে গর্ব করেন, কিন্তু তবুও সবকিছু খুব বেশী ভালোভাবে চললে তিনি চিন্তিত হতে থাকেন। এ পর্যন্ত থ্যালসায় সবকিছু খুব বেশী ভালোভাবে চলেছে। একদম পরিকল্পনা মতো। বরফের বর্মটা পরিকল্পনা মাফিক এগুচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যাও হয়নি। কিন্তু এখন তার শান্তি নষ্ট করেছে এই বিরক্তিকর চিঠি। ক্যাপ্টেন আবার পড়লেন।

সময়কাল: কোন সময় বা তারিখ নেই
পাবেন: ক্যাপ্টেন
প্রেরক: অজানা

স্যার, আমরা কয়েকজন আপনার কাছে একটি প্রস্তাব দিচ্ছি, যা আপনার সর্বোচ্চ মনোযোগ দাবী করে। আমরা মনে করি, আমাদের অভিযানের শেষ এই থ্যালসায় হওয়া উচিত।
আমাদের সমস্ত উদ্দেশ্যই সফল হবে, কেবল মাত্র সাগান-২ এর বিপদগুলো ছাড়া। আমরা এও সম্পূর্ণভাবে জানি যে, বর্তমান জনসংখ্যার জন্য সেটা হবে একটা সমস্যা। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আমাদের প্রযুক্তি তার সমাধান দেবে–বিশেষত আমাদের ভূ-তাত্ত্বিক প্রকৌশল দিয়ে আমরা ভূমির পরিমাণ বাড়াতে পারব। নিয়মাবলীর ধারা ১৪, অনুচ্ছেদ ২৪(ক) অনুযায়ী, আমরা মহাকাশযানের কাউন্সিলকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য অনুরোধ জানাই।

–বেশ, ক্যাপ্টেন ম্যালিনা, অ্যাম্বেসেডর ক্যালডর, কোন মন্তব্য?

দু অতিথিই ক্যাপ্টেনের বিশাল কিন্তু নিরাভরণ রুমে বসে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ক্যালডর ডেপুটি ক্যাপ্টেনের দিকে একটা অস্পষ্ট নড করলেন এবং চমৎকার থ্যালসান মদে আরেকবার চুমুক দেবার ইচ্ছেটা স্পষ্টই পরিত্যাগ করলেন। ডেপুটি ক্যাপ্টেন ম্যালিনা, যে কিনা মানুষের চাইতে যন্ত্রের সঙ্গেই বেশী স্বচ্ছন্দ, মুদ্রিত কাগজটার দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

–অন্ততঃ ভঙ্গিটা বেশ ভদ্র।

–আমিও তাই আশা করি–ক্যাপ্টেন অসহিষ্ণুভাবে বললেন, তুমি কি ধরতে পারছ কারা এটা করতে পারে।

–না কাউকে না। আমাদের বাদ দিলে প্রায় ১৫৮ জন সন্দেহের তালিকায় পড়বে।

–সেটা খুব ছোট কিছু নয়। কি ডক্টর, তোমার কোন তত্ত্ব আছে এ ব্যাপারে?

অবশ্যই আছে, ক্যালডর ভাবল। আমি মঙ্গলে দুটো দীর্ঘ বছর কাটিয়েছি। কিন্তু সেটা একটা সন্দেহ মাত্র, আর আমি ভুলও হতে পারি।

–এখনও নয় ক্যাপ্টেন। তবে আমি চোখ কান খোলা রাখব। কিছু জানলে সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে জানাব।

দু'জন অফিসার তাকে পুরোপুরিই বুঝতে পেরেছে। কাউন্সিলর হিসেবে, মোজেস ক্যালডর এমন কি ক্যাপ্টেনের কাছেও দায়বদ্ধ নয়। ম্যাগেলানে সে একজন স্বীকারোক্তি গ্রহণকারী পুরোহিতের কাছাকাছি পর্যায়ে আছে।

–আমি আশা করি ড. ক্যালডর, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে জানাবে। বিশেষত এমন কিছু যা এই যাত্রাকে নির্বিঘ্ন করতে সাহায্য করবে।

ক্যালডর ইতস্ততঃ করলেন। আশা করা যায় তিনি সেই প্রাচীন পুরোহিতের মতো অবস্থায় পরবেন না। যার কাছে কোন খুনী স্বীকারোক্তি দিয়েছে এবং অন্য খুনের পরিকল্পনা বলছে।

ক্যাপ্টেন তিক্ততার সাথে ভাবলেন, আমি তেমন সাহায্য পাবো না। তবে আমি এ দু'জনকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারি, যাদের কাছে বলা যায়। অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমিই নেবো।

–প্রথম কথা হলো, আমি কী এর উত্তর দেবো, না দেবোনা? দুটোই বিপজ্জনক। যদি এমন হয় যে, এটা একটা সাধারণ অনুরোধ–হয়তো যে কোন একজনের সাময়িক মানসিক দুর্বলতা–সেক্ষেত্রে একে গুরুত্বের সঙ্গে নিলে ভুল হবে। কিন্তু এখানে যদি একটা দল থাকে, তাহলে কথা বলাটাই লাভজনক। সেক্ষেত্রে অবস্থাটা একটু সহজ হবে। কারা দায়ী সেটাও হয়তো বের করা যাবে।

কিন্তু তারপর কি হবে? –ক্যাপ্টেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন। এদের বন্দী করে রাখবো?

–আমার মনে হয় তোমার কথা বলা উচিত, ক্যালডর বললেন। অবজ্ঞা করলে সমস্যা সাধারণত বেড়েই যায়।

–আমারও তাই মনে হয়, ডেপুটি ক্যাপ্টেন ম্যালিনা বললেন। তবে আমি নিশ্চিত শক্তি কেন্দ্র পরিচালনার কোন কর্মী এতে জড়িত নয়। ওদের সবাইকে আমি গ্রাজুয়েট হবার সময় বা এর আগে থেকে চিনি।

তোমার বোকা হবার সম্ভাবনা আছে, ক্যালডর ভাবল। কেউ কি কাউকে সত্যি চিনতে পারে?

–বেশ, ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমিও এটাই ঠিক করেছি। আমার মনে হয় আমার কিছু ইতিহাস আবার পড়া দরকার। যদ্দুর মনে পড়ে সমুদ্রের ম্যাগেলানও তার নাবিকদের নিয়ে কিছু সমস্যায় পড়েছিলেন।

–হ্যাঁ সে পড়েছিল, ক্যালডর জবাব দিলেন। তবে আমি বিশ্বাস করি তুমি তার মতো কাউকে নির্জন দ্বীপে পরিত্যাগ করবে না। অথবা তোমার অধিনায়কদের মধ্যে কাউকে ফাঁসিতে ঝোলাবে না–সে নিজের মনেই যোগ করলো। মাঝে মাঝে ইতিহাসের কোন অংশ শোনানো বোকামী। কারণ ক্যাপ্টেন বেকে এটা মনে করিয়ে দেয়া আরও বোকামী হবে– যদিও নিশ্চয়ই তার মনে আছে–সেই মহান অভিযাত্রী তার অভিযান শেষ করার আগেই নিহত হয়েছিলেন।

৩২. ক্লিনিক

জীবনে প্রত্যাবর্তন এবারে আগেরবারের মতো সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না। লোরেন লোরেন-সনের এবার জ্ঞান ফেরাটা প্রথম বারের মতো আনন্দদায়ক নয়। বাস্তবে এটা মাঝে মাঝে এমনই কষ্টকর যে তার মনে হত যে ডুবে মরাই ভাল। তবে কিছুটা সজ্ঞানতা ফিরে এলেই সে তা ভুলে গেল। তার গলায় নল ঢোকানো। হাতে পায়ে তার লাগানো। হাত পা আটকানো, পুরোনো মত্যুছায়া মনে পড়তেই তার ভয় লাগল।

এখন আর ভয়ের কিছু নেই। সেতো নিশ্বাস নিচ্ছে না, তার ডায়াফ্রামও নড়ছে না। কি কিম্ভুত, তারা কি করছে?

তার মনিটরের কোন পরিবর্তনে একজন নার্স এল। সে হঠাৎ কানে মিষ্টি একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। কিন্তু তার চোখ বুজে এল।

–মি. লোরেনসন আপনি ভাল আছেন। ভয়ের কিছু নেই। কদিনের মধ্যেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন– না, কথা নয়।

কথা বলার কোন ইচ্ছে আমার নেই, লোরেন ভাবল। আমি ভালই জানি কি ঘটছে।

আবার হাতে ইনজেকশন, অন্তহীন ঘুম।

এর পরেরবার সে আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করল যে সবকিছু অন্যরকম। নল আর তারগুলো চলে গেছে। খুব দুর্বল লাগলেও অস্বস্তিটা নেই। এবং সে স্বাভাবিক শ্বাস নিচ্ছে।

–হ্যালো, একটা পুরুষ কণ্ঠ কয়েক মিটার দূরে শোনা গেল। লোরেন ঘোরার চেষ্টা করল। পাশের বিছানায় ব্যান্ডেজ মোড়া একটা মূর্তি চোখে পড়ল।

–আমার মনে হয় আপনি আমাকে চিনতে পারেননি মি. লোরেনসন। আমি লে. বিল হরটন, যোগাযোগ প্রকৌশলী। সার্ফবোর্ডে আঘাত পেয়েছি।

–বিল, কেমন আছ। তুমি কি করছ এখানে, লোরেন ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু আবার নার্স এল ঘুম নিয়ে।

এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং হাটাচলার জন্য আকুপাকু করছে। কমান্ডার নিউটন সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস করেন যে তার রোগীদের কি এবং কেন হয়েছে তা জানানো উচিত। যদি তারা তা নাও বোঝে অন্তত তারা তার ডাক্তারী কাজের মধ্যে বাগড়া দেয় না।

–তোমার হয়তো মনে হতে পারে তুমি ভাল হয়ে গেছো লোরেন। কিন্তু তোমার ফুসফুস এখনও নিজেকে সুস্থ করছে। পৃথিবীর মতো থ্যালসার সাগর হলে কোন ঝামেলা হতো না। কিন্তু এটা অত লবনাক্ত নয়, খাওয়া যায়। তুমি প্রায় লিটার খানেক খেয়েছো। যেহেতু তোমরা শরীরের ফ্লুয়িড সাগরের চেয়ে বেশী লবনাক্ত তাই শরীরের আইসোটনক ব্যালান্স একদম উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। অসমোটিক প্রেশারে প্রচুর কোষপর্দা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তোমাকে ঠিক করার জন্য আমাদের দ্রুত অনেকগুলো পরীক্ষায় যেতে হয়েছে। বুঝতেই পারছো ডুবে যাওয়া তো আর সাধারণ মহাকাশ-দুর্ঘটনা নয়।

–আমি লক্ষ্মী হয়ে থাকব এবং তুমি যা করেছো তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি কখন অতিথি প্রত্যাশা করতে পারি?

–এই মুহূর্তেই একজন ওয়েটিং রুমে আছে। তুমি পনেরো মিনিট পাবে। এরপর নার্স তাকে বের করে দেবে।

–আমাকে নিয়ে ভেবোনা, লে. বিল হরটন বলল। আমি চোখ বুজে থাকব।

৩৩. বন্ধন

মিরিসার খারাপ লাগছিল। অবশ্যই সেটা বড়ির দোষ। তবে এটা স্বস্তিকর যে এ **ব্যাপারটা** আর মাত্র একবার তার হবে যখন (এবং যদি!) সে দ্বিতীয়বার মা হবে। এটা অচিন্ত্যনীয় যে, আসলে সব প্রজন্মের মহিলারাই আগে তাদের জীবদ্দশার অর্ধেকটাই এই অস্বস্তিকর নিয়মিত দিনগুলো নিয়ে কাটাত। চান্দ্রমাসের সঙ্গে এই চক্রের মিল কি কেবল কাকতালীয়? সে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে। চিন্তা কর, দুটো উপগ্রহের থ্যালসা গ্রহে যদি এটা ঘটত। সমুদ্রের জোয়ারের মতো পাঁচ দিন অথবা সাত দিনের ব্যবধানে বিনা নোটিশের সে অবস্থার হাস্যকর দিক চিন্তা করে তার প্রায় হাসি চলে এল।

তার সিদ্ধান্ত নিতে প্রায় সপ্তাহ খানেক লাগল। সে কাউকেই বলেনি। লোরেনকে না, ব্র্যান্টতো বাদই –সে এখন ক্যালিপসোকে উত্তর দ্বীপে মেরামতে ব্যস্ত। ব্র্যান্ট যদি কোন প্রতিরোধ ছাড়াই এভাবে চলে না গিয়ে তার পাশে থাকতো তাহলে কি সে আরও কিছু করত? না, সেটা হতো অন্যায়–আদিম এমনকি মানবেতর প্রতিক্রিয়া। যদিও এধরনের প্রবৃত্তি সহজে মরে না। লোরেন ক্ষমাপ্রার্থনার সুরেই বলেছে যে, সে স্বপ্নে মাঝে মাঝে ব্র্যান্টের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

সে ব্র্যান্টকে দোষ দিতে পারে না। বরং তার জন্য গর্বই বোধ করা উচিত। সে উত্তর দ্বীপে গিয়েছে তার ভীরুতার জন্য নয় বরং বিবেচনাবোধের জন্য। যাতে তারা দু'জনেই নিজেদের ভবিষ্যত ঠিক করতে পারে।

তার সিদ্ধান্ত ঝোঁকের মাথায় হয়নি। তার সচেতনতার মাঝেই সপ্তাহ ধরে এর জন্ম হয়েছে। লোরেন চলে যাবে সে জানে। নক্ষত্রের পথে উড়ে যাবার আগে তার কি করতে হবে তাও সে জানে। তার প্রতিটি অনুভূতি বলছে–সে ঠিক কাজ করছে, কিন্তু ব্র্যান্ট কি বলবে? কিভাবে সে ব্যাপারটা নেবে? আরও বহু সমস্যার মধ্যে সেটারও মুখোমুখি হতে হবে।

আমি তোমাকে ভালোবাসি ব্র্যান্ট, সে ফিসফিসিয়ে বলল। আমি চাই তুমি ফিরে এসো। আমার দ্বিতীয় সন্তানটাই হবে তোমার। তবে প্রথম সন্তান নয়।

৩৪. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

ইয়েন ফ্লেচার ভাবছিল, কি অদ্ভুত যে আমার নামটা সবচেয়ে বিখ্যাত বিদ্রোহীর নামে রাখা। আমি কি হারতে পারি? দেখা যাক পিটকেইন দ্বীপে দুহাজার বছর আগে তারা নেমেছিল.... প্রয় একশ পুরুষ আগে, এটাকে সহজভাবে... ফ্লেচার তার মানসাঙ্ক কষার ব্যাপারে একটা সরল গর্ব অনুভব করে, যা বহুলোককেই অবাক এবং প্রভাবিত করে, বিশেষত শত বছর ধরে মানুষ যেখানে দুই আর দুই যোগ করতেও বোতাম টেপে। অংকের কিছু সূত্র আর লগারিদমের কিছু মান মনে রেখে করলে, মানসাঙ্ক কষতে যারা জানে না, তাদের কাছে ব্যাপারটা আরও রহস্যপূর্ণ হয়ে যায়। অবশ্যই সে সেই উদাহরণগুলোই করে যেগুলো সে আগেও করেছে, এবং খুব কমই কারও আগ্রহ থাকে তার উত্তর মিলিয়ে দেখার।

একশ পুরুষ আগে মানে একশ দুই পূর্বপুরুষ। তিন শূন্য এক শূন্যর লগ দুই করলে মানে তিরিশ দশমিক এক... ওরে ব্বাস! মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন লোক? কিছু একটা ভুল হয়েছে। এতো মানুষ পৃথিবীর জন্মের পর থেকে জন্মালেও হতো না। অবশ্য এখানে ধরা হয়েছে যে মানবজাতি শুধু বেড়েছে–কোনভাবে আত্মীয় সম্মন্ধ হয়নি। যাকগে একশ পুরুষ পর এমনিতেই সবাই সবার আত্মীয় হয়ে যায়। যদিও আমি প্রমাণ করতে পারব না যে ফ্লেচার ক্রিশ্চান বহু যুগ আগে আমারই পূর্বপুরুষ ছিলেন।

স্ক্রীন থেকে পুরোনো সব রেকর্ড মুছে ফেলে সে ভাবল, পুরো ব্যাপারটাই আকর্ষণীয়। তবে আমি কোন বিদ্রোহী নই। আমি একজন আবেদনকারী এবং এটা সম্পূর্ণ যৌক্তিক অনুরোধ। কার্ল, রঞ্জিত, বব সবাই সায় দিয়েছে, ওয়েন্ডার দ্বিধান্বিত, কিন্তু আমাদের সে ছেড়ে যাবে না। আমি কিভাবে অন্য ঘুমন্ত স্যাব্রাদের জানাই যে তারা যখন ঘুমিয়ে আছে তখন কি অপূর্ব এক জগত আমরা পেয়েছি।

এরমধ্যে অবশ্য আমাকে ক্যাপ্টেনকে উত্তর দিতে হবে।

ক্যাপ্টেন বে'র খুব অস্বস্তি লাগছিল যে তিনি মহাকাশযানের কাজকর্ম কিভাবে দেখবেন যখন তিনি জানেনই না কে বা কারা তার অফিসারদের অথবা ক্রুদের মধ্যে তাকে উদ্দেশ্য করে নামহীনভাবে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছে। তাদের পরিচয় বের করার কোন ব্যবস্থাই নেই। এটাই তাদের উদ্দেশ্য। সামাজিক ন্যায়বিচার রাখতে বহু আগের মৃত মেধাবীরাই এই ব্যবস্থা রেখেছিল ম্যাগেলান তৈরীর সময়। প্রধান যোগাযোগ প্রকৌশলীর কাছে তিনি পরীক্ষামূলক ভাবে একটা ট্রৈার বসাবার কথা তুলেছিলেন। কিন্তু তাতে সে এতোটাই ব্যথিত হয়েছে যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সে সিদ্ধান্ত বাতিল করেছেন। তাই তিনি এখন প্রতিনিয়ত মুখগুলোকে পর্যবেক্ষণ করছেন, ভাবভঙ্গী দেখছেন। বুঝতে চেষ্টা করছেন কণ্ঠস্বরের ওঠানামা এবং চেষ্টা করছেন যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখানোর। হয়ত তিনি অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন এবং তেমন কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটেনি। কিন্তু তার ভয় হচ্ছে একটা বীজ বপন হয়ে গেছে, যেটা থ্যালসার কক্ষপথে থাকার সময় দিনে দিনে বাড়তেই থাকবে।

তার প্রথম উত্তর ম্যালিনা আর ক্যালডরের সঙ্গে আলোচনার পর ঠিক করা হয়েছে তা যথেষ্ঠই বিনয়ী।

হতেঃ ক্যাপ্টেন
প্রতিঃ অজানা

তোমার তারিখহীন আবেদনের ব্যাপারে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আলোচনায় বসতে আমার কোন আপত্তি নেই। সেটা নেটওয়ার্ক বা কাউন্সিল যে কোন ভাবেই হতে পারে।

যদিও এতে তার প্রচন্ড আপত্তি আছে। মিলিয়ন খানেক মানুষকে একশ পঁচিশ আলোকবর্ষ দূরত্ব পার করে নিয়ে যাবার ট্রেনিং-এ তার সমস্ত সাবালক জীবনের অর্ধেকটা কেটে গেছে। এটাই তার জীবনের লক্ষ্য। পবিত্র বলে কিছু যদি তার জীবনে থেকে থাকে, তাহলে এটাই তা। মহাকাশযানের কোন অচিন্তনীয় ক্ষতি অথবা সাগান ২-এর সূর্য নোভায় পরিণত হতে যাচ্ছে এরকম কেন ঘটনা ছাড়া তাকে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা যাবে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে তাকে একটা কাজের পন্থাও বের করতে হবে। ক্রুরা কিছুটা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। মাঝে বরফ কলের সামান্য ক্ষতি সারতে প্রায় দ্বিগুণ সময় লেগেছিল এবং এটাই স্বাভাবিক। সমগ্র মহাকাশযানের মনোবল নীচে নেমে যাচ্ছে। এখনই চাবুক মেরে সেটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

–জন-তিরিশ হাজার কিলোমিটার নীচে তার সেক্রেটারীকে তিনি ডাকলেন– আমাকে বরফশীল্ড তৈরীর শেষ খবর জানাও। আর ক্যাপ্টেন ম্যালিনাকে জানাও যে আমি তার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই।

দিনে একবারের বেশী বরফ তোলা যাবে কিনা তিনি জানেন না। তবে তার চেষ্টা তিনি করবেন।

৩৫. ফিরে আসা

লে. হর্টন আমুদে মানুষ হলেও, ইলেকট্রোফিউশন পদ্ধতির মাধ্যমে ভাঙ্গা হাড় সেড়ে উঠায় তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে লোরেন খুশিই হল। তারপর বিস্তারিত শুনল যে, তরুন প্রকৌশলী একদল উত্তরের খ্যাপার পাল্লায় পড়েছিল, যাদের জীবনের দ্বিতীয় প্রধান উদ্দেশ্যই হল উঁচু ঢেউয়ের মাথায় মাইক্রোজেট সার্ফজেট নিয়ে সার্ফিং করা। হার্টন অবশ্য ভুক্তভোগী হয়ে শিখেছে যে, জিনিসটা যা দেখায় আসলে তার চেয়েও ভয়ংকর।

–আমি বেশ অবাক হলাম। লোরেন সাদামাটা ভাবেই বলল। আমি জানতাম তুমি নব্বই ভাগ বিপরীতকামী।

–আসলে বিরানব্বই। তবে মাঝে-মধ্যে রুচি পাল্টাতে আমার ভালই লাগে। হর্টন উৎফুল্লভাবে বলল।

লেফটেনেন্ট কিছুটা মজা করছিল। কোথায় যেন সে পড়েছিল যে, শতকরা একশভাগ এতই দুষ্প্রাপ্য যে তাকে অসুস্থতাই বলা যায়। সে অবশ্য তা বিশ্বাস করে না –তবে জিনিসটা ভাবতে তার ভাল লাগে না।

এখন লোরেন যখন একমাত্র রুগী সে ল্যাসান নার্সটিকে বোঝাতে পারল যে তার সার্বক্ষণিক উপস্থিতি আসলে অপ্রয়োজনীয় বিশেষত মিরিসার দৈনিক সাক্ষাতের সময়। সার্জন কমান্ডার নিউটন, অধিকাংশ ডাক্তারের মতোই যে লজ্জাহীনরকম খোলামেলা, শুধু ঠান্ডা গলায় বললেন– আরও এক সপ্তাহ লাগবে তোমার ঠিক হতে। যদি তোমার প্রেম করতেই হয়, তাহলে সব খাটুনি যেন সে করে।

অবশ্য আরও অতিথি ছিল। দুজন ছাড়া প্রত্যেকেই প্রত্যাশিত। মেয়র ওয়ার্ডেন নার্সকে তুড়ি মেরে ঢুকে পড়তেন। সৌভাগ্যক্রমে তার আর মিরিসার আসাটা কখনোই একসঙ্গে হতো না। প্রথমবার লোরেন মটকা মেরে পড়ে রইল কিন্তু চালাকীটা ঠিক ছিল না। লোরেনকে বাধ্য হয়ে কিছু ভেজা আদর নিতে হল। দ্বিতীয়বারে একটা পরীক্ষা চলছিল যার নল ছিল তার মুখের ভেতর। অতএব কোন কথা বলতে হয়নি। মেয়র যাবার তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যেই অবশ্য পরীক্ষাটা শেষ হয়ে গেল।

ব্র্যান্ট ফ্যাকনরের সৌজন্য সাক্ষাৎ তাদের দুজনের জন্যই পীড়াদায়ক। তারা নম্রভাবে কাঁকড়া, বরফকল, উত্তর দ্বীপের রাজনীতি সবকিছু নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু শুধুমাত্র মিরিসার প্রসংগ ছাড়া। লোরেন বোঝে যে, ব্র্যান্ট চিন্তিত এমনকি লজ্জিত। কিছুটা দুঃখিতও। যাবার আগে সে মুখ তুলে বলে– লোরেন তুমি জান, ঐ ঢেউ নিয়ে আমার কিছু করার ছিল না। আমরা যদি আগের পথে চলতাম, আমরা রীফে আছড়ে পড়তাম। ক্যালিপসো গভীর সমুদ্রে পড়লে কোন সমস্যাই আর হতো না।

–আমি জানি এরচে ভাল আর কেউ করতে পারত না। লোরেন সত্যিই বলে।

–তুমি বুঝেছো দেখে ভাল লাগছে।

ব্র্যান্ট অবশ্যই ভারমুক্ত হয়েছে। ব্র্যান্টের প্রতি তার কিছুটা করুণাও হয়। সম্ভবত তার নৌচালনার দক্ষতা নিয়ে কথা উঠেছে। নিজের কাজের প্রতি ব্র্যান্টের মতো দায়বদ্ধ কারও জন্য তা অসহনীয়।

–তারা জাহাজটা বাঁচিয়েছে।

–হ্যাঁ। মেরামতের পর ওটা এখন একদম নতুন।

–আমার মতো।

–দুজনে হেসে দিল। লোরেনের হঠাৎ মনে হল, কুমার যদি আরেকটু কম সাহসী হত তবে কি ব্র্যান্ট খুশী হত।

৩৬. কিলমানজারো

কিলমানজারোর স্বপ্ন কে দ্যাখে?

এটা একটা অদ্ভুত শব্দ, নাম সে বোঝে, কিন্তু কার?

থ্যালসার গোধূলীর ধূসর আলোয় মোজেস ক্যালডর শুয়ে তারনার জেগে ওঠা শব্দগুলোর প্রতি মনোযোগ দিচ্ছিল। খুব বেশী কেউ নেই এসময়। একটা বালির-স্লেজের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

সম্ভবত কোন মৎস্য শিকারীর অপেক্ষায়।

কিলমানজারো।

ক্যালডর দাম্ভিক নয় তবে অন্য কেউ তার মতো বিচিত্র বিষয়ের ওপর প্রাচীন বই পড়েছে কিনা তা নিয়ে তার সন্দেহ আছে। তার অবশ্য কয়েক টেরাবাইট তথ্য মাথায় ঢোকানো আছে, সেগুলো ঠিক জ্ঞান নয়, কেবল উপযুক্ত সংকেত দিলেই তা মনে আসবে।

এটা একটু দ্রুতই করা হয়ে যাচ্ছে, আর ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিনা তা নিয়েও তার সন্দেহ আছে। যদিও সে স্বপ্নকে অবজ্ঞা করে না। দু'হাজার বছর আগে সিগমুন্ড ফ্রয়েড এ ব্যাপারে বেশ খাঁটি কিছু কথা বলে গেছেন। আর যাই হোক, সে এমনিতেই আবার ঘুমাতে পারবে না। সে তার চোখ বন্ধ করল, 'অনুসন্ধান' কমান্ড চালু করল, এবং অপেক্ষা করতে লাগল। যদিও এটা পুরোটাই কল্পনা, পুরো ব্যাপারটাই অবচেতন মনে ঘটে–সে অসংখ্য পুরোনো ঘটনাকে মাথার ভেতরে দেখতে পায়। এখন তার শক্ত করে বন্ধ রাখা চোখের সামনে যে বিক্ষিপ্ত আকারের আলোর প্রভা ছিল সেখানে কিছু হচ্ছে। একটা কালো পর্দা অস্পষ্ট আলোর সামনে হঠাৎ যাদুর মতো চলে এল এবং সেখানে কিছু অক্ষর ফুটে উঠল।

কিলমানজারোঃ আগ্নেয়গিরি, আফ্রিকা, উচ্চতা ৫.৯ কি.মি

পৃথিবীর প্রথম মহাকাশ বন্দর।

আচ্ছা! তার মানেটা কি? সে তার মনকে এই সামান্য তথ্য নিয়ে খেলা করতে দিল। আরেক আগ্নেয়গিরি ক্র্যাকানের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে, যেটা নিশ্চয়ই বেশ কিছু চিন্তার জন্ম দিয়েছে।

প্রথম মহাকাশ বন্দর? সে এক প্রাচীন ইতিহাস। গ্রহ বসতির প্রথম পর্যায়কে এটা মনে করিয়ে দেয়, যা মানুষকে সৌরজগতে স্বাধীনভাবে ঘুরতে দিয়েছিল এবং তারা এখানেও সেই পদ্ধতি ব্যবহার করছে–অত্যন্ত শক্ত পদার্থে গড়া তার দিয়ে বরফ নিয়ে যাচ্ছে ম্যাগেলানের কক্ষপথে।

কিন্তু এটাও সুদূরের কোন আফ্রিকার পর্বতের কান্নার কারণ নয়। যোগাযোগটা খুবই দূরের।

নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে।

সরাসরি কিছুই বের করা গেল না। এর যোগাযোগ বের করার একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে ব্যাপারটাকে ছেড়ে দেয়া এবং অবচেতন মনের বিস্ময়কর কর্মপদ্ধতির ওপর বিশ্বাস রাখা।

কিলমানজারোকে ভুলে যাবার চেষ্টা করতে হবে, যতদিন না হঠাৎ করে আবার মাথায় জেগে ওঠে।

৩৭. মদিরার শাশ্বত সত্যি

মিরিসার পর কুমার হলো লোরেনের কাছে সবচেয়ে প্রত্যাশিত এবং বেশী আসা অতিথি। তার ডাক নাম যাই হোক না কেন, লোরেনের কাছে তার স্বভাবটা অনেকটা সারমেয় বা সারমেয় ছানার কাছাকাছি। তারনায় বেশ কিছু কুকুর আছে, হয়তো সাগান-২ তেও থাকবে, মানুষের সঙ্গে বহু যুগের বন্ধুত্বের দাবীতে।

লোরেন এখন শুনেছে যে তার জন্য এই ছেলেটা সমুদ্রে কি ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়েছিল। তারা শুধু বেঁচে গেছে এইজন্য যে কুমার কখনোই সমুদ্রে ডুবুরীর ছুরি ছাড়া যায় না। তারপরও তাকে সমুদ্রের তলে প্রায় তিন মিনিট থাকতে হয়েছিল। ক্যালিপসোর সবাই ধরে নিয়েছিল যে, তারা দুজনেই মারা গেছে।

তবে নতুন এই বাঁধনে বাধা পড়লেও লোরেন এখনও কুমারের সঙ্গে কোন কথা খুঁজে পায় না। আমার জীবন রক্ষার জন্য ধন্যবাদ, এ কথা সরাসরি বলা খুব মুস্কিল। আর তাদের মধ্যে বিষয়ের ব্যবধান এত বেশী! যদি সে পৃথিবী বা মহাকাশযান সম্পর্কে কিছু বলতে চেষ্টা করে তাহলে সব কিছু এত বিস্তারিত বলতে হয় যে সে হাঁপিয়ে যায় এবং খুব শিগগিরিই আবিষ্কার করে যে পুরোটাই পন্ডশ্রম। কুমার তার বোনের মতো নয়। বর্তমানটাই তার বিশ্ব–থ্যালসাই হচ্ছে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ক্যালডর একবার বলেছিল, সে বর্তমানের বাসিন্দা। অতীতের দুশ্চিন্তা বা ভবিষ্যতের ভাবনায় সে চিন্তিত নয়।

ক্লিনিকে শেষ রাতে ঘুমাবার আগে কুমার এক বিশাল বোতল নিয়ে উৎফুল্ল ভাবে ঢুকল।

–বলতো এটা কি?

–জানিনা।

–ক্র্যাকানের প্রথম মদিরা। এটা এবছর খুব ভাল হয়েছে।

–তুমি এতসব জানলে কি ভাবে?

–ওখানে আমাদের পরিবারের শত বছরের পুরানো ভাটিখানা আছে। সিংহ ব্র্যান্ড এ পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত।

কুমার দুটো গ্লাস নিয়ে ভর্তি করল। লোরেন একটা সতর্ক চুমুক দিল। একটু বেশী মিষ্টি কিন্তু খুব মসৃণ।

–কি নাম এটার?

–ক্র্যাকান স্পেশাল।

–ক্র্যাকানের ছানা একবার আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আমার কি ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে।

–তোমার কোন হ্যাং ওভার হবে না।

লোরেন আরেকটু বড় চুমুক দিল। এবং দ্রুত গ্লাস শেষ হয়ে গেল। দ্রুতই আবার তা ভরে গেল।

ল্যাসান হাসপাতালে শেষ রাত লোরেনের আনন্দেই কাটল। মেয়রকেও সে রাতে খারাপ লাগল না।

–আচ্ছা ব্র্যান্ট কোথায়? আমি তাকে সপ্তাহখানেক ধরে দেখছি না।

–সে উত্তর দ্বীপে। জাহাজ মেরামত করছে এবং সমুদ্র প্রাণীবিদদের সঙ্গে কথা বলছে। সবাই কাঁকড়া নিয়ে খুব উত্তেজিত। কিন্তু কেউই বুঝতে পারছে না কি করা উচিত।

–তুমি কি জান ব্র্যান্টের ব্যাপারে আমারও একই অবস্থা।

কুমার হেসে দিল।

–ভেবোনা। উত্তর দ্বীপে সে এক মেয়ের সঙ্গে থাকছে।

–আচ্ছা। মিরিসা জানে?

–অবশ্যই।

–সে দুঃখ পেয়েছে?

–কেন পাবে? ব্র্যান্ট তাকে ভালবাসে এবং সে সবসময়ই ফিরে আসবে।

লোরেন তথ্যটা হজম করল। তার মনে হল সে এক জটিল সমীকরণের একটা বিশাল চলরাশি। মিরিসার কি আরও প্রেমিক আছে? তার কি জানার ইচ্ছা আছে? তার কি জিজ্ঞেস করা উচিৎ?

কুমার গ্লাস ভরতে ভরতে বলল।

–যাহোক। আসল ব্যাপারটা হলো যে তাদের জেনেটিক ম্যাপ গৃহীত হয়েছে। এবং তারা একটা সন্তানের জন্য দরখাস্তও করেছে। সে যখন জন্মাবে তখন ব্যাপারটা অন্যরকম হবে। তখন তারা শুধুই পরস্পরের সঙ্গে থাকবে। পৃথিবীতেও কি একই ব্যবস্থা ছিল?

–কখনো কখনো, লোরেন উত্তর দিল। তাহলে কুমার জানে না। জিনিসটা তবে দুজনের মধ্যেই গোপন থাকুক। অন্তত আমি আমার সন্তানকে দেখতে পাব লোরেন ভাবল। যদিও মাত্র কয়েক মাস তারপর...

অবাক হয়ে সে দেখল তার চোখ বেয়ে অশ্রু নামছে। শেষ কবে সে কেঁদেছে? দুশ বছর আগে। যখন পৃথিবী পুড়ছিল...

–কি হয়েছে? কুমার জিজ্ঞেস করল। তুমি কি তোমার স্ত্রীর কথা ভাবছ? তার ব্যাকুলতা এতটাই খাঁটি যে লোরেন কিছু মনে করলনা। এ প্রসংগটা নীরব সমঝোতার মাধ্যমে কখনোই তোলা হয় না, কারণ এটা এখানে অপ্রাসংগিক। দুশ বছর আগের পৃথিবী আর তিনশ বছর পরের সাগান-২ থ্যালসা থেকে এতই দূরে যে তা অনুভূতিকে সেভাবে নাড়া দিতে পারেনা।

–না কুমার। আমি আমার স্ত্রীর কথা ভাবছি না...

–তুমি কি তাকে মিরিসার কথা বলবে?

–কি জানি। হয়তো... হয়তো না। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। আমরা কি পুরো বোতলটা শেষ করতে পারি? কুমার? কুমার। রাতে নার্স এলে তাদের দেখে অবাক হয়ে গেল। চাদর দিয়ে তাদের ঢেকে দিল।

লোরেন আগে জাগল। প্রথমে ধাক্কা খেলেও সে হাসতে শুরু করল।

–হাসির কি আছে? বিছানা ছেড়ে নামতে নামতে কুমার জিজ্ঞেস করল।

–তুমি সত্যিই জানতে চাও? আমি ভাবছি মিরিসা হিংসা করবে কিনা?

–আমি কিছুটা মাতাল হতে পারি, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে কিছু হয়নি।

–আমিও জানি।

কিন্তু সে এখন জানে যে সে কুমারকে ভালবাসে। এজন্য নয় যে সে মিরিসার ভাই বা তার জীবন রক্ষাকারী। বরং সে কুমার শুধুমাত্র সে জন্যই। যৌনতার কোন সম্পর্ক এখানে নেই। এ ধারণাটা তাদের আনন্দিত করে তুলল। তারা ভালই আছে। যদিও তারনার জীবন ইতিমধ্যেই বেশ জটিল হয়ে গেছে।

–তুমি ঠিকই বলেছ, লোরেন বলল। ক্র্যাকান স্পেশালের কোন হ্যাং ওভার নেই। সত্যি বলতে আমার খুব ভাল লাগছে। তুমি কিছু বোতল বরং বলা যায় কয়েকশ লিটার মহাকাশযানে দিতে পার?

৩৮. বিতর্ক

যদিও এটা একটা সহজ প্রশ্ন কিন্তু উত্তরটা বেশ জটিল –ম্যাগেলানের শৃঙ্খলার কি হবে যদি এর প্রাথমিক লক্ষ্যটাকেই ভোটাভোটিতে নেয়া হয়?

অবশ্য, ভোটের ফলাফল অলঙ্ঘনীয় নয় এবং তিনি চাইলে তা অগ্রাহ্য করতে পারেন। সবাই যদি থেকে যেতে চায় (তিনি কল্পনাও করতে পারেন না–) তাহলে

তাকে তাই করতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটা সবাইকে মানসিকভাবে ভেঙ্গে ফেলবে। ক্রুরা দুইভাগে ভাগ হয়ে যাবে, এবং সে ধরনের কথা তিনি চিন্তাও করতে পারেন না।

আবার এক নেতাকে দৃঢ় হতে হবে, কিন্তু মাথা মোটা নয়। প্রস্তাবটায় ভালো চিন্তা আছে, এবং তা যথেষ্ঠ আকর্ষণীয়। আসলেই তিনি রাজকীয় অভ্যর্থনা নীচে পাচ্ছেন এবং সেই মহিলা ডেকাথেলন চ্যাম্পিয়নের সাথে আবার সাক্ষাতের সুযোগ তিনি হারাতে চাইবেন না। এটা একটা চমৎকার গ্রহ এবং মহাদেশ সৃষ্টির পদ্ধতিকে তারা আরেকটু গতি দিলেই আরও এক মিলিয়ন লোকের থাকার ব্যবস্থা করা যায়। সাগান-২-কে কলোনী করার চাইতে এটা অনেক সহজ, আর সাগান ২-এ তারা নাও পৌঁছুতে পারেন। যদিও মহাকাশযানের ক্ষমতা ৯৮ ভাগ বর্তমান, তবুও বিপদের কথা কেউই বলতে পারেনা। তার খুব বিশ্বস্ত ক'জন অফিসারই ৪৮ আলোকবর্ষে তাদের বরফ বর্মের একাংশ হারিয়ে যাবার কথা জানে। যে গ্রহাণুর কারণে এটা হয়েছিল, তা যদি আরেকটু কাছে আসত...

কেউ কেউ অবশ্য বলে জিনিসটা আসলে পৃথিবীর কোন প্রাচীন ছোট মহাকাশ যান।

অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ভাবে অবশ্য এটা সম্ভব নয়, আর এমন মজার হাইপোথিসিস প্রমাণেরও কোন উপায় নেই। এর ওপর আবার সেই আবেদনকারীরা নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে "নব্য থ্যালসান" হিসেবে। ক্যাপ্টেন বে অবাক হচ্ছেন এই ভেবে, এর মানে কি তারা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হবার চেষ্টা চালাচ্ছে? তাই যদি হয়, এদের যত শিগগির সবার সামনে আনা যায় ততই মঙ্গল।

হ্যাঁ, মহাকাশযানে কাউন্সিল ডাকতে হবে এখুনি।

মোজেস ক্যালডর বিনয়ের সঙ্গেই দ্রুত প্রস্তাবটা প্রত্যাখান করলেন।

–না ক্যাপ্টেন–এই বিতর্কে আমি জড়াতে পারি না। পক্ষে অথবা বিপক্ষে–কোন পক্ষেই। যদি আমি তা করি এরা আমার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলবে। তবে সভাপতি বা সমন্বয়কারী হিসেবে আমি থাকতে পারি– যদি তুমি চাও।

–ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন দ্রুতই উত্তর দিলেন। আসলে এই পর্যন্তই তিনি আশা করছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা তুলবে কে? নব্য থ্যালসানরা নিজেদের দেখাবে সেটা নিশ্চয়ই আশা করা যায় না।

–আমার মনে হয় আমার কোন আলাপ বা বিতর্কে না গিয়ে সরাসরি ভোটাভোটিতে যেতে পারি, ডেপুটি ক্যাপ্টেন ম্যালিনা প্রস্তাব করলেন।

ব্যক্তিগতভাবে ক্যাপ্টেন এটা চান। কিন্তু এখানে একটা সুশিক্ষিত গণতান্ত্রিক সমাজ থেকে আসা মানুষদের সমন্বয়ে এই মহাকাশযানের সমগ্র ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত। নব্য থ্যালসানরা কাউন্সিল চাচ্ছে তাদের বক্তব্য সবার কাছে তুলে ধরার জন্য। তিনি সে সুযোগ তাদের না দিলে, দু'শ বছর আগে যে বিশ্বাসে পৃথিবীবাসী তাকে নিয়োগপত্র দিয়েছিল, তার অবমাননা হবে। যেটা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কাউন্সিল বসানো খুব সহজ নয়। ব্যতিক্রম ছাড়া সবারই ভোটাভোটিতে অংশ নেয়ার অধিকার আছে। কাজের সময় পুনঃনির্ধারণ করতে হবে, ঘুমানোর সময় নিয়ে ঝামেলা হবে। তার চাইতেও বড় ঝামেলা হবে যেহেতু অর্ধেকেরও বেশী ক্রু থ্যালসায় থাকছে–নিরাপত্তার ব্যাপারে। যেটা আগে কখনোই হিসাব করতে হয়নি। ফলাফল যাই আসুক না কেন, এই বিতর্ক যদি ল্যাসানরা শুনতে পায়...

আর তাই লোরেন লোরেনসন কাউন্সিল শুরু হলে তার তারনায় অফিসের দরজা এই প্রথমবারের মতো বন্ধ করে একা বসেছিল। আবার সে একটা পুরো দৃষ্টিসীমার মতো বড় গগল্‌স পরে ছিল। তবে সমুদ্রের তলদেশ নয় বরং এবার সে আছে ম্যাগেলানের পরিচিত সভাকক্ষে। সে তার কলিগদের দেখছিল, আর যখনই তাকাচ্ছিল তার চোখের সামনে তাদের মন্তব্য এবং সিদ্ধান্ত ফুটে উঠছিল। এ মুহূর্তে অবশ্য একটা কথাই কেবল ফুটে আছে।

উপজীব্যঃ মহাকাশযান ম্যাগেলান কি থ্যালসায় তার যাত্রা শেষ করবে, যদি যাত্রার সব উদ্দেশ্যই এখানে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়।

আচ্ছা–মোজেস ওখানে, সবাইকে স্ক্যান করতে করতে লোরেন ভাবল। এজন্যই তাকে কিছুদিন পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে ক্লান্ত লাগছে–ক্যাপ্টেনকেও। ব্যাপারটা যা ভেবেছি তার চাইতে মনে হয় ঘোলাটে...

ক্যালডর গলা খাঁকড়িয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

–ক্যাপ্টেন, অফিসাররা এবং ক্রুরা– যদিও এটা আমাদের প্রথম কাউন্সিল কিন্তু তোমরা সবাই নিয়মকানুন জান। যদি তোমরা কিছু বলতে চাও, হাত তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যদি কেউ লিখিত বক্তব্য দিতে চাও, কিপ্যাড ব্যবহার করবে। তোমাদের পরিচয় গোপন করবার জন্য ঠিকানা মুছে যাবে। আর দুক্ষেত্রেই যতটা সম্ভব সংক্ষেপ করবে। যদি কারো কোন কথা না থাকে, আমি আইটেম নম্বর ০০১ কে তুলে ধরছি। নব্য থ্যালসানরা ০০১ এ কিছু আবেদন করেছিল। এটাই ক্যাপ্টেন বের কাছে দুসপ্তাহ আগে এসেছিল।

সম্ভবতঃ সবচে আলোচিত বক্তব্য হল যে, এখানে থাকাটা তাদের কর্তব্য। ল্যাসানদের তাদের প্রয়োজন–প্রাযুক্তিক, সাংস্কৃতিক এবং জেনেটিক্যালি। লোরেন অবাক হল, যদিও যুক্তিগুলো সে স্বীকার করছে, তবুও যে কোনভাবেই আগে ল্যাসানদের মতামত নিতে হবে। তারা নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদী নয়!

সবাইকে আবেদনটা পড়ার সময় দেয়া হলে ক্যালডর কেশে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। যেহেতু কেউ এর পক্ষে কিছু বলেনি অবশ্য পরেও বলা যাবে। আমি লেঃ এলগারকে বিপক্ষে বলার সুযোগ দিচ্ছি।

রেমন্ড এলগার চিন্তাশীল তরুণ, শক্তি ও যোগাযোগ প্রকৌশলী। লোরেন তাকে সামান্যই চেনে। তার সঙ্গীতে প্রতিভা আছে এবং বলা হয় যে এই যাত্রা সম্বন্ধে সে একটি মহাকাব্য লিখছে। যদিও একটা লাইনও যদি কেউ দেখতে চায়, তবে সে

উত্তর দেয় সাগান-২ এ যাবার পরও এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। লেঃ এলগার যে তার ভূমিকার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে সেটা স্বাভাবিক। তার কাব্যিক স্বভাব তাকে এটাই করতে বলবে, আর হয়তো সে সত্যি সত্যি মহাকাব্যটা লিখছে।

–ক্যাপ্টেন, সহকর্মীরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার মনে হয় আমাদের মনের ভেতর সবাই স্বীকার করি যে, থ্যালসায় থেকে যাবার পরিকল্পনাটায় প্রচুর আকর্ষণ রয়েছে। কিন্তু একবার ভাবুন যে, আমরা মাত্র ১৬১ জন এখানে উপস্থিত। আমাদের কি কোন অধিকার আছে এমন একটা সিদ্ধান্ত নেবার যার প্রভাব ঘুমন্ত মিলিয়ন মানুষের উপর পড়বে। আর ল্যাসানদের ব্যাপারে বা কি হবে? বলা হচ্ছে আমরা তাদের সাহায্য করব। সত্যিই কি তাই? তাদের নিজস্ব একটা জীবনধারা আছে, এবং সেটা চমৎকারভাবেই চলছে। আর আমাদের ইতিহাস, ট্রেনিং এর কথা চিন্তা করি–যে উদ্দেশ্যে আমরা বহু বছর আগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আপনারা কি মনে করেন, আমাদের মিলিয়ন মানুষ ল্যাসানদের অংশ হয়ে যাবে তাদের ধ্বংস না করেই?

আর তাছাড়া আছে কর্তব্যের প্রশ্ন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের এই যাত্রার জন্য উৎসর্গ করেছে শুধু মানব জাতিকে আরো ভালোভাবে বাঁচার সুযোগ দেয়ার জন্য। যত বেশী নক্ষত্রজগতে আমরা পৌঁছুবো তত মানব জাতির টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়বে, ধ্বংসের বিপরীতে। আমরা জানি থ্যালসার আগ্নেয়গিরি কি করেছে। কে জানে ভবিষ্যতে এটা আরো কি করবে!

মিছরির ছুরির মতো কেউ কেউ টেকটোনিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে নতুন ভূমি তৈরী করে বাড়তি জনসংখ্যার সংস্থানের কথা বলছে। আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, হাজার বছর ধরে গবেষণার পরও এটি ঠিক বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। ৩১৭৫ সালের নাজকা প্লেটের ভূমিধ্বসের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। থ্যালসার মাঝে খুঁচিয়ে নতুন ভূমি ওঠানোর মতো দুর্বুদ্ধি আর দুটো হতে পারে না।

বেশী কিছু বলার নেই। এ ব্যাপারে একটিই সিদ্ধান্ত হতে পারে। ল্যাসানদের তাদের নিজেদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমাদের যেতে হবে সাগান-২ এ।

ধীরে ধীরে উঠে আসা তুমুল করতালিতে লোরেন অবাক হলো না। কেউ হাততালি না দিলেও অবাক হতে হবে। বিচারক হিসেবে বলা যায় দর্শকরা দুভাগে সমান ভাগ হয়ে গেছে। অবশ্য অনেকেই ব্যাপারটা সমর্থন না করলেও, উপস্থাপনার সৌন্দর্যের জন্য করতালি দিয়েছে।

–ধন্যবাদ লেঃ এলগার, সভাপতি ক্যালডর বললেন। তোমার সাহসিকতার প্রশংসা করি। এখন এর বিপক্ষে কেউ কি বলবেন। একটা অস্বস্তি সবাইকে থমকে দিল, তারপর নেমে এল বিশাল নিস্তব্ধতা। প্রায় এক মিনিট কিছুই হল না। তারপর পর্দায় শব্দগুলো ফুটে ওঠা আরম্ভ করল।

০০২. ক্যাপ্টেন কি মিশনের সাফল্যের সম্ভাবনার বর্তমান হিসেবটা দেবেন?

০০৩. যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের একাংশের কাছ থেকে নমুনা মতামতের জরিপ নেয়া হোক।

০০৪. ল্যাসানরা কি ভাবে–সেটা জিজ্ঞেস করা হোক। এটা তো তাদের জগৎ।

কম্পিউটার পূর্ণ গোপনীয়তা এবং নিরপেক্ষতার মাঝে কাউন্সিল মেম্বারদের মধ্য থেকে মন্তব্য নিচ্ছে। দুই হাজার বছরের মধ্যে এর চাইতে ভালো করে কেউ মতামত নিতে ও তৈরী করার পদ্ধতি দেখাতে পারেনি। সবাই তাদের এক হাতের মধ্যে এটে যাওয়া কি প্যাডের সাতটা বোতাম দিয়ে মন্তব্য লিখছে। কিছু চিন্তা না করে সাত স্পর্শে লিখে যাওয়াটা সম্ভবত প্রথম অর্জিত দক্ষতা।

লোরেন দর্শকদের দিকে তাকিয়ে অবাক হল যে, সবার দুহাত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কেউ সেই পরিচিত দূরের দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেই যাতে বোঝা যায় যে, একটা লুকানো কি প্যাড ব্যাবহার করা হচ্ছে। কিন্তু তারপরও অনেকেই কথা বলছে।

০১৫. একটা মধ্যপন্থা কেমন হয়? আমাদের কেউ কেউ হয়তো থাকতে চাইবে। বাকীরা যাত্রা করবে।

ক্যালডর আবার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

–এটা যদিও আলোচ্য সূচীর বাইরের প্রস্তাব, তবে এটাও বিবেচনায় থাকবে।

–০০২ এর জবাবে বলছি, সভাপতির কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার ব্যাপারটা ভুলে গিয়েই ক্যাপ্টেন বে বলে উঠলেন, এখানে ৯৮ ভাগ সম্ভাবনা আছে। আমি অবাক হব না যদি– এই সম্ভাবনা উত্তর বা দক্ষিণ দ্বীপের পানির উপর ভেসে যাবার চাইতে বেশী হয়।

০২১. ক্র্যাকান ছাড়া আর কি আছে যেখানে তারা অসহায়। ল্যাসানদের জীবনে কোন চ্যালেঞ্জ নেই। সম্ভবত আমাদের পক্ষ দিয়ে তেমন কিছু দেয়া উচিৎ। কি. রা.

এটা নিশ্চয়ই দেখা যাক–হ্যাঁ কিংসলে রামসেন। তার নিজেকে লুকিয়ে রাখার কোন ইচ্ছাই নেই। দেখা যাচ্ছে সে অবশ্য এমন একটা কথা বলেছে যা সবার মনেই উঁকি দিয়েছে।

০২২. আমরা তো ক্র্যাকানের ডিপ স্পেস অ্যান্টেনাটা আবার তৈরী করে তাদের আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য পরামর্শ দিয়েছি। র.ম.ম.

০২৩. বড়জোর দশ বছরের কাজ। কি.রা.

–ভদ্রমহোদয়গণ– ক্যালডর একটু অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠলেন– আমরা বিষয়বস্তুর বাইরে চলে যাচ্ছি।

আমার কি কিছু বলা উচিৎ? লোরেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করল। না এই বিতর্কের বাইরে আমি থাকব। আমি দুই পক্ষেই অনেক কিছু দেখছি। খুব শিগগিরি আমাকে কর্তব্য এবং আনন্দ এই দুয়ের মাঝে কোন একটা বেছে নিতে হবে। তবে সেটা এক্ষুনি নয়, এক্ষুণি নয়...

–আমি বেশ অবাক হচ্ছি, দুমিনিট যাবত স্ক্রীনে কোন লেখা না আসায় ক্যালডর বলে উঠলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আর কারও কিছুই বলার নেই।

তিনি আশায় আশায় মিনিট খানেক আরো বসে রইলেন।

–বেশ। সম্ভবত আপনারা ব্যাপারটা নিয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করতে চান। আমরা এখনই ভোটাভোটিতে যাব না। আগামী আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত আপনারা এভাবে আপনাদের মন্তব্য জানাতে পারবেন। ধন্যবাদ।

তিনি ক্যাপ্টেন বের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। তিনি দ্রুত স্বস্তির ভাব নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

–ধন্যবাদ ড. ক্যালডর। মহাকাশযানের কাউন্সিলের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। এরপর বে দুশ্চিন্তার সঙ্গে ক্যালডরের দিকে তাকালেন। তিনি ডিসপ্লে স্ক্রীনের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিলেন যেন এই প্রথম তিনি সেটা দেখছেন।

–ড. ঠিক আছ তো?

–দুঃখিত ক্যাপ্টেন। ভালোই আছি। একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হঠাৎ মনে পড়ল কিনা।

হ্যাঁ, অবশ্যই হাজারবার সে তার অবচেতন মনে খুঁজে বেরিয়েছে একটা উত্তর যা ০২১ দিয়ে দিয়েছে–ল্যাসানদের কোন সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ নেই। সেজন্যই সে কিলমানজারোর স্বপ্ন দেখেছিল।

৩৯. বরফাবৃত

আমি দুঃখিত ইভলিন–অনেকদিন পর তোমার সাথে কথা বলছি। এটা কি এজন্য যে ভবিষ্যৎ আমার শক্তি এবং মনোযোগের অধিকাংশই বেশী বেশী করে গ্রাস করছে, আর সে সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্মৃতি আমার মনে ধূসর হয়ে আসছে?

তাই হওয়া উচিত, এবং যুক্তিযুক্তভাবে এটাকেই আমার স্বাগত জানানো উচিত। অতীত খুব বেশী আঁকড়ে থাকাটাও একটা অসুস্থতা–যেটা তুমি আমাকে প্রায়ই বলতে। কিন্তু আমি মনে প্রাণে এই তিক্ত সত্যকে গ্রহণ করতে চাই না।

গত কয়েক সপ্তাহে মহাকাশযানে অনেক কিছু ঘটেছে। মহাকাশযানে যা ঘটছে তার নাম দিয়েছি–অদৃশ্য যুদ্ধ। প্রথমে একটা কৌতুক হিসাবেই বলেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা এখন গুরুতর হয়ে গেছে। আশা করি খুব বেশি গুরুতর নয়।

কিছু ক্রু থ্যালসায় থেকে যেতে চাইছে–তাতে অবশ্য দোষ দেয়া যায় না। তারা চাইছে সাগান-২ এর চিন্তা বাদ দিয়ে পুরো অভিযানের এখানেই সমাপ্তি ঘটাতে। অবশ্য এদের সংখ্যাটা আমরা জানি না। কারণ এদের পরিচয় এখনো গোপন।

কাউন্সিলের আটচল্লিশ ঘন্টা পরে আমরা ভোট নিয়েছিলাম। যদিও ভোটদানটা গোপন। কিন্তু আমি জানি না কিভাবে ফলাফলটাকে বিশ্বাস করব–১৫১ জন যাত্রার পক্ষে, মাত্র ৬ জন যাত্রা শেষ করার পক্ষে এবং ৪ জন সিদ্ধান্তহীন।

ক্যাপ্টেন বে খুশী। তার ধারণা অবস্থা তার আয়ত্তে। তবে কিছু সতর্কতা নিতে হবে। সে বুঝতে পেরেছে যত বেশী দিন আমরা এখানে থাকব, থেকে যাবার সম্ভাবনা ততই বাড়বে। ওই কয়েকজনের ব্যাপারে তার মাথাব্যথা নেই– "তারা যদি চলে যেতে চায় যাক। আমার তাদের ধরে রাখার কোন ইচ্ছাই নেই।" এভাবেই সে জিনিসটাকে দেখছে। কিন্তু অন্য ক্রুদের ভেতরে ব্যাপারটা সংক্রামিত হতে পারে এই নিয়ে সে চিন্তিত।

তাই বরফের বর্ম বানানোটা তরান্বিত করা হয়েছে। এখন ব্যাপারটা স্বয়ংক্রিয়, সুন্দরভাবে চলছে। আমরা ঠিক করেছি দিনে একবারের বদলে দু'বার বরফপাত ওঠাব। যদি ব্যাপারটা করা যায় আমরা চার মাসের মধ্যে রওয়ানা দিতে পারব। এটা এখনও ঘোষণা হয়নি। তবে মনে হয় না কেউ আপত্তি করবে, নব্য ল্যাসান অথবা অন্য কেউই।

আরেকটা ব্যাপার হলো, যেটার হয়ত কোন গুরুত্বই নেই কিন্তু আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। তোমার কি মনে আছে ইভলিন– আমাদের প্রথম দিকের পরিচয়ের সময়ে কিভাবে আমরা পরস্পরকে গল্প পড়ে শোনাতাম? হাজার বছর আগে যখন কোন ভিডিও বা সেনসরি সিস্টেম ছিল না, তখন মানুষ কিভাবে বাস করত তা জানার জন্য এটা বেশ ভালো উপায়।

সে সময় তুমি একবার আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলে –যদিও সজ্ঞানে তার কোন স্মৃতিই আমি মনে রাখিনি–আফ্রিকার এক বিশাল পর্বত সম্বন্ধে, নামটা অদ্ভুত, কিলমানজারো। আমি মহাকাশযানের আর্কাইভ খুঁজে দেখলাম কেন এই নামটা আমাকে খোঁচাচ্ছে।

এই পর্বতের বহু উঁচুতে, বরফ লাইনেরও ওপরে এক গর্তে একটা লেপার্ডের জমাট শরীর পাওয়া গিয়েছিল। সেটা ছিল একটা রহস্য। কেন কিভাবে ওটা তার স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্রের এতো উপরে গিয়ে উঠেছিল কেউ বলতে পারেনি।

তুমি জান ইভলিন, যদিও অনেকেই ফালতু বলে কিন্তু আমি আমার ইনটুইশনের ব্যাপারে গর্ব অনুভব করি। আমার মনে হচ্ছে সেরকম এখানে কিছু একটা ঘটবে।

একবার নয়, বেশ কয়েকবার এক ধরণের বিশাল শক্তিশালী সামুদ্রিক প্রাণী তাদের স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্রের অনেক দূরে পাওয়া গিয়েছে। একটাকে সেদিন আমরা ধরেছি। এগুলো পৃথিবীর সমুদ্র কাঁকড়ার মতো।

এগুলোর বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই। আর হয়তোবা সেটা একটা অর্থহীন প্রশ্নও বটে। কিন্তু তারা অবশ্যই সুসংবদ্ধ সামাজিক প্রাণী, আদিম প্রাযুক্তিক জ্ঞানসম্পন্ন– কথাটা হয়তো একটু বেশিই হয়ে গেল। যদিও তাদের আবিষ্কারের পর তারা পিঁপড়ে যা উইপোকার চাইতে বেশী কোন ক্ষমতা দেখায়নি, কিন্তু তাদের কাজের মাত্রাটা অন্যরকম এবং বেশ আকর্ষণীয়। সবচে গুরুত্বপূর্ণ হলো তারা ধাতু খুঁজে পেয়েছে। যদিও তা কেবল গয়না হিসেবেই ব্যবহার হচ্ছে এবং তারও পুরোটাই ল্যাসানদের কাছ থেকে চুরি করা।

কিছুদিন আগেই একটা কাঁকড়া বরফ কলের একদম মাঝখান পর্যন্ত হেঁটে চলে এসেছিল। সহজ ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে এটা খাবারের খোঁজে এসেছিল। কিন্তু যেখান থেকে এটা এসেছে, সেখানেই প্রচুর খাবার আছে এবং তা পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে।

আমার জানতে ইচ্ছে করে কাঁকড়াটা এতো দূরে কি করছিলো। মনে হয় এ প্রশ্নের উত্তরটা ল্যাসানদের জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

যদি সাগান-২ এর যাত্রার দীর্ঘ শীতনিদ্রার আগে উত্তরটা পেতাম।

৪০. মুখোমুখি

ক্যাপ্টেন বে প্রেসিডেন্ট ফারাদীনের অফিসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। সাধারণত এডগার ফারাদীন ক্যাপ্টেনকে তার প্রথম নাম ধরেই সম্বোধন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াইনের বোতল খোলেন। কিন্তু এবার তিনি "সিরডার" বললেন না ওয়াইনও ঢাললেন না, তবে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন।

–আমি একটা অস্বস্তিকর খবর পেয়েছি ক্যাপ্টেন বে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, প্রধান মন্ত্রী আমাদের সঙ্গে বসবেন।

এই প্রথমবারের মতো ক্যাপ্টেন বে প্রেসিডেন্টকে কোন একটা বিষয়ে সরাসরি আসতে দেখলেন, এবং তার অফিসে প্রথম বারের মতো প্রধামন্ত্রীকেও।

–সেক্ষেত্রে, মি. প্রেসিডেন্ট আমি কি অ্যামবেসডর ক্যালডরকে আসতে আমন্ত্রণ জানাতে পারি?

প্রেসিডেন্ট সামান্য ইতস্ততঃ করলেন। তারপর বললেন "অবশ্যই"। ক্যাপ্টেন ফ্যাকাসে হাসিটা দেখে কিছুটা স্বস্তি পেলেন। এটা হলো কূটনৈতিক সূক্ষ্মতা–তারা হয়তো পদমর্যাদায় বেশী কিন্তু সংখ্যায় বেশী নয়।

ক্যাপ্টেন ভালোমতোই জানেন প্রধানমন্ত্রী বার্গম্যানই হচ্ছেন ক্ষমতার পেছনের মূল কলকাঠি নাড়াবার লোক। প্রধানমন্ত্রীর পেছনে আছে পুরো মন্ত্রীসভা এবং তাদের পেছনে আছে জেফারসন মার্ক-২ এর সংবিধান। জিনিসটা কয়েক শতাব্দী ধরে কাজ করছে। ক্যাপ্টেন বে অবশ্য টের পাচ্ছেন যে, সেটা এখন একটা হুমকির সামনে পড়েছে।

ক্যালডর নিজেকে দ্রুত মিসেস ফারাদীনের কাছ থেকে মুক্ত করলেন, যিনি ক্যালডরকে প্রেসিডেন্ট ভবন ঢেলে সাজানোর কাজে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করছেন।

প্রধানমন্ত্রী এলেন কয়েক মিনিট পরে তার স্বভাবসিদ্ধ দুর্বোধ্য ভঙ্গী নিয়ে।

সবাই বসলে প্রেসিডেন্ট টেবিলে হাত ছড়িয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে অনুযোগের দৃষ্টিতে অতিথিদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

–ক্যাপ্টেন বে, ড.ক্যালডর–আমরা কিছু খুব অস্বস্তিকর সংবাদ পেয়েছি। আমরা শুনেছি যে আপনারা আপনাদের যাত্রা সাগান-২ এ শেষ না করে এখানেই শেষ করতে চাচ্ছেন? এটা কি সত্যি?

ক্যাপ্টেন বে বিশাল স্বস্তি পেলেন–তারপরই বিরক্তিতে তার মনটা ভরে গেল। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বেশ বড় গলদ রয়েছে। কাউন্সিলের আবেদনটা এরা হয়তো জানেনা।

যদিও এমন আশা করা বোধহয় এখন ঠিক নয়।

–মি. প্রেসিডেন্ট, মি. প্রধানমন্ত্রী আপনারা যদি এমন কোন গুজব শুনে থাকেন–তবে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি এর মধ্যে কোন সত্যতা নেই। আমরা যে প্রতিদিন ছয়শো টন বরফ ওপরে নিয়ে যাচ্ছি, সেটা সম্বন্ধে আপনাদের কি ধারণা? এখানে থাকার ইচ্ছে থাকলে কি আমরা সেটা করতাম?

–হয়তোবা। যদি আপনারা কোন কারণে মন পরিবর্তন করেনই, বরফ ওঠানো বন্ধ করলে আমরা সতর্ক হয়ে যাব।

দ্রুত জবাবটা ক্যাপ্টেনকে মুহূর্তের জন্য থমকে দিল। এই সৌহার্দ্যপূর্ণ মানুষগুলোকে তিনি একটু কমই হিসেব করেছিলেন। তারপর তিনি বুঝতে পারলেন যে, এরা এবং এদের কম্পিউটার ইতিমধ্যেই সব সম্ভাব্য হিসাব করেছে।

–সেটা সত্যি। তবে আমি আপনাদের যেটা বলতে চাই যদিও এটা এখনও অঘোষিত এবং গোপনীয়–আমরা উত্তোলন দ্বিগুন করছি, বরফ বর্ম তাড়াতাড়ি তৈরী করার জন্য। এখানে থাকা তো দূরে থাক আমরা তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছি। আমার আশা ছিল যে তথ্যটা আপনাদের আরও আনন্দদায়ক পরিস্থিতিতে জানাব।

প্রেসিডেন্টতো তার বিস্ময় লুকাবার চেষ্টা করলেনই না, এমনকি প্রধানমন্ত্রীও পুরোপুরি তা চেপে রাখতে পারলেন না এবং তারা হজম করার আগেই ক্যাপ্টেন বে আবার আক্রমন করলেন,

–এবং মি. প্রেসিডেন্ট আপনার অভিযোগের স্বপক্ষে একটা প্রমাণ আমরা আশা করতে পারি। নাহলে আপনারা কিভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত করবেন?

–আমার মনে হয় সেটা সম্ভব নয়। সেটা আমাদের তথ্যের উৎসকে উন্মোচন করে ফেলবে।

–তাহলে তো ব্যাপারটা ঝুলে থাকল। আজ থেকে একশ তিরিশ দিন পরে, আমাদের নতুন হিসাব অনুযায়ী আমরা না যাওয়া পর্যন্ত আপনারা বিশ্বাস করবেন না।

একটু চিন্তিত এবং হতাশ নিস্তব্ধতা জমে থাকল। তারপর ক্যালডর বললেন,

–আমি কি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একটু একান্তে আলাপ করতে পারি?

–অবশ্যই।

তারা বাইরে থাকা অবস্থায়, প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন,

–তারা কি সত্যি বলছে?

–ক্যালডর মিথ্যে বলবেন না– এটা নিশ্চিত। তবে সে হয়ত সবটা জানে না।

তারা অবশ্য আলাপ চালানোর জন্য সময় পেলেন না, কারণ বাকী দু'জন আলোচনার জন্য ঢুকে পড়েছে। ক্যাপ্টেন বে বললেন,

–মি. প্রেসিডেন্ট, ড. ক্যালডর এবং আমি মনে করি কিছু জিনিস আমাদের বলা উচিৎ। আমরা এটাকে থামিয়ে রাখার পক্ষপাতি–কারণ জিনিসটা লজ্জাজনক এবং আমরা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ আমরা ভুল ভেবেছি এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন। তিনি তাদের কাউন্সিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন এবং শেষ উপসংহার টানলেন এই বলে যে, আপনারা চাইলে আমি রেকর্ড দেখাতে পারি। আমাদের লুকানোর কিছু নেই।

–সেটার দরকার নেই, সিরডার –প্রেসিডেন্ট বললেন। স্পষ্টতই তিনি বিরাট ভারমুক্ত।

তবে প্রধানমন্ত্রী এখনও চিন্তিত।

–একমিনিট প্রেসিডেন্ট। এটা কিন্তু আমরা যে রিপোর্ট পেয়েছি তা বাতিল করে না। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সেটা বেশ ভালোভাবে তৈরী।

–আমি নিশ্চিত ক্যাপ্টেন সেটা ব্যাখ্যা করতে পারবেন?

–যদি আপনারা বলেন, তাতে কি আছে।

আবার একটা বিরতি। প্রেসিডেন্ট ওয়াইনের দিকে এগুলেন, ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বললেন,

–প্রথমে পান করা যাক। তারপর আমি বলব, কিভাবে আমরা পেয়েছি।

৪১. রাতের আলাপ

এটা স্বচ্ছন্দে এগুচ্ছে–ফ্লেচার ভাবল। অবশ্যই ভোটের ব্যাপারটায় সে হতাশ, তবে সে অবাক হয়েছে এই ভেবে যে, এটা কত নিখুঁতভাবে মতামতকে তুলে ধরেছে। সে তার দু'জন ষড়যন্ত্রের সাথীকে বলেছিল তাদের স্বপক্ষের নোটগুলো হিসাব করতে–নব্য থ্যালসান আন্দোলনের শক্তি জানতে।

বরাবরের মতোই এরপর কি করব সেটা হচ্ছে সমস্যা। সে একজন প্রকৌশলী–রাজনীতিবিদ নয় যদিও সেদিকেই সে যাচ্ছে। কারণ নিজেকে উন্মোচন না করলে আর নতুন সমর্থক পাওয়া যাবে না।

এখন দুটো উপায় আছে। প্রথমটি এবং সহজও বটে–মহাকাশযান থেকে পালিয়ে যাওয়া। যাত্রা শুরুর সময় রিপোর্ট এ ব্যর্থ হলেই হয়। ক্যাপ্টেন বে যথেষ্টই ব্যস্ত থাকবে। আর ল্যাসান বন্ধুরা তাকে লুকিয়ে রাখবে ম্যাগেলান না যাওয়া পর্যন্ত।

সেটা হবে দ্বৈত পলায়ন– অঘোষিত সুসংবদ্ধ স্যাব্রা সমাজ থেকেও।

তাকে তার ঘুমন্ত বন্ধুবান্ধব, এমনকি তার আপন ভাই এবং বোনকেও ফেলে পালাতে হবে। তিন শতাব্দী পরে কঠিন সাগান-২ এ বসে তারা কি ভাববে তার

সম্পর্কে, যখন তারা শুনবে, তাদের সামনে স্বর্গের দরজা খুলে গিয়েছিল এক মুহূর্তের জন্য।

আর এখন সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। নতুন শিডিউলে বরফ তোলার গতি কম্পিউটারে একটাই অর্থ বহন করে। যদিও সে তার বন্ধুদের সঙ্গে এখনও কোন কথা বলেনি। কিন্তু আর একটি মাত্র উপায় হচ্ছে...

তার মনে যা আছে তার প্রকাশের শব্দটি হলো–অন্তর্ঘাত।

রোজ কিলিয়ান কখনো ডেলাইলার নাম শোনেনি এবং শুনলেও সে সম্ভবত আঁতকে উঠতো তার সঙ্গে তুলনায়। সে সরল এবং কিছুটা কাঁচাও, বহু ল্যাসানদের মতোই–যারা পৃথিবীর জৌলুসে ঘেরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহী। কার্ল বসেলির সঙ্গে তার ভালোবাসা শুধু তার জন্যই নয়, কার্লের জন্যও সেটা প্রথম প্রগাঢ় অনুভূতি। তাদের দু'জনেরই হৃদয় বিচ্ছেদের চিন্তায় ভেঙ্গে যায়। এক শেষ রাতে রোজ, কার্লের কাঁধে মাথা রেখে ফোঁপাচ্ছিল। কার্ল তার ব্যাথা সহ্য করতে পারছিল না। সে বলল–প্রতিজ্ঞা কর কাউকে বলবে না। আমি তোমার জন্য একটা খুব ভালো সংবাদ এনেছি। খুব গোপন কথা, কেউ জানে না। মহাকাশযান আর যাচ্ছে না। আমরা থ্যালসায় থাকছি।

রোজ বিস্ময়ে বিছানা থেকে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়।

–আমাকে খুশি করার জন্য বলছ নাতো।

–না এটা সত্যি। কিন্তু আর কাউকে বলো না। এটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে।

–নিশ্চয়ই প্রিয়।

কিন্তু রোজের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ম্যারিয়েনও কাঁদছিল তার পৃথিবীর প্রেমিকের জন্য সুতরাং তাকে তো বলতেই হয়..

...এবং ম্যারিয়েন সুখবরটা পৌঁছে দিল পলিনের কাছে... সে সিভেটনাকে না বলে থাকতেই পারে না... সে গোপন সংবাদটা ভাঙ্গল ক্রিস্টালের কাছে... এবং ক্রিস্টাল হচ্ছে প্রেসিডেন্টের কন্যা।

৪২. বেঁচে যাওয়া

এটা একটা অপ্রিয় কাজ, ক্যাপ্টেন বে ভাবলেন। ইয়েন ফ্লেচার একজন ভালো মানুষ–আমি নিজে তার নিয়োগ অনুমোদন করেছিলাম। সে কিভাবে এই কাজ করল? সম্ভবতঃ কোন একক ব্যাখ্যা নেই। সে যদি একজন স্যাব্রা না হতো, এবং যদি নীচের ওই মেয়েটির ভালোবাসায় না জড়াত তাহলে হয়তো এটা ঘটতো না। একের সঙ্গে এক যোগ করে দুই এর বেশী হওয়াটাকে যেন্ কি বলে? কিসের সাইন ওহহো সাইনেরজি। তবে এটা তার মনে হয়, অন্য কিছু একটা–যেটা তার কখনোই

জানা হবে না। ক্যালডরের একটা মন্তব্য মনে পড়ল। সে প্রতিটি ব্যাপারেই কোন মন্তব্য রাখবে–ক্রুদের মানসিকতার আলোচনার সময় সে একবার বলেছিল,

–আমরা সবাই পঙ্গু ক্যাপ্টেন। স্বীকার করো আর নাই করো। পৃথিবীর শেষ কয়েকটা বছর আমরা যারা সেখানে কাটিয়েছি তাদের প্রত্যেকেই এর শিকার। এবং আমরা সবাই একটা অপরাধবোধে ভুগছি।

–অপরাধবোধ? ক্যাপ্টেন অবাক হয়ে বলে উঠলেন।

–হ্যাঁ, যদিও আমাদের দোষ নয় সেটা। আমরা বেঁচে গেছি–একমাত্র রক্ষা পেয়েছি। এবং বেঁচে যাওয়া লোকেরা, বেঁচে যাওয়ায় সব সময়ই অপরাধবোধে ভোগে। এটা একটা অস্বস্তিকর মন্তব্য তবে ইয়েন ফ্লেচার এবং অনেক কিছুই এটা ব্যাখ্যা করে।

আমরা সবাই পঙ্গু।

আমি জানি না মোজেস ক্যালডর তোমার আঘাতটা কি এবং কিভাবে তুমি সেটা সামলাও। আমি আমারটা জানি। এবং আমার সঙ্গের মানুষদের ভালোর জন্য সেটা ব্যবহার করি। যেটা আমাকে আজ এখানে এনে দিয়েছে। এবং আমি তার জন্য গর্বিত।

আগেকার যুগে হলে আমি একজন একনায়ক অথবা যুদ্ধবাজ নেতা হতাম। তার বদলে আমি হয়েছিলাম মহাদেশীয় পুলিশের প্রধান। তারপর মহাকাশযান নির্মাণের প্রধান সমন্বয়কারী এবং সব শেষে মহাকাশযানের প্রধান ক্যাপ্টেন। আমার ক্ষমতার লোভকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। ক্যাপ্টেনের সিন্দুক–যার চাবি শুধু তার কাছেই থাকে, তিনি সেদিকে এগুলেন। একটা দরজা ঠেলতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। ভেতরে আছে কিছু কাগজ, কিছু মেডেল আর ট্রফি এবং একটা ছোট, কারুকাজবিহীন কাঠের বাক্স যাতে রুপোর অক্ষরে সি. বে. খোদাই করা। ক্যাপ্টেন বাক্সটা টেবিলে রাখলেন। কোলে পরিচিত স্পর্শে তার ভালো লাগছিল। বাক্সটা খুলে তার ভেলভেটের ওপর শুয়ে থাকা চকচকে ক্ষমতাবান যন্ত্রটার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। তার এই অস্বাভাবিক চিন্তা একসময় মিলিয়ন মানুষের মধ্যে ছিল। সাধারণত এটা কোন ক্ষতি করেনা–আদিম সমাজে অনেক সময় এটা ছিল মূল্যবান। এবং বহুবার এটা ইতিহাসের দিক পরিবর্তন করেছে–ভালো এবং মন্দ দুদিকেই।

–আমি জানি তুমি পুরুষত্বের চিহ্ন, ক্যাপ্টেন ফিসফিসিয়ে বললেন। তুমি একটা বন্দুক। আমি তোমাকে আগেও ব্যবহার করেছি। আমি তোমাকে আবারও ব্যবহার করতে পারি।

পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই তা কয়েক বছর ঘুরে এসেছে। তিনি তার ডেস্কের পাশে দাড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কয়েক মুহূর্তের জন্য সাইকোথেরাপিষ্টের সতর্ক কাজ মূল্যহীন হয়ে গিয়েছিল। পেছনের স্মৃতি হঠাৎ বেশীই ফিরে এসেছিল। তিনি আতংক এবং অদম্য আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন শেষের সে দশকগুলোর দিকে, যা মানুষের সবচেয়ে ভালো এবং খারাপ

জিনিসগুলোকে বের করে নিয়ে এসেছিল। তার মনে পড়ল কায়রোতে তরুণ পুলিশ ইন্সপেক্টর হিসেবে কিভাবে দাঙ্গাবাজ ভীড়ের উপর সে প্রথম গুলি চালানোর অনুমতি দিয়েছিল। বুলেট ছোরা হয়েছিল মূলত ছত্রভঙ্গ করার জন্য কিন্তু দু'জন মারা গিয়েছিল।

তারা কি নিয়ে দাঙ্গা করেছিল? সে জানতও না–শেষ দিকে বহু রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় আন্দোলন চলছিল। এবং সেটা আরও ছিল বিশাল সব অপরাধীর যুগ। তাদের হারানোর কিছু ছিল না। এবং ভবিষ্যত বলতেও কিছু ছিল না। সুতরাং তারা যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল। অধিকাংশই ছিল সাইকোপ্যাথ। তবে কিছু ছিল প্রায় জিনিয়াস। জোসেফ কিবারের কথা তার মনে পড়ল, যে একটা মহাকাশযান চুরি করে ফেলেছিল প্রায়। কেউ জানেনা তার কি হয়েছে। এবং ক্যাপ্টেন বে মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে যে, এমন যদি হয় যে ঘুমন্ত কারও মধ্যেই লুকিয়ে আছে সে।

৩৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পর জন্মদান আইন করে বন্ধ করে দেওয়ায় জনসংখ্যা কমে আসছিল। কোয়ান্টাম ড্রাইভ এবং ম্যাগেলানের মতো মহাকাশযান তৈরীর প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হতো। এ সবই এবং ঘনিয়ে আসা শেষ দিনের ছায়া সমাজে এমন এক চাপ ফেলেছিল যে বাস্তবিকই যে কেউ সৌরজগৎ ছাড়তে পারবে তা অবাস্তব বলেই মনে হতো। ক্যাপ্টেন বে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করলেন সেই সব মানুষদের কথা যারা তাদের শেষ বছরগুলো উৎসর্গ করেছিলেন এমন এক উদ্দেশ্যে যার সাফল্য বা ব্যর্থতা কোনটিই তাদের স্পর্শ করবে না। তিনি এখনও দেখতে পান প্রেসিডেন্ট এলিজাবেথ উইন্ডরকে। ক্লান্ত কিন্তু গর্বিত ভঙ্গীতে তিনি মহাকাশযান পরিদর্শন করে ফিরে যাচ্ছেন পৃথিবীতে, যে গ্রহের আয়ু আর মাত্র কয়েকদিন। আসলে তাঁর সময় ছিল আরও কম। পোর্ট ক্যাভেরালে নামার আগেই তার মহাকাশ প্লেনটিতে লুকানো বোমাটি বিস্ফোরিত হয়।

ক্যাপ্টেনের রক্ত এখনও শীতল হয়ে আসে ঘটনাটা স্মরণ করলে। বোমাটা ছিল ম্যাগেলানের উদ্দেশ্যে, সময়ের ভুলের জন্য মহাকাশযানটি রক্ষা পেয়েছিলো। তবে মজার ব্যাপার হল প্রতিটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী এর কৃতিত্ব নিয়েছিল।

জোনাথান কল্ডওয়েল এবং তার অনুসারীরা আরও জোরেসোরে বলছিল যে, আসলে এগুলো কিছু নয়, ঈশ্বর পরীক্ষা করছেন মানুষকে, যেমন তিনি আগেও পরীক্ষা করেছেন। সূর্যের যাই হোক না কেন পৃথিবী তার পথেই স্বাভাবিক ভাবে ঘুরবে। এবং মানব জাতি রক্ষা পাবে যদি সকল অবিশ্বাসীরা তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। এবং তখন হয়তো তিনি মত পরিবর্তন করবেন। আবার "ঈশ্বরের ইচ্ছা" নামের গোষ্ঠীরা বিশ্বাস করত একদম উল্টো কথা। শেষ বিচারের দিন সমাগত এবং কোনভাবেই তা ফেরানো যাবেনা। বরং একে স্বাগত জানানো উচিত, কারণ যারা বিশ্বাসী, তারা এরপর ভোগ করবে অনন্ত সুখ। এবং তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে দুই গোষ্ঠীই সিদ্ধান্তে এল যে, মানব জাতির এই ভবিতব্য হতে রক্ষা পাবার চেষ্টা অনুচিত। সব মহাকাশযান ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

ভাগ্য ভালো যে, দুই গোষ্ঠীই পরস্পরকে এমনভাবে অপছন্দ করত যে শেষের এই লক্ষ্য পূরণের জন্যও তারা একত্রে কাজ করতে পারেনি। এবং প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্ট উইন্ডরের মৃত্যুর পর তাদের সন্ত্রাস নিজেদের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল। একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল, অবশ্যই বিশ্বনিরাপত্তা দপ্তরের মাধ্যমে, যদিও তারা তা ক্যাপ্টেন বে'র কাছে স্বীকার করেনি, যে বোমাটি পেতেছিল 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' গোষ্ঠী এবং সময় পিছিয়ে দিয়ে ব্যাপারটা ভন্ডুল করেছে কল্ডওয়েলের অনুসারীরা। বিপরীত একটা গুজবও অবশ্য বাজারে চালু ছিল।

এগুলো সবই এখন ইতিহাস। এখন কয়েকজনই মাত্র জানে এবং শিগগিরই সবাই সব ভুলে যাবে। এবং কি আশ্চর্য ম্যাগেলান আবার অন্তর্ঘাতের বিপদের সামনে।

ধর্মীয় গোষ্ঠীর তুলনায় স্যাব্রারা অনেক যোগ্যতর এবং ধর্মীয় মৌলবাদে আচ্ছন্ন নয়। তারা সেজন্যই আরও বড় সমস্যা হতে পারে। তবে ক্যাপ্টেন বে বিশ্বাস করেন তিনি ব্যাপারটাকে সামলাতে পারবেন।

–তুমি একজন ভালো মানুষ ইয়েন ফ্লেচার–তিক্ততায় বললেন তিনি। তোমার চাইতে ভালো মানুষকে আমি হত্যা করেছি। এবং যখন কোন উপায় থাকে না, আমি অত্যাচারই করি। তবে তিনি এ ব্যাপারে গর্ব বোধ করেন যে, তিনি এটা মোটেই উপভোগ করেন না। এবং এখন আরও অনেক ভালো পদ্ধতি আছে এজন্য।

৪৩. জিজ্ঞাসাবাদ

এখন ম্যাগেলান একজন নতুন ক্রু পেয়েছে। এক বছর আগে যেমন ক্যালডরকে জাগিয়ে তোলা হয়েছিল তেমনি ভাবেই তাকেও অসময়ে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। এবং তিনি এখন নতুন অবস্থায় খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন। একমাত্র জরুরী কোন অবস্থায়ই এ ধরনের কাজ ঘটে। কম্পিউটারের রেকর্ডে ড. মার্কাস স্টেইন, প্রাক্তন তেরান গোয়েন্দা ব্যুরোর প্রধান বিজ্ঞানীর জ্ঞান এবং কর্মদক্ষতা এখন প্রয়োজন।

পৃথিবীতে তার বন্ধুরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করত কেন সে এতো কিছু থাকতে অপরাধতত্ত্বের প্রফেসর হল। এবং তারও একটাই উত্তর ছিল, এর একমাত্র বিকল্প ছিল একজন অপরাধী হওয়া। স্টেইনের এক সপ্তাহ লাগল ম্যাগেলানের হাসপাতালের সাধারণ মস্তিষ্কের গ্রাফ করার মেশিনটাকে পরিবর্তন করতে এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামকে পরীক্ষা করতে। ইতিমধ্যে চারজন স্যাব্রাকে তাদের রুমে আটকে রাখা হল এবং তারা দৃঢ়ভাবে কোন অপরাধ স্বীকার করল না। তার জন্য প্রস্তুতি দেখে ইয়েন ফ্লেচার খুব একটা ভালো বোধ করছিল না। বৈদ্যুতিক চেয়ার এবং অন্যান্য জিনিসগুলোর সঙ্গে পৃথিবীর রক্তাক্ত যুগের যন্ত্রের খুব বেশি মিল। ড. স্টেইন তাকে সহজ করে নিলেন একজন ভালো জিজ্ঞাসাবাদকারীর কৃত্রিম অন্ত-রঙ্গতা দিয়ে।

–ইয়েন ঘাবড়াবার কিছু নেই। বিশ্বাস কর তুমি কিছুই বুঝবে না। এমনকি তুমি বুঝতেও পারবেনা যে তুমি আমাকে উত্তর দিচ্ছ–এবং তুমি কিছু লুকাতে পারবে না। তুমি যেহেতু বুদ্ধিমান, সেহেতু আমি তোমাকে সবকিছু খুলে বলব। আমি কি করব তা ঠিকঠিক তোমাকে বলছি। এবং আশ্চর্য হলেও এ জিনিসটা আমার কাজে সাহায্য করবে। তুমি চাও না চাও–তোমার অবচেতন মন আমাকে বিশ্বাস করবে এবং সাহায্য করবে। কি গাধা–ফ্লেচার ভাবল। এতো সহজে আমাকে বোকা বানানোর কথা চিন্তা করল কিভাবে? কিন্তু কিছু সে বলল না, কারণ সাহায্যকারীরা ততক্ষণে তাকে ঢিলে বাধন দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে আটকে দিয়েছে। সে বাধা দেয়ারও চেষ্টা করল না। কারণ তার দুই প্রাক্তন বিশালদেহী সহকর্মী সতর্কভাবেই চোখাচোখি এড়িয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

–তোমার যদি তৃষ্ণা পায় বা বাথরুমে যাবার দরকার হয় বলবে। এবারের অধিবেশন হবে ঠিক এক ঘন্টার। পরে আরও ছোটভাবে কয়েকবার বসতে হতে পারে। আমি চাই তুমি আরাম করে বস।

এ পরিস্থিতিতে শেষ মন্তব্যটা একটু বাড়াবাড়ি মনে হলেও কেউই সেটাকে হাস্যকর হিসেবে নিল না।

–দুঃখিত যে তোমার মাথা কামাতে হল। কিন্তু মাথার ইলেকট্রোডগুলো চুল মোটেও পছন্দ করে না। আর তোমার চোখও ঢেকে দিতে হবে, না হলে চোখের সংবেদনশীলতা আমাদের হিসেবে গন্ডগোল করে দেবে... এখন তোমাকে একগাদা প্রশ্ন করা হবে যা হ্যাঁ, না এবং জানি না এই তিন উত্তরে সীমাবদ্ধ। তোমাকে মুখে বলতে হবে না, তোমার মস্তিষ্কই সেই উত্তর দিয়ে দেবে এবং কম্পিউটারের ট্রাইনারী যুক্তি তা বুঝে নেবে।

এবং কোনভাবেই তুমি মিথ্যা বলতে পারবে না। ইচ্ছে হলে চেষ্টা করে দেখতে পার! বিশ্বাস কর, পৃথিবীর সেরা কিছু মস্তিষ্ক এই যন্ত্র তৈরী করেছে, এবং একে কেউ বোকা বানাতে পারেনি। তোমার মাথায় হেয়ালী উত্তর এলে কম্পিউটার শুধু তার প্রশ্নগুলোর ছক পাল্টে দেবে। তৈরী? বেশ... জোরে... রেকর্ডিং... চ্যানেল ৫ চেক... শুরু।

তোমার নাম ইয়েন ফ্লেচার... উত্তর হ্যাঁ... অথবা না

তোমার নাম স্মিথ... উত্তর হ্যাঁ... অথবা না তুমি মঙ্গলের লোয়েল শহরে জন্মেছ, উত্তর হ্যাঁ... অথবা না

তোমার নাম জন স্মিথ... উত্তর হ্যাঁ... অথবা না

তুমি নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে জন্মেছ... উত্তর হ্যাঁ... অথবা না

তুমি ৩৫৮৫ এর ৩রা মার্চ জন্মেছ...

তুমি ৩৫৮৪ এর ৩১ শে ডিসেম্বর জন্মেছ...

প্রশ্নগুলো এতো দ্রুত আসতে শুরু করল যে সামান্য আচ্ছন্ন অবস্থায় না থাকলেও ফ্লেচার এর মিথ্যে উত্তর দিতে পারত না। আর দিলেও লাভ হতো না, জানা উত্তরগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে কম্পিউটার তা শুধরে নিত। কিছুক্ষণ পর পর আবার তাই উত্তরগুলো ঝালিয়ে নেয়া হচ্ছিল (তোমার নাম ইয়েন ফ্লেচার... তুমি কেপটাউনের জুলুল্যান্ডে জন্মেছ...) এবং নিশ্চিত হওয়া উত্তরগুলোর প্রশ্নগুলোও মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল। পুরো ব্যাপারটিই স্বয়ংক্রিয়, শুধুমাত্র শারীরবিদ্যার হ্যাঁ-না ব্যাপারটা স্থির করতে যা একটু সময় লাগে।

প্রাগৈতিহাসিক 'মিথ্যা ধরার' যন্ত্রগুলো এ ব্যাপারে বেশ সফল হলেও পুরো নিশ্চয়তা ছিল অসম্ভব। প্রায় দু'শ বছর লেগেছিল এই ব্যবস্থাটাকে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন করতে। এবং তখন বিচার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। সিভিল এবং ক্রিমিনাল কোর্টে কোন বিচার ঘন্টাখানেকের বেশী চলত না।

বিংশ শতাব্দীর বিশ প্রশ্নের ধাঁধার মতোই ছিল এই প্রশ্নোত্তর পর্ব। মোদ্দা ব্যাপারটাই হলো যে, যে কোন তথ্যই কিছু হ্যাঁ-না প্রশ্নের ছকে ভেঙ্গে ফেলা যায়। এবং আশ্চর্য হলো একটা এক্সপার্ট মেশিন ও এক্সপার্ট মানুষ বিশটা প্রশ্নের কমেই সব বের করে ফেলতে পারে।

ঠিক একঘন্টা পরে যখন হতবুদ্ধি ইয়েন ফ্লেচারকে চেয়ার থেকে টেনে তোলা হল তার কোন ধারণাই ছিল না যে তাকে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছে এবং সে কি উত্তর দিয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সে কিছুই বলেনি। সে কিছুটা অবাকই হল যখন ড. স্টেইন ফূর্তির সঙ্গে বললেন, 'ঠিক আছে ইয়েন, তোমাকে আর লাগবে না।' যদিও প্রফেসরের গর্ব ছিল যে তিনি কাউকে কখনো আঘাত করেন না, কিন্তু একজন ভালো জিজ্ঞাসাবাদকারীর ভেতরে কিছুটা স্যাডিস্ট মনোভাব থাকেই—সম্পূর্ণ মানসিকভাবে হলেও আর এটা তার মনোবল এবং সুনামও বাড়িয়ে দেয়, যা তার হয়ে অর্ধেক জয় করে। ইয়েন ফ্লেচার টাল সামলে তার ডিটেনশন রুমের দিকে রওয়ানা দেবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। —ও আচ্ছা ইয়েন, ভালো কথা—বরফের ঐ বুদ্ধিটা কখনোই কাজ করত না।

আসলে সম্ভবত তা ভালোই কাজ করত। তবে সেটা এখন কোন ব্যাপার নয়। লেঃ ফ্লেচারের মুখের ভাবটাই তার বুদ্ধির খেলার পুরস্কার।

তিনি আবার ঘুমুতে যাবেন সাগান-২ এ পৌঁছানো না পর্যন্ত। কিন্তু এখন তার বিশ্রামের সময়।

আগামীকাল তিনি থ্যালসায় নামবেন। হয়তো এর চমৎকার কোন সৈকতে সাঁতার কাটবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি তার এক বিশ্বস্ত, পুরানো বন্ধুর সান্নিধ্য চান।

বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠ থেকে তিনি যে বইটি বার করলেন তা শুধুমাত্র প্রথম সংস্করণ না বরং এখনকার একমাত্র সংস্করণ। তিনি হালকাভাবে পাতা উল্টাতে লাগলেন। কেননা, এর প্রতিটা পাতাই তার মুখস্ত। তিনি পড়তে শুরু করলেন। পৃথিবীর ধ্বংসের পঞ্চাশ আলোকবর্ষ পরে বেকার স্ট্রীটে আবার কুয়াশা গড়াতে শুরু করল।

–মাত্র চারজন স্যাব্রাই এর সঙ্গে জড়িত, ক্যাপ্টেন বে বললেন। ভাগ্য ভালো আর কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা লাগেনি।

–আমি বুঝি না তারা কিভাবে আশা করেছিল যে এটা করে তারা পার পেয়ে যাবে, ডেপুটি ক্যাপ্টেন ম্যালিনা বিরস স্বরে বললেন।

–আমারও বিশ্বাস তারা তা পারত না। তবে ভাগ্য ভালো যে এর পরীক্ষা দিতে হয়নি। আর, তারাও কিছুটা দোদুল্যমান ছিল।

–পরিকল্পনা 'ক' ছিল বর্মটাকে ক্ষতিগ্রস্থ করা। জানোই তো ফ্লেচার একজন উত্তোলনকারী ক্রু এবং ব্যাপারটাকে রি-প্রোগ্রামিং এর কাজেও সে যুক্ত ছিল। যদি একটা বরফের টুকরোও কয়েক মিটার বেগে আছড়ে পড়ে কি হবে চিন্তা করতে পার?

একে একটা দুর্ঘটনার মতো সাজানো যায়। কিন্তু পরবর্তী অনুসন্ধানে বেরিয়ে যেতে পারে যে সবকিছুই ঠিক ছিল। আর বর্ম ক্ষতিগ্রস্থ হলেও তা মেরামত সম্ভব। ফ্লেচারের আশা ছিল এই দেরী করে তার পক্ষে আর লোক জড়ো করবে। সে হয়তো ঠিক। থ্যালসায় আরেকটা বছর থাকলে... 'খ' ছিল মহাকাশযানে জীবন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ করা। এবং এটারও সমস্যা 'ক' এর মতোই। পরিকল্পনা 'গ' ছিল সবচে চিন্তার কারণ যা এই যাত্রাকে শেষ করে দিত। ভাগ্য ভালো কোন স্যাব্রা ইঞ্জিন বিভাগে নেই। তাদের কাছে ড্রাইভের কাছে যাওয়াটা বেশ কঠিন ব্যাপার হতো...

প্রত্যেকেই থমকে গেল–যদিও কমান্ডার রবালিনের চাইতে বেশী কেউ না।

–এটা খুব কঠিন নয় স্যার। বিশেষত যদি কেউ দৃঢ় সংকল্প হয়। বড় সমস্যা হল চিরস্থায়ীভাবে ড্রাইভের ক্ষতি করতে হলে মহাকাশযানের ক্ষতি করতে হবে। সে পরিমাণ কারিগরী জ্ঞান তাদের আছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

–তারা এর ওপরে কাজ করছিল–ক্যাপ্টেন ঠান্ডা স্বরে উত্তর দিলেন। আমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে হবে। এখানে, দুপুরে সব সিনিয়র অফিসারদের মিটিং হবে।

এবং সার্জন কমান্ডার নিউটন সবার মনের প্রশ্নটা করে বসলেন,

–ক্যাপ্টেন তাদের কি কোর্ট মার্শাল হবে?

–তার দরকার হবে না। দোষ প্রমাণিত হয়েছে। মহাকাশযান নিয়ম অনুযায়ী এখন সমস্যা হচ্ছে শাস্তি নির্ধারণ।

প্রত্যেকেই অপেক্ষা করলেন, অপেক্ষা।

–সকলকে ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেনের সমাপ্তিতে তার অফিসাররা নীরবে স্থান ত্যাগ করলেন।

রুমে একা বসে ক্যাপ্টেনের নিজেকে প্রতারিত মনে হচ্ছিল। যাকগে, তাও তো ব্যাপারটা চুকে গেছে। ম্যাগেলান মানুষ ঝড়ের হত থেকে রক্ষা পেয়েছে। অন্য তিন স্যাব্রা ঝামেলা না হলেও–ইয়েন ফ্লেচারকে নিয়ে কি করা যায়? তার সেলফের মারাত্মক খেলনার কথা তার মনে এল। তিনি ক্যাপ্টেন, একটা দুর্ঘটনা সাজানো তেমন ব্যাপার না...। তিনি তার কল্পনা সরিয়ে রাখলেন। কোনভাবেই তিনি তা

করতে পারেন না। তিনি অবশ্য মনস্থির করে ফেলেছেন, এবং তা সবারই সমর্থন পাবে।

একবার একজন বলেছিলেন যে সব সমস্যার একটি সহজ, আকর্ষণীয় কিন্তু ভুল সমাধান রয়েছে। আর তার সমাধানটি নিশ্চিত, সাধারণ, আকর্ষণীয় কিন্তু একদম ঠিক। স্যাব্রারা থ্যালসায় থাকতে চায়। তারা থাকতে পারবে। তার কোনই সন্দেহ নেই যে তারা হবে মূল্যবান নাগরিক। সম্ভবত ঠিক যেমন আক্রমনাত্মক, শক্তিশালী চরিত্র এই সমাজের প্রয়োজন।

কি আশ্চর্য যে ইতিহাস নিজেরই পুনরাবৃত্তি করছে। ম্যাগেলানের মতো সে তার কিছু মানুষদের ত্যাগ করে যাচ্ছেন। তবে তিনি কি তাদের শাস্তি দিচ্ছেন না পুরস্কৃত করছেন তা তিন'শ বছরের আগে জানা যাবে না।

সমুদ্র উদ্যান

৪৪. গোয়েন্দা গোলক

আমাদের আরো এক সপ্তাহ লাগবে ক্যালিপসোকে মেরামত করতে–ডিরেক্টর বলেছিলেন। এবং আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমরা জাহাজটা খুঁজে পেয়েছি। থ্যালসায় এটা মাত্র একটিই আছে। আমরা আবার এটাকে হারানোর ঝুঁকি নিতে পারিনা।

বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. ভার্লে ভাবছিলেন, এই লক্ষণগুলো আমার চেনা। এমনকি পৃথিবীর শেষ দিনগুলোতেও কিছু গবেষণাগারের পরিচালকরা তাদের সুন্দর যন্ত্রপাতি ঠিক কাজে ব্যবহার না করে সযত্নে রেখে দিতে চাইতেন।

–যতক্ষণ ক্র্যাকান অথবা ক্র্যাকানের বাচ্চা গোলমাল না করছে ততক্ষণ তো কোন সমস্যা নেই। এবং ভূতাত্ত্বিকেরা তো বলেছেনই যে আগামী পঞ্চাশ বছরে তার আর কোন সম্ভাবনা নেই।

–সে ব্যাপারে আমি তাদের সঙ্গে বাজী ধরতে রাজি আছি। কিন্তু আপনি এটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? কি সংকীর্ণ চিন্তা, ভার্লে ভাবল। যদিও সে, সমুদ্রপদার্থবিদ কিন্তু তারপরেও তো সামুদ্রিক প্রাণী সম্বন্ধে তার নূন্যতম আগ্রহ আশা করা যায়। তবে হয়তোবা আমি তাকে ভুল বুঝেছি। সে হয়তো কিছু বলতে চাইছে...

–কাঁকড়াগুলো আকর্ষণীয়। বহির্বিশ্বের যে কোন বুদ্ধিমত্তাই একদিন খুব গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে দেখা দিতে পারে। এবং আপনাদের জন্য সেটা আরো বেশী–কারণ ঘটনাটা আপনাদের দরজার সামনেই।

–আমি সেটা মানি। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে আমরা দুই পরিবেশে আছি।

কিন্তু কত দিন? বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ভাবলেন। যদি মোজেস ক্যালডর ঠিক হয়...

–আমাকে একটু বলুনতো গোয়েন্দা গোলকটা কি জিনিস? একটা বেশ ষড়যন্ত্রের গন্ধ দিচ্ছে।

–হাজার বছর আগে প্রতিরক্ষা এবং গোয়েন্দা বিভাগগুলো এটা বানিয়েছিল। কিন্তু এর আরো অনেক ব্যবহার আছে। কিছু আছে পিনের মাথার মতো আবার কিছু ফুটবলের মতো বড়। ভার্লে নকশাটা পরিচালকের টেবিলে বিছিয়ে দিলো। এটা হচ্ছে পানির নিচে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে তৈরী। আমি অবাক হচ্ছি আপনি এটা সম্বন্ধে জানেন না দেখে। কারণ এর আবিষ্কারের সময়কাল দেয়া আছে

২০৪৫। আমরা প্রকৌশল স্মৃতিতে পুরোটা খুঁজে পেয়েছি এবং তৈরী করেছি। প্রথমটা কাজ করেনি। কেন তা আমরা এখনও জানি না। তবে দ্বিতীয়টা খুব ভালো কাজ করেছে।

এখানে আছে একটা শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র, দশ মেগাহার্টজের সুতরাং আমরা মিলিমিটার পর্যন্ত বিবর্ধন পাব। ভিডিও মানসম্পন্ন না হলেও কাজের জন্য যথেষ্ঠ। সংকেত পাঠাবার জিনিসটা বেশ ভালো। যখন গোয়েন্দা গোলক চালু হবে এটা একটা সংকেত পাঠাবে যা বিশ থেকে ত্রিশ মিটারের মধ্যকার সব জিনিসের একটা শব্দের প্রতিচ্ছবি তৈরী করবে। দুইশ কিলোহার্টজের একটা তরঙ্গ এর সংকেত উপরে বয়ার কাছে পাঠাবে। সেটা আবার তা মূল কেন্দ্রে পাঠাবে। প্রথম ছবিটা পেতে দশ সেকেন্ডের মতো লাগবে। তারপর গোয়েন্দা গোলক আবার সংকেত পাঠাবে। যদি ছবিতে কোন পরিবর্তন না হয় এটা শূন্য সংকেত দেবে। কিন্তু কোন পরিবর্তন হলে নতুন ছবির জন্য এটা আবার সংকেত পাঠাবে। তার মানে আমরা প্রতি দশ সেকেন্ডে একটা ছবি পাচ্ছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা যথেষ্ঠ। যদি আরো দ্রুত ঘটনা ঘটতে থাকে তাহলে প্রতিচ্ছবিটা খারাপ হয়ে যাবে। তবে সবকিছুই একসঙ্গে আপনি চাইতে পারেন না। এটা যে কোন জায়গায় কাজ করে। অন্ধকারে এটা খুঁজে পাওয়াও কষ্টকর। আর খরচও বেশ কম।

পরিচালক যতটাই আগ্রহী লুকিয়ে রাখতেও সে ততটাই চেষ্টা করছে।

–বেশ চালাক খেলনা, হয়তোবা কাজ দেবে। আপনারা কি এর কয়েকটা দেবেন?

–হ্যাঁ অবশ্যই। আপনাদের রেপ্লিকেটারে যাতে আপনারা বানাতে পারেন, সেজন্যে আমরা দেখিয়ে দেবো। তবে প্রথম কয়েকটা আমরা কাঁকড়াদের বাসায় ফেলবো। এবং তারপর অপেক্ষা করবো কি ঘটে তা দেখার জন্যে।

৪৫. টোপ

ছবিগুলো ছিল ভাঙ্গা ভাঙ্গা। ভালোভাবে দেখার জন্যে কৃত্রিমভাবে রং দিয়েও মাঝেমাঝে বোঝা যাচ্ছিল না। সমুদ্রের তলদেশের ৩৬০ ডিগ্রী সমতল ভূমি চোখে পড়ছে। দূরে বামে কিছু সামুদ্রিক গুল্ম, মাঝে কিছু পাথর। ডানেও গুল্ম। যদিও ছবিটা স্থির ছবির মতোই কিন্তু বামদিকের নীচে নম্বরের পরিবর্তন সময়ের পরিবর্তন বোঝাচ্ছিল। আর হঠাৎ ছবিটা ঝাঁকি দিয়ে পরিবর্তিত হচ্ছিল যখন কিছু নড়ে যাচ্ছিল। টেরা নোভার মিলনায়তনে আমন্ত্রিত অতিথিদের ড. ভার্লে বলেছিলেন,

–আপনারা দেখছেন কোন কাঁকড়া এখানে ছিল না। কিন্তু তারা আমাদের জিনিস ফেলাটা বুঝেছিল বা শুনেছিল। এক মিনিট বিশ সেকেন্ড পর প্রথম পরিদর্শক এসেছিল।

এখন ছবিটা দশ সেকেন্ড অন্তর অন্তর বদলাচ্ছে এবং প্রতি ছবিতে কাঁকড়ার সংখ্যা বাড়ছে। আমি এই ছবিটা ধরে রাখছি, যাতে আপনারা ভালো বুঝতে পারেন। ডান দিকের কাঁকড়াটা দেখেছেন? এর বাম দাঁড়ার দিকে দেখুন। প্রায় পাঁচটা ধাতুর রিং! এবং মনে হচ্ছে এই হচ্ছে কর্তৃস্থানীয়। পরের ছবিটায় দেখুন অন্য কাঁকড়াগুলো এর জন্য রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছে–এখন সে রহস্যময় বস্তুটাকে পরীক্ষা করছে–এটা বেশ ভালো ছবি–দেখুন সে কিভাবে দাঁড়া এবং মুখের আঙ্গুলগুলো ব্যবহার করছে–একটা শক্তির জন্য, অন্যটা সূক্ষ্মতার জন্য–এখন সে জিনিসটা টানছে–কিন্তু আমাদের উপহারটা তার জন্য বেশ ভারী–এর আচরণটা দেখুন–কসম করে বলছি এটা নির্দেশ দিচ্ছে, যদিও কোন সিগনাল আমরা পাইনি –হয়তোবা তা শব্দ সীমার নীচে– এখন আসছে আরেকটা বড়সড়–'

ছবিটা হঠাৎ কাত হয়ে গেল।

–এখন দেখুন তারা টেনে নিয়ে যাচ্ছে জিনিসটা এবং ড. ক্যালডর আপনিই ঠিক–তারা পাথরের পিরামিডের গর্তের দিকে এগুচ্ছে–কিন্তু জিনিসটা ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য বেশ বড়, অবশ্য ইচ্ছেকৃতভাবেই এটা করা এবং এটা হচ্ছে আকর্ষণীয় একটা অংশ। কাঁকড়াদের বেশ ভালোই চিন্তা করতে হয়েছে। যদিও এটা মূলত আবর্জনার তৈরী, কিন্তু সেটা সুচিন্তিতভাবেই বাছাই করা। এখানে আছে স্টীলের, তামার, এলুমিনিয়ামের এবং সীসার পাত, কাঠের টুকরো, প্লস্টিকের পাত এবং টিউব, লোহার চেইনের অংশ, একটা ধাতব আয়না। পুরো স্তুপটার ওজন প্রায় একশ কেজি এবং এমনভাবে সাজানো যাতে কেবল একত্রেই পুরোটা নাড়ানো যায়। গোয়েন্দা গোলকটা এক কোণায় যত্নের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে চারটা ছোট আলাদা চেইনের সঙ্গে। এবার দুটো বড় কাঁকড়া আবর্জনার স্তুপটাকে আক্রমণ করছে। বেশ দৃঢ়সংকল্প এবং বলা যায় সুচিন্তিতভাবেই। তাদের শক্তিশালী দাঁড়া পেচানো তারগুলোকে ছিড়ে ফেলল। এবং তারা কাঠের আর প্লাস্টিকের টুকরোগুলোকেও সরিয়ে ফেলল। বোঝাই যাচ্ছে তারা শুধু ধাতুতে আগ্রহী। আয়নাটা তাদের থমকে দিল। তারা এটাকে তুলে নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখছে।

আমরা আশা করেছিলাম তারা আক্রমণ করবে। মাছেদের চৌবাচ্চায় আয়না দিলে বেশ ভালো যুদ্ধ শুরু হয়। সম্ভবতঃ তারা তাদের চিনেছে। এটা বুদ্ধিমত্তার বেশ ভালো চিহ্ন।

কাঁকড়াগুলো আয়না ফেলে বাকি আবর্জনা সমুদ্র সমতলে বিছাতে আরম্ভ করল। এর পরের ছবিগুলো হতাশাজনকভাবে ধোয়াটে। যখন আবার ছবি আসল তখন ছবিটা পুরো ভিন্ন।

–আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমরা যেভাবে চেয়েছি ঠিক সেভাবে হয়েছে। তারা গোয়েন্দা-গোলকটাকে রক্ষী প্রহরারত গর্তের দিকে টেনে নিচ্ছে। তবে এটা তাদের রানীর ঘর নয়– রানী আছে কিনা আদৌ সেটাই বেশ তর্কের ব্যাপার...

দর্শকরা অদ্ভুত দৃশ্য থেকে বেশ কিছুক্ষণ থমকে রইল। তারপর কেউ একজন বলল, –এটা একটা ভাগাড়।

–কিন্তু কোন একটা উদ্দেশ্য আছে...

–দেখ, ওটা একটা দশ কিলোওয়াটের মোটর –কেউ নিশ্চয়ই ফেলে দিয়েছে।

–আচ্ছা এখন বুঝলাম কারা আমাদের নোঙরের শেকল চুরি করে।

–কিন্তু কোন কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

–কিছু একটা তো ব্যাপার আছেই।

মোজেস ক্যালডর দৃষ্টি আকর্ষণকারী গলা খাঁকরানী দিলেন–যেটা অবশ্য প্রায়ই ব্যর্থ হয়।

–এটা একটা তত্ত্ব মাত্র। তবে দেখা যাচ্ছে নতুন তথ্যগুলো একেই সমর্থন করছে। আপনারা লক্ষ্য করুণ এখানে সবই ধাতু, সতর্কতার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গা থেকে জড়ো করা।

এখন একটা বুদ্ধিমান সামুদ্রিক প্রাণীর কাছে ধাতু হলো রহস্যময় একটা জিনিস। সমুদ্রের অন্যান্য যে কোন জিনিস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দেখা যাচ্ছে তারা প্রস্তর যুগেই রয়ে গেছে এবং আমাদের পৃথিবীর স্থলচর প্রাণীদের মতো তারা সেখান থেকে এগুতে পারছে না। জলের ভিতর আগুন ছাড়া তারা একটা প্রাযুক্তিক কানা গলিতে পরে গেছে। আমার মনে হয় আমরা এখানে বহু আগের পৃথিবীরই পুরোনো একটা ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। আপনারা কি জানেন আদিম মানুষ কোথায় তার প্রথম লোহা পেয়েছিল? আকাশ থেকে! আপনাদের আশ্চর্য হওয়াতে আমি অবাক হচ্ছি না। কিন্তু খাঁটি লোহা প্রকৃতিতে কখনো পাওয়া যায় না। খুব শিগগিরই মরিচা পড়ে যায়। প্রাচীন মানুষের এক মাত্র উৎস ছিল উল্কা। কোন অবাক ব্যাপার নয় যে সেগুলোর উপাসনা হতো। আশ্চর্যের নয় যে আমাদের পূর্বপুরুষরা আকাশের বাইরে দেবতায় বিশ্বাস করত। এখানেও কি সেই একই প্রক্রিয়া চলছে? আমি আপনাদের ব্যাপারটা সতর্কতার সঙ্গে ভাবতে বলি। আমরা এখনও জানিনা কাঁকড়াগুলো কি পরিমান বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী। এমনও হতে পারে তারা কেবল তাদের–কি বলব যাদুকরী সম্পদের লোভে ধাতু যোগাড় করে। কিন্তু তারা কি আবিষ্কার করতে পারবে কিভাবে এগুলো প্রদর্শনীর চাইতেও বেশী কাজ করতে পারে। তারা কতদূর এগুতে পারবে? তারা ঠিক ওখানেই বসে থাকবে সবসময়?

বন্ধুরা, আমার মনে হয় আপনাদের কাঁকড়া সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় জেনে রাখা ভালো। এমনও হতে পারে আপনারা আরেকটি বুদ্ধিমান প্রাণীর সঙ্গে এই গ্রহটি ভোগ করছেন।

আপনারা কি শান্তি অথবা যুদ্ধ বেছে নেবেন? এমনকি কাঁকড়াগুলো যদি খুব বুদ্ধিমান নাও হয় তাহলেও হতে পারে মারাত্মক হুমকি অথবা কার্যকর যন্ত্র। হয়তো আপনারা এর চাষ করবেন। আপনারা রেফারেন্সের জন্য কার্গো বিশ্বাস–এ দেখতে পারেন।

এই গল্পের পরবর্তী অধ্যায় জানতে পারলে আমি খুশি হতাম। সেখানে কি কাঁকড়া দার্শনিক আছে?

এমনকি এখন গুল্মের জঙ্গলে বসে তারা আমাদের সম্পর্কে কি করতে চাচ্ছে? সুতরাং দয়া করে ডিপ-স্পেস এন্টেনাটা ঠিক করবেন। ম্যাগেলানের কম্পিউটার আপনাদের তথ্যের জন্যে অপেক্ষা করবে –যাতে সাগান-২ এ আমরা দেখতে পাই।

৪৬. ঈশ্বর যেখানেই থাক...

–ঈশ্বর কি? মিরিসা জিজ্ঞেস করল।

ক্যালডর শতাব্দীর প্রাচীন প্রদর্শনী থেকে ফিরে তাকাল।

–এহ হে, তুমি আবার এটা জিজ্ঞেস করছ কেন?

–কারণ লোরেন গতকাল বলছিল, "মোজেস চিন্তা করছে কাঁকড়াগুলো ঈশ্বর খুঁজছে।"

–সে তাই বলেছে? আমি তার সঙ্গে কথা বলব পরে। এবং ভদ্র মহিলা তুমি আমাকে যা জিজ্ঞেস করেছ, তা মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে হাজার বছর ধরে আছন্ন করে রেখেছে এবং মানব ইতিহাসে যে কোন বিষয়ের চাইতে বেশী কথা লেখা হয়েছে। এই সকালে তোমার হাতে কতটুকু সময় আছে?

মিরিসা হাসল–অন্ততঃ এক ঘন্টা। তুমি একবার বলেছিলে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস একটি মাত্র বাক্যে বলা যায়।

–উমম্ হ্যাঁ। আমি বেশ বড়, প্যাঁচালো কিছু বাক্য জানি। এখন কোথেকে শুরু করি...

সে তার চোখ দুটো লাইব্রেরীর জানালা দিয়ে বাইরের প্রথম অবতরণের নিস্তব্ধতার দিকে মেলে দিল।

এখানে এই গ্রহের মানব জীবন শুরু হয়েছিল, এটাকে সে জন্যই আমার ইডেনের মতো লাগে। আর আমি কি সেই সাপ, যা এর সরলতা ভাঙ্গতে চলেছি?

কিন্তু মিরিসার মতো বুদ্ধিমান মেয়েকে তো আমি এমন কিছু বলিনি যা সে জানে না বা অন্ততঃ আন্দাজ করে না। সে আস্তে আস্তে শুরু করল,

...ঈশ্বর শব্দটার সমস্যা হচ্ছে যে, এটা কখনোই দু'জন মানুষের কাছে এক অর্থ প্রকাশ করে না, অন্ততঃ দার্শনিকদের কাছে তো নয়ই। সেজন্য তৃতীয় সহস্রাব্দে কথাটা উঠেই যাচ্ছিল, কেবল হঠাৎ ব্যাথার প্রকাশ ভঙ্গি ছাড়া। কোন কোন সমাজে এটাকেও অসংস্কৃত হিসেবে ধরা হতো। তার বদলে এটা কিছু বিশেষ শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে গেল। এটায় লাভ হলো যে মানুষের এটাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়াটা আগের মতো রইল না। ব্যক্তিগত ঈশ্বর যাকে কখনও এক ঈশ্বর বলে ডাকা হতো পরিণত হল আলফায়। এটা হচ্ছে একটা কল্পিত জিনিস যা প্রতিদিন প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি প্রাণীর উপর নজর রাখে। এবং ভালোদের পুরস্কৃত এবং মন্দদের শাস্তি দেন, সাধারণত মিথ্যেমিথ্যি বর্ণিত মৃত্যুর পরের এক জীবনে। তুমি পূজা বা উপাসনা কর আলফার, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন কর, বিশাল মন্দির, মসজিদ তৈরী কর এর সম্মানে...

আরেক দলের ঈশ্বর ছিলেন, যিনি এই মহাবিশ্ব তৈরী করেছিলেন কিন্তু তারপর হয়তো কিছু করেছেন অথবা কিছু করেননি এই মহাবিশ্ব নিয়ে। ইনি হচ্ছেন ওমেগা।

ঈশ্বরের ব্যবচ্ছেদ করতে দার্শনিকরা গ্রীক বর্ণমালার বিশটা বা তারও বেশী বর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। তবে আলফা আর ওমেগাই মনে হয় আজকের জন্য যথেষ্ঠ। আমার মনে হয় না দশ মিলিয়ন মানুষের বেশী এর সম্বন্ধে আলোচনা করেছে।

আলফা ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল–সে জন্যই পরে সেটা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে। এটা অবশ্য পৃথিবী ধ্বংসের শেষ পর্যন্ত ভালোভাবেই টিকে থাকতো যদি বিভিন্ন প্রতিযোগী ধর্মানুসারীরা পরস্পরকে ছেড়ে দিত। কিন্তু তারা সেটা পারেনি। কারণ প্রত্যেকেই দাবী করত তারাই একমাত্র সত্যকে ধারণ করে আছে। যার ফলে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মকে ধ্বংস করতে হবে। যার মানে হল শুধু অন্য ধর্মই নয় বরং নিজেদের মধ্যে উপদলগুলোকেও।

অবশ্য এটা একদম সরলীকৃত। ভালো মানুষও ছিল, যারা পরস্পরের প্রতি সহনশীল এবং বিশ্বাস বিনিময়ে বিশ্বাসী। এবং প্রাথমিক মানব সমাজে ধর্মের প্রয়োজনটা হয়তো অত্যাবশকীয় ছিল। অতিপ্রাকৃতিক বন্ধন ছাড়া হয়তো মানুষ কখনোই গোষ্ঠীসত্ত্বার ওপরে উঠতে পারত না। এবং ক্ষমতা আর সুবিধা দিয়ে নষ্ট হবার আগে এটা সমাজের বিরুদ্ধে যায়নি। কিন্তু এর অনেক ভালোদিকই ঢেকে গেল বড় খারাপ দিকগুলো দিয়ে। তুমি নিশ্চয়ই কখনো শোননি রোমের–ধর্ম বিচার সভা, ডাইনী-হত্যা অথবা ক্রুসেড আর জিহাদের নাম। তুমি কি বিশ্বাস করবে, এমনকি মহাকাশ যুগেও এমন জাতি ছিল যেখানে বাবা-মা রাষ্ট্রিয় আলফার অনুসারী না হওয়ায় তাদের সন্তানদের সরকারীভাবে উৎসর্গ করা হতো। তুমি আহত হয়েছ, কিন্তু এরকম এবং এর চাইতেও জঘন্য ঘটনা ঘটেছে–যখন আমাদের পূর্ব পুরুষরা মাত্র সৌর জগতে পা ফেলছিল। তবে মানবজাতির সৌভাগ্য যে আলফা ২০০০ এর প্রথম দিকে ম্লান হয়ে আসছিল। এটা অবশ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল সংখ্যাতাত্ত্বিক ধর্মতত্ত্বের দ্রুত বিকাশের ফলে। আর কতক্ষণ আছে? বুবি কি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেনি?

মিরিসা জানালা দিয়ে এক ঝলক তাকাল। ঘোড়াটা শান্তভাবে ঘাস খাচ্ছে।

–যতক্ষণ খাবার আছে ততক্ষণ এটা ঠিক আছে। সংখ্যাতাত্ত্বিক ধর্মতত্ত্বটা কি জিনিস?

–শয়তান ব্যাপারে এটাই শেষ আঘাত–যেটা একটা অস্বাভাবিক গোষ্ঠির জন্ম দিয়েছিল। তারা নিজেদের বলত নব্য ক্ষ্যাপা, কেন বলতো সেটা জিজ্ঞেস করো না। এটা প্রায় ২০৫০ সালে। এবং ঘটনাক্রমে এটাই প্রথম মহাকাশ নির্ভর ধর্ম। যদিও অন্যান্য ধর্মও কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে ধর্ম প্রচার চালাত কিন্তু এরা কেবলই উপগ্রহ নির্ভর ছিল।

টেলিভিশনের পর্দা ছাড়া তারা আর কোথাও মিলিত হতো না।

তবে প্রযুক্তি ছাড়া বাকীটা ছিল বহু পুরোনো ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। তারাও বিশ্বাস করত আলফা আছে, কিন্তু সে সম্পূর্ণ অশুভ। এবং মানবজাতির চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে এর মুখোমুখি হয়ে একে ধ্বংস করা। তারা তাদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে ইতিহাস

এবং জীববিদ্যা ঘেটে অসংখ্য প্রমাণ জোগাড় করত। আমার ধারণা তারা ছিল অসুস্থ –কারণ তার ঐ সব ভয়ংকর তথ্য জোগাড় করতে মজা পেত।

যেমন ধরো আলফার অস্তিত্বের এক প্রিয় প্রমাণ ছিল 'পরিকল্পনার যুক্তি'। আমরা এখন জানি যে পুরোটাই ফালতু, কিন্তু তারা এটাকে বেশ বিশ্বাসযোগ্য করে বলত। যদি তুমি একটা সুন্দর পরিকল্পনার ব্যবস্থা পাও, যেমন ডিজিটাল ঘড়ি তখন তার পেছনে অবশ্যই একজন পরিকল্পনাকারী থাকবে, একজন সৃষ্টিশীল লোক থাকবে এর পেছনে। এখন তুমি তাকাও প্রকৃতির রাজ্যে–এবং তারা সেভাবেই দেখতো, অবশ্য এটা প্রতিহিংসার ভাব নিয়ে। পরজীবিবিদ্যা ছিল তাদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা–অবশ্য তোমরা জানই না যে, তোমরা থ্যালসানরা কতটা ভাগ্যবান। আমি অবশ্য তোমাকে সেই অসাধারণ সব পদ্ধতি যা দিয়ে বহু প্রাণী অন্য প্রাণীর ভেতরে বিশেষত মানুষের মধ্যে বাস করত, শোষণ করত ধ্বংশ হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তা বলে বিরক্ত করব না। শুধু তোমাকে তাদের একটা প্রিয় পোষ্য ইফনিউমোন মাছি সম্বন্ধে বলি।

এই চমৎকার পোকাটি অন্য পোকাদের অবশ করে তাদের ওপর ডিম পাড়ত যাতে তার ছানারা বেরিয়েই একদম তাজা, জ্যান্ত খাবার পায়।

তারা এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা চালাতে পারত। প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে আলফার প্রমাণ হিসেবে দেখিয়ে চূড়ান্ত অশুভ শক্তি হিসেবে দেখানো। যদি তাই নাই হবে, মানুষে মানুষে এতো পার্থক্য হল কিভাবে। আর একটা তাদের প্রিয় প্রমাণ ছিল, ধ্বংসের প্রমাণ। একটা পরিচিত উদাহরণ যা বহুবার হয়েছে, আলফার জন্য সমবেত প্রার্থনারত মানুষ বিপদের সময় বহুবার ভবন ধ্বসে মারা গেছে অথচ ঘরে বসে থাকা মানুষ রক্ষা পেয়েছে।

এরা প্রচুর ভয়ংকর ঘটনা সংগ্রহ করেছিল, হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম পুড়ে যাওয়া, ভূমিকম্পে শিশুদের স্কুল তলিয়ে যাওয়া, অগ্ন্যুৎপাত বা প্লাবনে শহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিশাল সে তালিকা। অবশ্যই আলফার লোকজনও বসে ছিলনা। তারা সমান সংখ্যক উদাহরণ বিপরীতে সংগ্রহ করেছিল। বিশ্বাসীদের বাঁচাতে যে চমৎকার সব ঘটনা ঘটেছে তার তালিকা।

এভাবে বহু হাজার বছর এটা চলছিল। কিন্তু ২১ শতাব্দীতেই, নতুন তথ্য প্রযুক্তি এবং সংখ্যা তাত্ত্বিক গবেষণা আর বিস্তৃত অনুমানতত্ত্ব ব্যাপারটার ফয়সালা করে।

কয়েক দশক লেগেছিল উত্তরটা আসতে এবং আরও কয়েক দশক সব বুদ্ধিমান মানুষের স্বীকার করতে যে খারাপ জিনিস ভালো জিনিসের মতোই আসে। অনেক আগে থেকেই যা সন্দেহ করা হচ্ছিল, তাই সত্যি– মহাবিশ্বও সহজভাবে গানিতিক সম্ভাবনাকে মেনে চলে। আসলেই সেখানে কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব নেই– না ভালো না মন্দ। তাই অশুভ শক্তির ব্যাপারটা আর রইল না। মহাবিশ্বকে দয়ালু ভাবার মানেটা হচ্ছে ভাগ্য নির্ভর একটা খেলার প্রতিটিতে জেতা।

অবশ্য তারপরও কোন কোন ধর্মগোষ্ঠী তাদের আলফাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। তারা উচ্চ কণ্ঠে বলত আলফার ধর্ম অভিন্ন এবং একটা ঘন্টার মতো

রূপক তাদের বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে দেখাত। বলাই বাহুল্য এতো বিমূর্ত জিনিস খুব বেশী উৎসাহ আনেনা। গণিতের আরেকটা জিনিস আলফাকে আঘাত করেছিল। একজন প্রতিভাবান তেরান, কূট গোডলে প্রমাণ করে যে জ্ঞানের মৌলিক কিছু সীমাবদ্ধতা থাকবেই। তাই সর্বজ্ঞানী সত্ত্বা যা কিনা আলফার একটা সংজ্ঞা– যুক্তিসম্মত নয়।

শেষ সহস্রাব্দের মাঝে আলফা মানুষের মন দিয়ে প্রায় মুছেই গেল। সব চিন্তাশীল মানুষই মহান দার্শনিক লিওক্রিস্টাসের কঠিন মন্তব্যের সঙ্গে একমত হলেন, সমস্ত ধর্মই আসলে অনৈতিক, কারণ অলৌকিক বিশ্বাস ভালোর চাইতে খারাপটাই বেশী ছড়িয়েছে। যদিও কিছু পুরোনো বিশ্বাস টিকে ছিল একদম শেষ পর্যন্ত, তবে পুরোটাই পাল্টে গিয়ে। শেষ দিকে মর্মন এবং নবীর মেয়েরা নিজেরাই বীজবহনকারী মহাকাশযান বানিয়েছিল। আমার জানতে ইচ্ছে হয়, সেগুলোর কি অবস্থা।

আলফা মুছে গেলে, টিকে ছিল ওমেগা, সব কিছুর স্রষ্টা। একে মোছা সহজ ছিল না, এবং মহাবিশ্ব কিছুটা প্রমাণ দিত। দিত কি? একটা পুরোনো দার্শনিক কৌতুক বলি– যেটা আসলে বেশ সূক্ষ্ম। প্রশ্ন মহাবিশ্ব এখানে কেন? উত্তর, আর কোথায় এটা থাকতো? আমার মনে হয় এক সকালে এই যথেষ্ঠ। –ধন্যবাদ মোজেস, মিরিসা বলল। তাকে সামান্য বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। তুমি এগুলোর সবই আমাকে বলেছ। নয় কি?

–অবশ্যই বহু বার। এবং প্রতিজ্ঞা করো।

–কি?

–আমি যা বলেছি তার একফোঁটাও বিশ্বাস করোনা। কোন জটিল দার্শনিক সমস্যার কখনোই সমাধান হয় না। ওমেগা তো এখনও টিকে আছে। আর মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি আলফা...

ফুলকীগুলো উপরে উঠে যায়

৪৭. উর্দ্ধপথে যাত্রা

তার নাম ক্যারিনা, আঠারো বছর বয়স। যদিও এটাই তার কুমারের নৌকায় রাত্রের আঁধারে প্রথম ভ্রমণ। তবে অবশ্যই তার প্রথম শোয়া নয়। সেই কুমারের পছন্দের মেয়ে, এমন একটা কথা অনেকেই বলে থাকে।

সূর্য অনেকটা আগেই ডুবে গেছে। ভিতরের চাঁদটা পৃথিবীর চাঁদের চাইতেও অনেক কাছে এবং তার উজ্জ্বল ঠান্ডা, নীল আলো আধমাইল দূরের সৈকতকে ছুঁয়ে দিচ্ছে। পাম গাছের সারি থেকে আধমাইল দূরে আগুন জ্বলছে। সেখানে এখনও উৎসব চলছে। সবচেয়ে কম শক্তিতে চলতে থাকা ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ ছাড়িয়েও মাঝে মাঝে হালকা গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। কুমারের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এবং আর কিছু চাইবার ইচ্ছে তার আপাতত নেই। খুব ভালো নাবিক বলেই সে মাঝে মাঝে স্বয়ংক্রিয় চালককে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল এবং চার পাশ দেখছিল। কুমার ক্যারিনাকে সত্যিকারের সুখের কথা বলছিল। নৌকার মৃদু দোলানীটা যখন বাতাসের কুশনে (যার উপরে তারা শুয়ে আছে) আরও বেড়ে যায় তখন তার মধ্যে খুব উত্তেজক একটা অনুভূতি থাকে। এর পরে শুকনো জমিতে ভালোবাসাবাসি করতে কি ক্যারিনার আর ভালো লাগবে? কুমার ক্যারিনার পরিচিত আর দশটা যুবকের চাইতে অনেক বেশী সংবেদনশীল, সহনশীল। সে ওরকম নয় যারা শুধু নিজের তৃপ্তি খুঁজতেই ব্যস্ত। অন্যজন উপভোগ না করলে তার আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না। ক্যারিনা ভাবল যখন সে আমার মধ্যে থাকে মনে হয় যে আমি বিশ্বের একমাত্র মেয়ে, যদিও আমি ভালোভাবেই জানি তা নয়।

ক্যারিনা মৃদুভাবে টের পাচ্ছিল তারা গ্রাম ছেড়ে আরো দূরে যাচ্ছে, তবে সে কিছু মনে করেনি। তার মনে হচ্ছিল যদি এ সময় না ফুরাতো– যদি এই নৌকাটা চলতেই থাকতো। তীর থেকে দূরে গিয়ে পুরো গ্রহকে চক্কর মেরে আবার তা ফিরে আসত। কুমার অবশ্য ভালোভাবেই জানতো সে কি করছে। তার বিশ্বাসটাও ক্যারিনাকে আনন্দ দিচ্ছিল। কুমারের নিরাপদ বাহুর আশ্রয়ে কোন ভয় নেই, সমস্যা নেই, কোন ভবিষ্যত সামনে দাঁড়িয়ে নেই, আছে শুধু অন্তহীন বর্তমান।

তবুও সময় যায়। এখন ভেতরে চাঁদ আকাশের অনেক উপরে। ভালোবাসার দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন তাদের ঠোঁটগুলো শরীরের ভালোবাসার খাঁজগুলো আবিষ্কারে ব্যস্ত তখন পানির জেট এবং নৌকাটা থেমে গেল।

–আমরা এসে গেছি, কুমার বলল। তার গলায় হালকা উত্তেজনা।

'এসে গেছি' মানেটা কি? ক্যারিনা অলসভাবে ভাবল। ঘন্টা খানেকের মতো তারা তীরের দিকে তাকায়নি। যদিও এটা দৃষ্টিসীমার মধ্যেই আছে। নৌকার মৃদু দোলানীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। সে বড় বড় চোখ করে তাকালো তার সামনের স্বপ্নের জায়গাটার দিকে, যেটা কিছু দিন আগেও ছিল ম্যানগ্রোভ বনের পরিত্যক্ত ভূমি।

অবশ্য উচ্চতর প্রযুক্তির সঙ্গে এটাই তার প্রথম সাক্ষাত নয়। ফিউশন প্ল্যান্ট এবং প্রধান রেপ্লিকেটর আরও বড় এবং গুরুগম্ভীর। কিন্তু চকচক করে চলতে থাকা জটিল পাইপের সারি, এই সংমিশ্রণের প্রতিটি জিনিস যা মানুষের উপস্থিতি ছাড়াই নিঃশব্দে কাজ করছে তা সত্যিই অপার্থিব। কুমারের নোঙর ছোঁড়ার শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে ছিঁড়ে ফেলল।

–এস আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।

–না।

–আমি বহুবার এখানে এসেছি।

নিশ্চয়ই একা নয়, আমি নিশ্চিত ক্যারিনা ভাবল। কিন্তু কোন মন্তব্যের আগেই সে নিজেকে আবিষ্কার করল কুমারের পাশে। কোমড় সমান পানি দুপুরের রোদে এখনও অস্বস্তিকর রকমের গরম। হাতে হাত ধরে তীরে উঠে শীতল বাতাসে দুজনের ভেজা শরীর জুড়িয়ে গেল। মনে হচ্ছিল তারা যান্ত্রিক কোন বেহেস্তের আদম হাওয়া।

কুমার বলল, চিন্তা কোর না। আমি সবটা চিনি। ড. লোরেনসন আমাকে সব বুঝিয়ে বলেছেন। কিন্তু আমি একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি, যা তিনি জানেন না।

তারা মাটি হতে মিটার খানেক উপরে থাকা বেশ ভালো আবরণী দেয়া একটি পাইপ ধরে চলছিল। এবং এই প্রথম ক্যারিনা পাইপের ভেতর ছুটে যাওয়া ঠান্ডা পানির শব্দ পেল। এখন তারা সেই চৌবাচ্চার সামনে, যেখানে বিখ্যাত কাঁকড়াটাকে পাওয়া গিয়েছিল। খুব অল্প পানিই দেখা যাচ্ছে। উপরটা গুল্ম দিয়ে প্রায় পুরোটা ভর্তি। যদিও থ্যালসায় কোন সরীসৃপ নেই, তারপরও গুল্মের মোটা কান্ড ক্যারিনাকে সাপের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

তারা অনেকগুলো কালভার্ট এবং ছোট স্লুইজ গেইট পার হল। তারপর মূল প্ল্যান্টের বাইরে একটা বড়, খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। তারা মূল কাঠামো ছেড়ে যাবার সময় কুমার একটা ক্যামেরার লেন্সের দিকে ভেংচি কাটল। কেউই বলতে পারেনি কেন এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যামেরাটা বন্ধ ছিল। –বরফের পাত, কুমার বলল। প্রত্যেকটার ওজন ছয়শ টন। পঁচানব্বই ভাগ পানি আর পাঁচ ভাগ গুল্ম। হাসির কি দেখলে?

–হাসির নয় তবে অদ্ভুত, তখনও ক্যারিনা হাসছে। চিন্তা করো তারা আমাদের সামুদ্রিক জঙ্গলের একটা অংশ তারার রাজ্যের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেটার জন্য নিশ্চয়ই তুমি আমাকে আননি।

—না, আস্তে করে কুমার বলল। দেখ...

সে কি দেখাতে চাইলো ক্যারিনা প্রথম বুঝতেই পারলনা। তারপর একদম দৃষ্টিসীমার প্রান্তে এক জ্বলজ্বলে ছায়া দেখতে পেল। তখন সে বুঝল।

এটা অবশ্য সেই পুরানো ম্যাজিক। মানুষ হাজার বছর ধরে বহু জায়গায় এটা করেছে কিন্তু নিজের চোখে তা দেখার ব্যাপারটা সত্যিই অবিস্মরণীয়।

এবার তারা শেষ ট্যাংক পর্যন্ত হেঁটে গেল, যাতে ভালোভাবে দেখা যায়। সূক্ষ্ম আলোর সুতো কয়েক সেন্টিমিটারের চেয়ে মোটা নয়, সোজা উঠে গেছে তারাদের দিকে আলোর বীমের মতো। ক্যারিনা যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়, দেখল। কোথায় যে এটা হারিয়ে যায় বোঝা মুস্কিল। তারপর সে নিজেই খুঁজে বের করল। অনেক উপরে একটা ছোট্ট স্থির তারা। অন্য প্রাকৃতিক সঙ্গীরা তাকে ছেড়ে পশ্চিমে চলে যাচ্ছে। একটা নাক্ষত্রিক মাকড়সার মতো ম্যাগেলান তার সুতো ছাড়ছে নীচের পৃথিবীর উপহারের জন্য। এখন তারা দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষারত বরফ চাকের একদম প্রান্তে। এখানে আরেকটা বিস্ময় ছিল। এর উপরটা, চকচকে হলুদ ফয়েলে যেন মোড়ানো —বাচ্চাদের জন্মদিনের উপহার বাবা-মা যেমন মুড়িয়ে দেয়।

—বর্ম, কুমার বোঝালো। এটা সত্যিকারের সোনা, প্রায় দুই অনু পুরু। এটা না থাকলে ওঠানোর আগেই অর্ধেক বরফ গলে যেত।

বর্ম আছে কি নেই তা বোঝা না গেলেও ক্যারিনা তার পায়ের নীচে বরফের ঠান্ডা কামড় টের পাচ্ছিল। ডজন খানেক পা চালাতেই তারা একদম মাঝখানে চলে গেল সেখানে ত্রিশ হাজার ওপরের আকর্ষণে টানটান হয়ে থাকা অধাতব রিবনগুলো একত্রে বরফ ওপরে নিয়ে যায়। রিবনগুলো শেষ হয়েছে এক ড্রামে। যার যন্ত্রপাতি এবং জেটগুলো বুঝিয়ে দেয় যে এটা সচল বুদ্ধিমান ক্রেন, যা ওপর আসা রশিকে লক্ষ্যভেদে সাহায্য করে। পুরো জিনিসটাই একটা উন্নত পরিণত প্রযুক্তির সরলতা প্রকাশ করে।

ক্যারিনা হঠাৎ কেঁপে উঠল। শীতের জন্য নয়, সেটা এখন টেরই পাওয়া যাচ্ছে না।

—তুমি কি নিশ্চিত কোন বিপদ নেই, সে উদ্বিগ্ন স্বরে শুধাল।

—অবশ্যই। তারা সব সময় মাঝরাতে তোলে। সেটা এখনও আধঘন্টা দেরী। সেটা দেখতে খুবই সুন্দর। কিন্তু এতোক্ষণ বোধহয় থাকা যাবেনা।

এবার কুমার বসে পড়ল। হাটু মুড়ে গ্রহ আর মহাকাশযানের মধ্যের সংযোগকারী রিবনগুলোর ওপর কান পাতল। যদি এটা উঠে যায়, তাহলে কি তারাও উড়ে যাবে, ক্যারিনা ভাবল?

—শোন, কুমার ফিসফিসিয়ে বলল।

ক্যারিনার জানা ছিল না কি আশা করা উচিৎ। অনেক সময় পরবর্তী বছরগুলোতে যখন তার সহ্য ক্ষমতা বেড়েছিল সে ওই মুহূর্তগুলোকে আবার মনে করতে চাইত। পারত কি না কে জানে! প্রথম মনে হয়েছিল যে বিশ্বজুড়ে এক

সেতারের সবগুলো তার এক সঙ্গে বেজে উঠেছে। এটা তার মেরুদন্ডে শীতল স্রোত বইয়ে দিল। সে টের পেলো তার ঘাড়ের পেছনের ছোট রোমগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ভয়ে– যা মানুষ পেত আদিম জঙ্গলে।

অভ্যস্ত হবার পর পর সে বুঝল যে, বরফের পাতগুলো মৃদু শব্দ করে সরছে। সন্দেহাতীতভাবে একটার সঙ্গে আর একটা লেগে যাচ্ছে। যদিও এখন বেশ দৃশ্যত নিরাপদই কিন্তু অবিশ্রান্ত সমুদ্রের গর্জনের মতোই এটা বন্ধ হচ্ছে না।

যতই সে শুনতে লাগল, ততই ক্যারিনার মনে হচ্ছিল নির্জন সৈকতে অশান্ত ঢেউয়ের শব্দের কথা। তার মনে হল সে যেন বিশ্বজুড়ে আছড়ে পরা মহাশূন্যের সমুদ্রের গর্জন শুনছে–এমন এক গর্জন যা মহাবিশ্বের মহাশূন্যতার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে আতংকের জন্ম দেয়।

এবং এরই মধ্যে সে এই জটিল ঐকতানের অন্যান্য উপাদানগুলো সম্বন্ধেও সচেতন হল। থেকে থেকে রিবনগুলোর সঙ্গে দৈত্যর মতো আংটাগুলো লাগার টুংটাং ধ্বনি ভেসে আসছিল। উল্কা? তা তো নয়ই। সম্ভবত থ্যালসার সামুদ্রিক আবহাওয়ার কোন বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ? কিন্তু কুমার তখন নক্ষত্রের রাজ্য হারিয়ে গেছে। সুরময় রিবনে মাথা ঠেকিয়ে অর্ধেক মুখ খুলে সে যেন সম্মোহিত হয়ে গেছে সেই অদ্ভুত সুরে। সে খেয়ালই করল না কখন ক্যারিনা রেগে এবং ভয় পেয়ে বরফ পেরিয়ে পরিচিত মৃত্তিকার উষ্ণতায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন কুমার নতুন একটা চড়া সুরের বাজনা শুনতে পাচ্ছে। এটা যেন তূর্য-নিনাদ, যা কেবল কল্পনা করা যায়। সেটা এতো বিষণ্ন আর দূরাগত। এটা কাছিয়ে আসছে, বাড়ছে– এ এমন এক রোমাঞ্চকর শব্দ যা কুমার কখনোই শোনেনি। এটা তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে স্থির করে রাখল। এবং এর পরই কুমার লিওনার্দ শেষ বারের মতো তার ঘুমন্ত বিশ্বের ভঙ্গুর সৌন্দর্যকে চোখ ভরে দেখল। দেখল তার সঙ্গের মেয়েটির উর্ধ্বমুখী, ভীত মুখখানি যে কিনা তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই ঘটনা স্পষ্ট মনে রেখেছিল।

তখন খুব দেরী হয়ে গেছে লাফাবার জন্যও। এবং তাই ছোট্ট লিওনার্দ উঠে গেল নির্বাক নক্ষত্রের মাঝে–নগ্ন এবং একা।

৪৮. সিদ্ধান্ত

ক্যাপ্টেনের মনে সমস্যাটা বিধে আছে। এবং একজন দূতের ওপর দায়িত্ব দিতে পেরে সে স্বস্তি পাচ্ছে। এবং কোন অবস্থাতেই লোরেন লোরেনসনের চাইতে উপযুক্ত এই ব্যাপারে আর কেউ নেই। সে যদিও কখনও তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়নি। এবং এখনও পরিচিত হওয়াটা সুখকর কিছু নয়। মিরিসা তার সঙ্গে যেতে চাইলেও সে রাজী হয়নি। ল্যাসানরা তাদের বৃদ্ধদের সম্মান করে এবং তাদের সুখ-

স্বাচ্ছন্দের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টাই করে। লাল এবং নিকরি লিওনার্দ দক্ষিণ সৈকত ধারে ছোট্ট, স্বয়ংসম্পূর্ণ অবসর ভোগীদের জন্য বানানো কলোনীর একটায় বাস করে। তাদের ছয় রুমের বাসাটায় আছে শারীরিক পরিশ্রম কম লাগে এমন সব যন্ত্র। এমনকি সর্বক্ষণ রোবট সাহায্যকারী, যা লোরেন সারা দক্ষিণ দ্বীপে আগে দেখেনি। পৃথিবীর হিসেবে এদের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। প্রাথমিক সৌজন্য পরিচয়ের পর তারা বারান্দায় বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। রোবটটা পানীয় এবং ফল পরিবেশন করছিল। লোরেন জোর করে কিছু মুখে দিল। এবার সে সাহস সঞ্চয় করে তার জীবনের কঠিনতম কাজে হাত দিল।

–কুমার, নামটা তার গলায় আটকে গেল এবং তাকে আবার শুরু করতে হল। কুমার এখনও মহাকাশযানে। আমি আমার জীবনের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ। সে আমাকে বাঁচাতে একবার তার জীবন বিপন্ন করেছিল। আপনারা হয়ত বুঝবেন তার জন্য আমার কেমন লাগছে। আমি তার জন্য যে কোন কিছু করতে পারি।

আবার সে সময় নিল নিজেকে গুছিয়ে আনতে। তারপর সার্জন কমান্ডার নিউটনের মতো সে যথাসাধ্য দ্রুত এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করল।

–তাঁর শরীর প্রায় অক্ষতই। কারণ পচন শুরু হতে দেরী হয় আর দ্রুত সে জমে গিয়েছিল। কিন্তু সে শরীর তত্ত্বীয়ভাবে মৃত সপ্তাহখানেক আগে আমার মতোই।

কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। আমার শরীর মস্তিষ্কের ক্ষতি হবার আগেই উদ্ধার হয়েছিল। সুতরাং তাড়াতাড়ি আমি ফিরে এসেছিলাম।

কিন্তু কুমারকে উদ্ধার করতে ঘন্টা খানেক সময় লেগেছিল। গঠনে যদিও তার মস্তিষ্ক আগের মতোই আছে কিন্তু তাতে কোন স্পন্দন নেই। কিন্তু তার পরেও খুব উচ্চ প্রযুক্তিতে হয়তো একে ফেরানো যাবে। সারা পৃথিবীর রেকর্ড ঘেটে আমরা দেখেছি এরকম আগেও হয়েছে এবং সাফল্যের হার প্রায় ষাট ভাগ।

এবং এটা আমাদের দোটানায় ফেলে দিয়েছে। যেটা ব্যাখ্যা করতে ক্যাপ্টেন বে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। সঠিক ভাবে বলতে সেরকম অপারেশন করার মতো যন্ত্রপাতি এমুহূর্তে আমাদের কাছে নেই। তবে তিনশ বছর পরে হয়ত...

আমাদের ঘুমন্ত কয়েকশ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের ভেতরে ডজনখানেক মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ আছেন। সেখানে আরও আছে টেকনিসিয়ান যারা যে কোন সার্জিকেল যন্ত্রপাতি তৈরী এবং চালাতে পারে। আমরা সাগান-২ এ পৌঁছুলেই পৃথিবীর সব কিছুই আবার ফিরে আসবে... তাদের চিন্তা করার জন্য সে বিরতি দিল।

আমরা চেষ্টা করব, বলা যায় খুশী হব কুমারের জন্য যতটুকু করা যায় তা করতে পারলে। আমরা যদিও কথা দিতে পারি না তবুও হয়তো সে একদিন বেঁচে উঠবে। আপনারা চিন্তা করুন।

সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আপনাদের প্রচুর সময় আছে। বৃদ্ধ দম্পতি দীর্ঘক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। লোরেন তাকাল সমুদ্রের দিকে। কি শান্ত সেটা। সে এখানে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলে সুখী হতো, নাতি নাতনিরা মাঝে মাঝে আসত...

তারনার অনেক কিছুর মতো এটাও প্রায় পৃথিবীর মতোই। সম্ভবত ইচ্ছে করেই আশে পাশে কোন ল্যাসান উদ্ভিদ নেই, সবই বড় পরিচিত। কিন্তু কিছু একটা এখানে নেই, কিছু একটা যা তাকে বহুদিন ভাবিয়েছে, যখন থেকে এই গ্রহে পা দিয়েছে। এবং হঠাৎ তার স্মৃতি উস্কে দিয়েছে। সে বুঝছে কি নেই এখানে। এখানে কোন গাংচিল নেই, নেই তাদের বিষণ্ন ডাক।

লাল লিওনার্দ এবং তার স্ত্রী যদিও একটা শব্দও বিনিময় করেনি, তাও লোরেন লোরেনসন বুঝল কোন একভাবে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

কমান্ডার লোরেনসন–আপনার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ। ক্যাপ্টেন বেকেও ধন্যবাদ পৌঁছে দেবেন। কিন্তু আমরা এটা গ্রহণ করতে পারছি না। যাই হোক না কেন– কুমার চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। এমনকি যদি আপনারা সাফল্য পানও, যদিও তার নিশ্চয়তা নেই, সে জাগবে এক সম্পূর্ণ অচেনা জগতে। এবং সে জানবে, সে কোনদিনই আর তার প্রিয় ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। তার প্রিয় জগত শতাব্দীরও বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে। এটা সহ্যের বাইরে। আপনারা ভালোর জন্য বলছেন– কিন্তু সেটা তার জন্য ভালো হবেনা। আমরা তাকে তার প্রিয় সমুদ্রের কাছেই ফিরিয়ে দেব।

আর কিছু বলবার ছিল না। লোরেন একই সঙ্গে এক অন্তহীন বিষাদ এবং বিশাল মুক্তির অনুভূতি পেল।

সে তার দায়িত্ব পালন করেছে। এবং এই সিদ্ধান্তটিই সে আশা করেছিল।

৪৯. সৈকতে বহ্নি

সেই ছোট্ট কায়াকটা কোনদিনই আর সম্পূর্ণ হবে না। তবুও সেটি তার প্রথম এবং শেষ অভিযানে যাচ্ছে।

সূর্যাস্তের সময় শান্ত সমুদ্রের পানির প্রান্তে এটা হয়েছিল। অপ্রত্যাশিত নয়, তবুও শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানুষের দল দেখে লোরেনের শূন্য লাগছিল। পুরো তারানাই এখানে। পুরো দক্ষিণ দ্বীপ এমনকি উত্তর দ্বীপ থেকেও মানুষ এসেছে। এই অচিন্তনীয়, অস্বাভাবিক মৃত্যু সমগ্র গ্রহকেই বিষণ্ন করেছে আর কৌতুহলে অনেকে আসলেও, লোরেন কখনও এরকম খাটি শোক দেখেনি। লোরেন কখনোই ভাবেনি ল্যাসানদের এতো গভীর অনুভূতি থাকতে পারে। সান্তনার আর্কাইভে মিরিসার খুঁজে পাওয়া একটা বাক্য তার স্মরন আসল 'সমগ্র বিশ্বের ছোট্ট বন্ধু' কে লিখেছিল জানা যায়নি, কেনই বা এটা এতোদিন সংরক্ষিত হল সেটাওনা।

অব্যক্ত সহানুভূতিতে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া মিরিসার পরিবারকে সে মিরিসা এবং ব্র্যান্টের সঙ্গে ছেড়ে এল। দুই দ্বীপ থেকে তাদের প্রচুর আত্মীয় এসেছে। সে তাদের সঙ্গে থাকতে চাইছিল না। এই অপরিচিতরা কি ভাবছে সে জানে, সে তোমাকে একবার রক্ষা করেছে, কিন্তু তুমি পারনি। এই বোঝা তাকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে।

সবচেয়ে বড় মহাকাশযানের একজন জেষ্ঠ্য কর্মকর্তার জন্য বেমানান চোখের পানি লুকিয়ে রাখার জন্য সে ঠোঁট কামড়ে ধরল এবং অনুভব করল তার মনের একটা প্রতিরোধ শক্তি তাকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে। প্রচন্ড দুঃখের সময় এমন কিছু একটা আসে যা সাময়িক ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে– হয়তো সেটা সম্পূর্ণই অন্য জিনিস অথবা হাস্যকর কোন স্মৃতি।

হ্যাঁ, মহাবিশ্বের বিচিত্র কৌতুক বোধ আছে। লোরেন জোর করে হাসিটা মুছে ফেলল। তার প্রতি শেষ কৌতুক করতে কুমারের কেমন লেগেছিল। –অবাক হয়ো না, কমান্ডার নিউটন মর্গের দরজা খুলে শীতল ফরমালিনের গন্ধে ভরা রুমে ঢুকতে ঢুকতে বললেন। এটা প্রায়ই হয়। তোমরা যা ভাবো তার চাইতে বেশী। কখনও এটা হয় শেষ খিচুনী– হয়তো মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তির শেষ চেষ্টা। এখানে সেটা হবে হয়তো বাইরের চাপ এবং শীতলতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

বরফের ক্রিস্টালগুলো এই শরীর ধরে রেখেছে। লোরেনের মনে হলো কুমার আসলে ঘুমিয়ে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখছে।

মৃত্যুতে যেন ছোট্ট লিও আগের চাইতে আরও পুরুষালী হয়েছে।

পশ্চিমের নীচু পাহাড়গুলোর পেছনে সূর্য প্রায় লুকিয়ে পড়েছে। সাগর থেকে একটা শীতল বাতাস বয়ে এল। কায়াকটা পানিতে নেমে গেল। ব্র্যান্ট আর কুমারের তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেটা নিয়ে যাচ্ছে। শেষ বারের মতো লোরেন তার জীবনের জন্য ঋনী বাচ্চাটার মুখ দেখল।

এতক্ষণ ফোঁপানী শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু চারজন সাতারু যখন কায়াক নিয়ে তীর ছেড়ে সরে যেতে লাগল, সমবেত ভিড় থেকে বিলাপের শব্দ শোনা গেল। লোরেন আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না– কে দেখল, তাতে তার কিছু আসে যায় না।

চারজন শক্তিশালী সারথীর হাতে কায়াকটা ধীরে ধীরে তীর থেকে সরে যেতে লাগল। দুটি বীকনবাতি যা খোলা সাগর নির্দেশ করে, তার মাঝ পর্যন্ত যেতে যেতে থ্যালসায় দ্রুত রাত নেমে এল। এর পরে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল ঢেউয়ের মাঝে।

শোক প্রকাশ থেমে গেছে। সবাই অপেক্ষা করছে। তারপরই হঠাৎ অন্ধকার আকাশ ভেদ করে একটা আলোকরশ্মি সমুদ্রের বুক থেকে উঠে এল। এটা প্রায় ধোঁয়াহীন ভাবেই উজ্জ্বল ভাবে পুড়তে লাগল। কতক্ষন লোরেন জানে না–সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ আগুন নিভে গেল, সমুদ্রে ফিরে এল। এক মুহূর্তের জন্য সব আঁধার হয়ে গেল। আগুন আর সমুদ্র মিলতেই আকাশে কিছু স্ফুলিঙ্গ বিস্ফোরিত হল। কিছু সাগরে ফিরে এল, আর প্রায় সবই উড়ে গেল আকাশে।

এবং দ্বিতীয় বারের মতো কুমার লিওনার্দ তারার পানে যাত্রা করল।

দূর পৃথিবীর ডাক

৫০. বরফ বর্ম

শেষ বরফপাতটি ওঠানোর ব্যাপারটি হওয়া উচিৎ ছিল আনন্দময় ঘটনা। কিন্তু সেটা এখন বড়জোর একটা বিষণ্ন সন্তুষ্টি। থ্যালসার তিরিশ হাজার মিটার ওপরে শেষ বরফপাতটি ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে বরফ বর্মটি শেষ হলো।

দু'বছর পর এই প্রথম কোয়ান্টাম ড্রাইভ আবার ব্যবহার হলো, যদিও খুব অল্প শক্তিতে। ম্যাগেলান তার স্থির কক্ষপথ ছেড়ে গতি নিয়ে পরীক্ষা করলো বরফ বর্মের দৃঢ়তা এবং ভারসাম্য –যা তাকে নিয়ে যাবে নক্ষত্র রাজ্যের মাঝে। কাজটি ভালোই হয়েছে, কোন সমস্যা হলো না। এটা ছিল ক্যাপ্টেন বে'র জন্য একটা বিরাট স্বস্তি। কারণ তিনি কোনভাবেই এই কৃত্রিম হিমবাহের একজন অন্যতম স্থপতি ইয়েন ফ্লেচারের কথা ভুলতে পারছিলেন না। যাকে অবশ্য এখন উত্তর দ্বীপে আটকে রাখা হয়েছে এবং মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে হয় যে, এই সাফল্যের অনুষ্ঠান দেখতে ফ্লেচার এবং অন্যান্য স্যাব্রাদের কেমন লাগছে। অনুষ্ঠানে ছিল একটা ভিডিও রেট্রোস্পেকটিভ, যাতে প্রথম বরফ তৈরীর ঘটনা এবং প্রথম বরফপাত ওঠানোর দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। তারপর তাতে মহাকাশ ব্যালের সঙ্গে সঙ্গে দেখানো হলো বরফপাতগুলো কেমন করে উঠে গিয়ে বরফবর্ম তৈরী করে। এখানে প্রথমে সত্যিকারের বিরতি এবং পরে প্রতি সেকেন্ডে প্রতিটি বরফপাত ওঠার দৃশ্য আসছিল। থ্যালসার প্রধান সুরকার এমনভাবে কম্পোজিশন করেছিলেন, যাতে প্রথমে খুব মৃদু লয়ে বাজনা শুরু হয়ে পরে দ্রুততায় পৌঁছে সবশেষে আবার ফিরে আসে প্রথম কোমল স্বরে।

এরপর দৃশ্য চলে গেল গ্রহের ছায়ায় ঘুরতে থাকা ম্যাগেলানে। তাৎক্ষণিক সচিত্র ভিডিওতে যে বিশাল সান-স্ক্রীনটা বরফটাকে ঢেকে রাখে, সেটা সরে গেলে পুরো বর্মটাকে প্রথমবারের মতো দেখা যায়।

ঠান্ডা সাদা বরফ পাতটা নিচের ফ্লাড লাইটের আলোয় ঝলসে উঠল। খুব শিগগিরি এটা চলে যাবে এমন মহাজাগতিক রাতে যেখানে তাপমাত্রা পরম শূন্যের মাত্র কয়েক ডিগ্রি ওপরে। সেখানে এটা কেবল উষ্ণ হবে নক্ষত্রের আলো, মহাকাশযানের রেডিয়েশন আর হঠাৎ করে আছড়ে পড়া কোন বস্তুর সংঘর্ষে।

ক্যামেরা ঘুরে বেরাতে লাগল বরফ বর্মের উপর তার সঙ্গে ভেসে এল সুপরিচিত মোজেস ক্যালডরের ধ্বনি।

থ্যালসার অধিবাসীরা তোমাদের উপহারের জন্য ধন্যবাদ। আশা করি এই বরফ বর্মের পেছনে সত্তর আলোকবর্ষ দূরে তিনশ বছর পাড়ি দিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছুবো। যদি সবকিছু ভালোভাবে চলে তাহলে সাগান-২তে আমরা পৌছাব অন্তত বিশ হাজার টন বরফ নিয়ে। এটাকে তখন ফেলা হবে গ্রহটার উপরে। এবং ঢোকার সময় সংঘর্ষে এটা গলে বন্ধ্যা সেই গ্রহে প্রথম বৃষ্টি ঘটাবে। জমে যাবার আগে সেটাই গ্রহের আদি সমুদ্র হবে। একদিন আমাদের উত্তরসূরীরা একটা সমুদ্র পাবে তোমাদের মতো যদিও তোমাদের মতো গভীর বা বিস্তৃত নয়। নতুন গ্রহে আমাদের দুই বিশ্বের জল মিলবে এক নতুন জীবনের স্পন্দনে। এবং আমরা তোমাদের মনে রাখব, ভালোবাসায় আর কৃতজ্ঞতায়।

৫১. পবিত্র

–কি সুন্দর! মিরিসা শ্রদ্ধা মিশ্রিত স্বরে বললো। এখন আমি বুঝতে পারলাম কেন পৃথিবীতে স্বর্ণ এতো মূল্যবান ছিল।

–স্বর্ণ ছিল খুব কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। ক্যালডর ভেলভেটের বাক্স থেকে দ্যুতিময় জিনিসটা বের করতে উত্তর দিল। তুমি কি বলতে পার এটা কি?

–নিশ্চয়ই এটা আরও বেশী কিছু?

–তুমি ঠিকই বলেছ। এটা একটা মহান সৌধ, একশ মিটারের উঁচু–তার প্রতিকৃতি। আদতে একটার ভেতরে আরেকটা নিয়ে মোট সাতটা অংশ ছিল। এটা ছিল সবচেয়ে ভেতরে পবিত্রতার শেষ চিহ্ন। আমার কিছু বন্ধু পৃথিবীর শেষ রাতে আমায় দিয়েছিল। তারা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল "সব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চার হাজার বছর ধরে এটা পাহারা দিয়েছি। এটাকে নিয়ে যাও তারাদের দেশে। আমাদের আশীর্বাদ রইল্।"

যদিও আমি তাদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী নই কিন্তু এমন অমূল্য এক উপহার আমি কিভাবে অস্বীকার করি? এখন এটা এখানেই থাকুক। মানুষ যখন প্রথম এখানে এসেছিল তা ছিল পৃথিবীর প্রথম উপহার– এটা হোক শেষ।

–এভাবে বলো না, মিরিসা বলল। তোমরা এতো উপহার দিয়েছ –আমরা গুনে শেষ করতে পারব না।

লাইব্রেরীর জানালা দিয়ে পরিচিত দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্যালডর কিছুক্ষণ কিছু বলল না। থ্যালসায় তার খুব ভালো সময় কেটেছে। থ্যালসার ইতিহাস পড়ে যা জেনেছে তা সাগান-২-এ নতুন উপনিবেশ করার জন্য অমূল্য সম্পদ হবে।

পুরানো মাতৃযান–বিদায়, সে ভাবল। তুমি তোমার কাজ ভালোই করেছ কিন্তু আমাদের তো আরও যেতে হবে বহুদূর। আশা করি তোমার মতোই ম্যাগেলান আমাদের বিশ্বাসী বন্ধু হবে। যেমন তুমি ছিলে এদের প্রতি।

–আমি নিশ্চিত যে, আমার বন্ধুরা আমার সঙ্গে একমত হবে, যে আমি ঠিকই করেছি। মহাকাশযানের চাইতে এখানকার পৃথিবীর যাদুঘরে এটা অনেক বেশী

নিরাপদে থাকবে। এমনও তো হতে পারে যে আমরা সাগান-২ পৌঁছুতেই পারলাম না।

–অবশ্যই তোমরা পারবে। কিন্তু তুমি আমাকে বললে না তো যে ওই সাতটা বাক্সের মধ্যে কি থাকতো।

–এটা হচ্ছে একজন মহামানবের স্মৃতি চিহ্ন। তিনি এমন এক বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন যা কোন রক্তে রঞ্জিত হয়নি। আমার মনে হয় সেও শুনলে অবাক হতো যে চল্লিশ হাজার বছর পর তার একটা দাঁত নক্ষত্রের পথে উড়ে গিয়েছে।

৫২. দূর পৃথিবীর ডাক

এখন যাত্রার সময়। সময় বিদায়ের। মৃত্যুর মতোই এই বিচ্ছেদ। থ্যালসা এবং ম্যাগেলানে যত অশ্রু ঝরে পড়ল, তার পেছনে একটা স্বস্তিও অবশ্য ছিল। যদিও ঠিক আগের মতো কখনোই ফেরা হয়না –তবুও জীবন আবার তার পুরোনো ছন্দ ফিরে পাবে। অভিযাত্রীরা ছিল যেন এমন এক অতিথি –যাদের থাকাটা একটু বেশী হয়ে গেছে গৃহস্বামীর বাড়িতে। এখন তাই যাবারই সময়।

এমনকি প্রেসিডেন্ট ফারাদীনও মেনে নিয়েছেন এবং তার আন্তঃগ্রহ অলিম্পিকের স্বপ্ন বাদ দিয়েছেন। তবুও তার যথেষ্ট তৃপ্তি আছে। ম্যানগ্রোভ বনের বরফ-কল উত্তর দ্বীপে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আগামী আসরের আগেই স্কেটিং রিং তৈরী হয়ে যাবে।

কোন প্রতিযোগী পাওয়া যাবে কিনা কে জানে–তবে অনেক তরুণ ল্যাসানই আগেকার খেলোয়াড়দের ভিডিও দেখতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যে সবাই একমত যে ম্যাগেলানের যাত্র উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান করা উচিত। কিন্তু সমস্যা হল কি করা উচিত তা নিয়ে কেউ একমত হতে পারছে না। যদিও ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রচুর অনুষ্ঠান সবাইকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্লান্ত করে ফেলেছে–কিন্তু কোন সরকারী উন্মুক্ত অনুষ্ঠান হয়নি। তারানার পক্ষ হতে মেয়র ওয়াডের্ন অনুষ্ঠানটি প্রথম অবতরণের জায়গায় করবার দাবী জানালেন। প্রেসিডেন্ট ফারাদীন ছোট হলেও প্রেসিডেন্টের প্রাসাদই এর জন্য উপযুক্ত বলে যুক্তি দেখালেন। কেউ কেউ মধ্যবর্তী হিসাবে ক্র্যাকানের বিখ্যাত উপত্যকাকে চিহ্নিত করলেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত না থ্যালসার সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ, গ্রহের সবচেয়ে শক্তিশালী আমলাতন্ত্র নিঃশব্দে পুরো ব্যাপারটা ঠিক করল ততক্ষণ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা ঝুলে রইল।

বিদায়ের সঙ্গীতকে হতে হবে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য মনে রাখার মতো কিছু একটা। কোন ভিডিও থাকবে না এর আবেদন অক্ষুণ্ন রাখার জন্য। শুধু বাজনা এবং নেপথ্য কণ্ঠ। দুই হাজার বছরের ঐতিহ্যকে নিয়ে, ভবিষ্যতের জন্য অনুপ্রেরণা হবে মূল বিষয়। যান্ত্রিক উৎকর্ষতার শেষ পর্যায়ে গিয়ে কম্পোজাররা নতুন কি

কম্পোজিশন বের করতে পারে তা আসলেই এক প্রশ্নের ব্যাপার। দুই হাজার বছর ধরে ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলো মানব কানে পৌছায় এমন বাজনার প্রতিটি কমান্ড দিয়ে গেছে। ঐ মাধ্যমে আর নতুন কিছু আছে বলে মনে হয়না।

অবশ্য নতুন সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রে কম্পোজারদের অভ্যস্ত হতেই এক হাজার বছর লেগে গিয়েছিল। প্রযুক্তি আর কলার এই নতুন বন্ধনে বেটোফেন এবং বাখকে অতিক্রম না করলেও তাদের কাছে অনেকেই পৌছেছিলেন।

শ্রোতাদের কাছে এ ছিল নতুন জিনিস। পৃথিবীতে যা রেখে আসা হয়েছিল এ তার স্মৃতি। বিশাল ঘন্টার দূরাগত ধ্বনি –পুরোনো মন্দিরের অদৃশ্য ধোঁয়ার মতো; শান্ত মাঝির সুর যা হারিয়ে গেছে চিরতরে; যুদ্ধে যাবার সৈনিকের গান– সময় যাদের সব দুঃখ কষ্ট চুরি করে নিয়ে গেছে; পৃথিবীর বড় শহরের দশ মিলিয়নের কণ্ঠস্বর; ঠান্ডা বরফের উপরে অরোরার অশরীরি নৃত্য; নক্ষত্র যাত্রার শক্তিশালী ইঞ্জিনের গর্জন। এই সব শব্দাবলী ভেসে এলো বিদায় সঙ্গীতে– সে সঙ্গীতে আছে দূর পৃথিবীর ডাক, আলোকবর্ষ পেরিয়ে যার আহ্বান...

শেষ অংশ হিসেবে প্রযোজক রেখেছিলেন শেষ শ্রেষ্ঠ সিম্ফনীকে। থ্যালসা যখন পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক হারায় সে বছরেরই সৃষ্টি। দর্শকদের কাছে এটা সম্পূর্ণ নতুন। এর সামুদ্রিক ভাবটা ছিল অনুষ্ঠানের জন্য সম্পূর্ণ যুৎসই। এবং এর প্রভাব দর্শকদের ওপর যা ছিল– তাই হতে পারে বহু আগে মৃত সুরকারের সর্বোচ্চ ইচ্ছা।

আমি যখন 'আটলান্টিস শোকগাঁথা' রচনা করি, তেমন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না। আমার কিছু অনুভূতি প্রবল ছিল, কোন সচেতনতা নয়। আমি চেয়েছিলাম সুরটা একটা বিষাদ, একটা রহস্য– একটা সব হারানোর ছায়া আনুক। মৎস্যে ঘেরা কোন শহরের ছবি আমি আঁকতে চাইনি। কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার হচ্ছে এখন যখনই আমি শেষটা শুনি, মনে হয় আমি এর জন্যই তৈরী...

যখন কিছু বাজনা নামতে নামতে অর্গানের একদম শেষ শব্দহীন জায়গায় নেমে গেল তারপর গভীর থেকে শব্দটা উঠতে লাগল, চড়া হতে শুরু করল...তুমি তো জানই যে সেই প্রাচীন, বিশাল তিমিদের সঙ্গীতের উপর ভিত্তি করে এটা রচনা করেছিলাম, যাদের আমরা বহু আগেই শেষ করে ফেলেছি নিষ্ঠুরভাবে। আমি এটা ওলগা কন্ড্রাসিনের জন্য লিখেছিলাম এবং তারপর আর কেউ ইলেকট্রনিক্সের সাহায্য না নিয়ে এটা গাইতে পারেনি।

কণ্ঠ সঙ্গীত যখন শুরু হয়, আমার মনে হয় সত্যি সত্যি কিছু একটা আছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি সেন্ট পিটার অথবা সেন্ট মার্কসের মতো বড় শহরের চত্বরে। আমার চারপাশে আছে ভাঙ্গা, পুরনো গ্রীক মন্দিরের মতো বাড়ী, শুয়ে থাকা মূর্তি।

সমুদ্রের আগাছা আর গুল্মরা আমার চারপাশে দুলছে। আর সবকিছুই ঢাকা পড়ে আছে শ্যাওলায়।

চত্বরটা ফাঁকা থাকে প্রথমে, তারপর কিছু একটা নড়াচড়া করে। আমাকে জিজ্ঞেস করো না, কেন এটা সব সময়ই হঠাৎ আসে, কেন প্রতিবারেই মনে হয় আমি প্রথম দেখছি...

চত্বরের মাঝে একটা ঢিবি থেকে কয়েকটা দাগ বেরিয়ে গেছে। আমার মনে হয় যেন সেগুলি ধ্বসে পড়া দেয়াল, শ্যাওলায় ঢাকা। জিনিসটার কোন মাথা মুন্ডু খুঁজে পাওয়া যায় না– তারপর হঠাৎ দেখি ঢিবিটা নড়ছে।

এক মুহূর্ত পর আমি দেখি বিশাল দুটো চোখ আমার দিকে নিস্পলক চেয়ে আছে। এইই সব– আর কিছু নয়। এখানে গত ছয় হাজার বছরে কিছু হয়নি। যখন থেকে সমুদ্র এই ভূমি গ্রাস করেছে এবং হারকিউলিসের প্রাচীর ডুবে গেছে। লেনেটা আমার সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু এতো দুঃখ আর নৈরাশ্যে আমার শেষ করতে ইচ্ছে করে না। তাই চূড়ান্ত 'পুনরুত্থান'।

আমি জানি প্লেটোর আটলান্টিস কখনোই ছিল না। আর তাই এর মৃত্যুও নেই।

এটা একটা আদর্শ–একটা নিখুঁত স্বপ্ন– সব মানুষকে উদ্দীপ্ত করার এক উৎস। তাই ভবিষ্যতের পদক্ষেপের স্বপ্নে সিম্ফনি শেষ হয়।

আমি জানি পদযাত্রার জনপ্রিয় ব্যাখ্যাটা হচ্ছে সমুদ্র হতে আটলান্টিসের নবযাত্রা। সেটা খুব বেশী গৎবাঁধা। আমার কাছে চূড়ান্ত যাত্রা হচ্ছে নক্ষত্রের পানে যাত্রা। শুরু করার পর সমাপ্তি সঙ্গীত শেষ করতে আমার মাস খানেক সময় লেগেছে। এই পনেরোটা নোট আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। এখন শোকগাঁথা আমার কাছ থেকেই আলাদা হয়ে গেছে। এর নিজের একটা পথ হয়ে গেছে। এমনকি যখন পৃথিবী ধ্বংসও হয়ে যাবে তখনও টিসোলকোভস্কি গ্রহাণুতে বসানো পঞ্চাশ হাজার মেগাওয়াটের ডিপ স্পেস অ্যান্টেনা দিয়ে অ্যান্ড্রমিডা নক্ষত্রের দিকে সুর ভেসে যাবে।

একদিন, হাজার কোটি বছর পর এটা কেউ ধরবে, শুনবে এবং বুঝবে।

–কথার স্মৃতিঃ সের্গেই ডি পিটার (৩৪১১-৩৫০৯)

৫৩. সোনালী কিশোর

–আমরা এমন ভাব করি যেন ওটা নেই, মিরিসা অনুযোগ করল। কিন্তু আমি একবার ওটা দেখতে চাই।

লোরেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর উত্তর দিল– তুমি তো জান, ক্যাপ্টেন বে কোন অতিথি গ্রহণ করেন না।

মিরিসা জানে– কেন, তাও বোঝে। যদিও প্রথমে এটা বেশ কথা তুলেছিল। কিন্তু থ্যালসার সবাই এখন ব্যাপারটা বোঝে। ম্যাগেলানের অল্প সংখ্যক ক্রুদের মধ্যে অনেককেই ব্যস্ত থাকতে হবে ভ্রমণ সঙ্গী হিসেবে বা শূন্য-মধ্যাকর্ষণে যে পনের ভাগের মতো দর্শকদের বমি চলে আসে তাদের সেবায় লাগতে হবে। এমনকি প্রেসিডেন্ট ফারাদীনকেও কৌশলে নিবৃত্ত করা হয়েছে।

–আমি মোজেসকে বলব। সে ক্যাপ্টেনকে বলবে। তাহলে হবে। কিন্তু মহাকাশযান চলে যাওয়া পর্যন্ত এটা যেন গোপন থাকে।

লোরেন তার দিকে তাকাল–হাসল। মিরিসা সব সময়ই তাকে অবাক করে, এটাই অবশ্য তার প্রতি আকর্ষণের মূল একটা কারণ এবং কিছুটা বিষাদের সঙ্গেই সে বুঝল মিরিসারই এই দাবী করা সাজে। তার ভাইই একমাত্র ল্যাসান যে ওপরে যেতে পেরেছিল। ক্যাপ্টেন বে বিবেচক মানুষ–প্রয়োজন অনুসারে তিনি নিয়ম পাল্টান। এবং মহাকাশযান চলে যাওয়ার পর–আজ থেকে ঠিক তিনদিন পর–আর কিচ্ছু আসে যায় না।

–যদি তোমার সমুদ্র পীড়া থাকে?

–আমার কখনো হয়নি।

–সেটা কিছু প্রমাণ করে না।

–আমি কমান্ডার নিউটনকে দেখিয়েছি। আমাকে তিনি পঁচানব্বই ভাগ মানসম্পন্ন বলেছেন। তিনি আমাকে মাঝরাতে শাটলে যেতে বলেছেন– তখন কোন লোক থাকে না আশেপাশে।

–তুমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছ–তাই না? লোরেন প্রশংসার সুরে বলল। দু'নম্বর ল্যান্ডিংয়ে মাঝরাতের পনের মিনিট আগে আমি দেখা করব। সে থামল। তারপর কষ্টে যোগ করল, আমি আর নামব না। ব্র্যান্টকে আমার হয়ে বিদায় জানিও।

এটা এমন একটা জিনিস যেটার মুখোমুখি সে হতে পারে না। কুমার মারা যাবার পর সে আর লিওনার্দের বাড়ীতে পা রাখেনি। ব্র্যান্ট আবার ফিরে এসেছে। যেন সে তাদের জীবনে কখনোই প্রবেশ করেনি।

সেও তাদের এড়িয়ে চলেছে। এখনও সে মিরিসার দিকে তাকায় ভালোবাসার দৃষ্টিতে, কিন্তু কামনা ছাড়াই। একটা গভীর বেদনা যা সে খুব কমই পেয়েছে–তার মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কতদিন সে ভেবেছে সে তার সন্তানকে দেখবে। কিন্তু ম্যাগেলানের নতুন সূচী তা অসম্ভব করে তুলেছে। যদিও সে তার সন্তানের হৃদস্পন্দন শুনেছে, কিন্তু সে কখনোই তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে পারবে না।

শাটলটা দিনের অংশে গেলে, মিরিসা প্রথম ম্যাগেলানকে দেখে প্রায় একশ কিলোমিটার দূর থেকে। মনে হয় সূর্যালোকে জ্বলা কোন খেলনা। দশ কিলোমিটার দূর থেকেও একে খুব বড় মনে হয়না। মধ্যের ওই গোল কালো জিনিসগুলো জানালা এমনটাই সে মনে করতে চাইছিল। শেষমেষ ঢোকার পর সে মেনে নিল যে ওগুলোই অবতরণের জায়গা।

লোরেন উদ্বিগ্নভাবে সীটবেল্ট খুলতে থাকা মিরিসার দিকে তাকিয়ে ছিল। এটাই হচ্ছে সবচে ভয়ঙ্কর সময়। সীটবেল্ট খোলা হঠাৎ মুক্তি পাওয়া অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী যাত্রী হঠাৎই প্রথমবারের মতো বুঝতে পারে যে শূন্য-মাধ্যাকর্ষণ ততটা সুখপ্রদ জিনিস নয়। তবে বায়ুরোধী দরজা পেরিয়ে কয়েক ধাপ আসা মিরিসার মধ্যে কোন অস্বস্তি নেই।

ভাগ্য ভালো যে এক-মাধ্যাকর্ষণ স্থানে তোমার যেতে হবে না। দ্বিতীয়ত আবার ঠিক হওয়া ঝামেলা। মাটিতে না ফেরা পর্যন্ত মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না।

এদের থাকার, খাবার জায়গাটা দেখতে পেলে ভালো হতো, মিরিসা ভাবল। কিন্তু সেখানে প্রচুর মোলায়েম কথা বলতে হবে অনেকের সঙ্গে। এখন যে জিনিসটা সে চাচ্ছে না। ক্যাপ্টেন বে থ্যালসায় ভেবে তার ভালো লাগল–কোন সৌজন্য সাক্ষাতকারে যেতে হবে না।

তারা এয়ারলক ছেড়ে পুরো মহাকাশযানের সমান লম্বা এক করিডোরে পড়ল। এর একদিকে মই, আর অন্যদিকে হাত–পায়ের জন্য উপযোগী দু'সারিতে নমনীয় রশি–সেগুলো আপনা আপনি দু'দিকে সরে যাচ্ছে।

–গতিবেগ বাড়ার সময় এটা খুব ভালো জায়গা নয়। লোরেন বলল। এটা তখন দু'কিলোমিটার লম্বা শ্যাফট হয়ে যায়। ওসময় মই আর রশির গিট্টুগুলো লাগে।

তারা কয়েক'শ মিটার বিনা চেষ্টায় চলে গেল। তারপর ডানদিকের একটা করিডোরে ঢুকল। লোরেন বলল, রশিগুলো ছেড়ে দাও। তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।

মিরিসা রশি ছেড়ে দিয়ে করিডোরের জানালার পাশে গিয়ে দাড়ালো। মোটা জানালা দিয়ে সে ভেতরের উজ্জ্বল, ধাতব জিনিসগুলোর দিকে তাকাল। সে যদিও পুরোটা বুঝল না, তবুও তার মনে হল বিশাল সিলিন্ডারগুলো পুরো মহাকাশযানকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।

–কোয়ান্টাম ড্রাইভ। লোরেন গর্বের সঙ্গে বলল।

সেখানকার অসংখ্য ধাতব আর কৃষ্টালের যন্ত্রপাতি ব্যাখ্যার কোন চেষ্টাই সে অবশ্য করল না। প্রকোষ্ঠের ভেতর কৌতুহলোদ্দীপকভাবে উড়তে থাকা জিনিসগুলো, জ্বলতে নিভতে থাকা আলোগুলো, মিশমিশে কৃষ্ণতার মধ্যেই ফুটে ওঠা কোন অদ্ভুত আকৃতি, সবই কেমন রহস্যময়। কিছুক্ষণ পর সে বলল, মানব মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ আবিষ্কার। পৃথিবীর শেষ উপহার তার সন্তানদের প্রতি। একদিন এটাই আমাদেরকে নক্ষত্রের অধিপতি করবে।

কথাগুলোর মধ্যে এমন এক ঔদ্ধত্য ছিল যা মিরিসাকে মর্মাহত করল। এ যেন থ্যালসায় দ্রবীভূত হয়ে যাবার আগেকার লোরেন কথা বলছে। তাই অবশ্য হওয়া উচিত, মিরিসা ভাবল, তবে তারপরও তার কিছু অংশ সব সময়ের জন্যই পরিবর্তিত হয়েছে। সে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, তাহলেও কি নক্ষত্রের কিছু যাবে আসবে? তবে আসলেই সে মুগ্ধ হয়েছে। এসব বিশাল, অর্থহীন আকৃতির যন্ত্রগুলো তিরিশ আলোকবর্ষ পেরিয়ে লোরেনকে এখানে নিয়ে এসেছে তার কাছে। তবে সে নিশ্চিত নয় যা সে পেয়েছে তার জন্য কি একে শুভেচ্ছা জানাবে না যা নিয়ে যাচ্ছে তার জন্য অভিশাপ দেবে।

লোরেন এবার তাকে আরও ভেতরে, ম্যাগেলানের অন্তরে নিয়ে গেল। এখনও তারা কোন মানুষের সাক্ষাৎ পায়নি। ম্যাগেলানের বিশালত্বের তুলনায় এটা ক্রুর স্বল্পতাই প্রমাণ করে।

–আমরা প্রায় এসে গেছি। লোরেনের স্বর শ্রদ্ধায় নীচু। এই হচ্ছে 'অভিভাবক'। অবাক হয়ে এগুতে গিয়ে মিরিসা প্রায় ভেসে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকা

সোনালী মুখটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল একটু হলেই। হাত দিতেই সে ঠান্ডা ধাতব স্পর্শ অনুভব করল। এই প্রথম সে বুঝল এটা কোন ত্রিমাত্রিক ছবি নয়, আসল মূর্তি।

–এটা-ইনি-কে? মিরিসা ফিসফিসিয়ে বলে উঠল।

–এটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী শিল্পকর্মের একটি–লোরেন মৃদু গর্বের সঙ্গে উত্তর দিল। এটা খুব বিখ্যাত। এ ছিল একজন রাজা, কিশোর অবস্থাতেই...

একটা সমান্তরাল চিন্তায় লোরেনের স্বর নেমে এল। মিরিসার চোখও ঝাপসা হয়ে এসেছে। চোখের পাতা ফেলে পানি সরিয়ে সে সামনের লেখাগুলো পড়ল।

তুতেন খাম
১৩৬১-১৩৫৩ খ্রীষ্টপূর্ব
(সম্রাটের উপত্যকা 'মিশর' ১৯২২)

হ্যাঁ বয়সটা প্রায় কুমারের সমানই। সহস্রাব্দ পরে, সোনালী মুখ রাজার গর্ব নিয়েই তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখে শক্তি এবং আস্থা থাকলেও নেই ঔদ্ধত্য।

–এখানে কেন? অনুমান একটা থাকলেও মিরিসা শুধালো।

–এটাকে একটা যথার্থ প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। প্রাচীন মিশরীয়রা ভাবত যে, ঠিকভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে পারলে মৃতরা কোন এক ধরনের পারলৌকিক জীবন শুরু করতে পারে। অন্ধ বিশ্বাস সন্দেহ নেই–কিন্তু একভাবে আমরা সেটাই সত্যি করেছি।

মিরিসা দুঃখের সঙ্গে ভাবল, আমি যেভাবে আশা করেছিলাম সেভাবে নয়। কিশোর রাজার চোখের দিকে তাকিয়ে, সোনার মুখোশের ওপর তাকিয়ে তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল এটা কেবল একটা শিল্প, জীবন্ত কোন মানুষ নয়। শতবর্ষ পেরিয়ে আসা শান্ত, সম্মোহক চোখ থেকে সে চোখ ফেরাতে পারছিল না। আরেকবার সে হাত বাড়িয়ে সোনালী চিবুক স্পর্শ করল। প্রথম অবতরণের আর্কাইভে পাওয়া একটা কবিতা তার হঠাৎ মনে পড়ল। সান্তনা পাবার জন্য একটা কম্পিউটার সার্চে সে এটা পেয়েছিল। একশ'র বেশী বাক্যই খাপ খায় না, কিন্তু দুটো বাক্য ছিল একদম যথার্থ। (লেখক অজানা–? ১০০০-২১০০)

মানুষের গৌরবে তারা দিয়েছিল নতুন মাত্রা,
গর্বিত কিশোর, মৃত্যুতে আজ চিরযুবা।

মিরিসার চিন্তা সুস্থির না হওয়া পর্যন্ত লোরেন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল। এরপর মুখোশের পাশে প্রায় অদৃশ্য ছেঁদায় কার্ড ঢোকাল। গোলাকার দরজা খুলে গেল নিঃশব্দে। মহাকাশযানের ভেতর ফারের পোশাক ভর্তি কক্ষ হজম করা শক্ত। কিন্তু

মিরিসা ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ইতিমধ্যেই তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি নেমে গেছে। সে হি হি করে কাঁপতে শুরু করেছে।

শূন্য মাধ্যাকর্ষণের অসুবিধার জন্য লোরেন তাকে ফারের পোশাক পরতে সাহায্য করল। ছোট সে কক্ষের দেয়ালের মাঝে ছোট ঝাপসা কাঁচের দিকে তারা এগুলো। হঠাৎ করে ক্রিস্টালের একটি গুপ্তদরজা তাদের দিকে বেরিয়ে এল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এমন এক ঠান্ডা যার সঙ্গে মিরিসার কোন অভিজ্ঞতা নেই। বরফশীতল সেই ঠান্ডায় ভেসে থাকা কিছু কুয়াশা তাকে ঘিরে ধরল। সে এমনভাবে লোরেনের দিকে তাকাল যাতে বোঝাই যায় সে ঢুকতে চাচ্ছে না।

লোরেন তার হাত অভয় দেয়ার জন্য ধরল, ঘাবড়িও না –পোশাকটা তোমাকে রক্ষা করবে। আর কয়েক মিনিট পর তুমি টেরই পাবে না যে তোমার মুখে ঠান্ডা লাগছে। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য না শোনালেও সত্যি। গুপ্ত দরজাটা পেরিয়ে প্রথম কৌতুহলী শ্বাস নিয়েই সে টের পেল ব্যাপারটা যতটা অপ্রীতিকর মনে হয়েছিল আদতে তা নয়। বরং তার ভালো লাগছে। সে এতো দিনে বুঝল কেন পৃথিবীর লোকেরা মেরু অঞ্চল ঘুরতে যেত।

সেই বিশাল বরফ রাজ্যের মধ্যে সে নিজেকে এখনই সহজেই কল্পনা করতে পারছে। চারপাশে বরফের এক বিশাল মৌচাক ঝকমক করছে। হাজারখানেক ষড়ভূজ দেখা যাচ্ছে। ম্যাগেলানের বরফ বর্মের যেন ক্ষুদ্র সংস্করণ এটা –শুধু পার্থক্য হল এগুলো মিটারখানেক চওড়া, আর একটার সঙ্গে আরেকটা নল আর তার দিয়ে যুক্ত। তাহলে এখানেই ঘুমিয়ে আছে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ঔপনিবেশিকরা। যাদের কাছে পৃথিবী এখনো গতকালের স্মৃতি। দুশ বছরের যাত্রায় ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখছে তারা? মৃত্যু আর জীবনের মাঝের সময়ে কি আদৌ মস্তিষ্ক স্বপ্ন দেখে? লোরেন ভাষ্যমতে দেখে না– কিন্তু তাই কি নিশ্চিত? মিরিসা ভিডিওতে মৌমাছির রহস্যময় অন্তহীন ব্যস্ততা দেখেছে। বিশাল এই মৌচাকের মাঝে লোরেনের হাত ধরে যেতে যেতে তার নিজেকে এক মানব-মৌমাছি মনে হচ্ছে। শূন্য অভিকর্ষে সে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ঠান্ডাটাও সহনীয় হয়ে গেছে। তার নিজের শরীরের অনুভূতিই যেন হারিয়ে ফেলেছে। মাঝে মাঝে তাকে জোর করে মনে করতে হয় যে সে সত্যি জেগে আছে– ঘুমুচ্ছে না।

প্রতিটি প্রকোষ্ঠ কোন নাম নয় বরং নম্বর দিয়ে চিহ্নিত। লোরেন হ-৩৫৪-এ থামল। একটা বোতাম স্পর্শ করতেই একটা ষড়ভুজ আকৃতির কাঁচ আর ধাতু দিয়ে তৈরী টেলিস্কোপ আস্তে বেরিয়ে এল। চোখ দিতেই ভেতরে একজন নারী ঘুমিয়ে আছে দেখা যায়।

সে সুন্দরী নয় যদিও ঝাঁকড়া চুলের সৌন্দর্য না দেখেই এধরনের মন্তব্য ঠিক না।

তার গায়ের রং মিরিসা আগে কখনো দেখেনি। প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ যাতে নীলচে একটা ছাপ তা পৃথিবীতেও খুব কম ছিল। আরও কিছু শরীর সাদা ও হলুদ তার চোখে পড়ল–এছবি, সে জানে, জীবনেও তার পিছু ছাড়বে না।

সে আবার তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাল। শত বছরের নিদ্রাও এর মুখে সংকল্প আর বুদ্ধিমত্তা মুছে দিতে পারেনি। আমরা কি পরস্পরের বন্ধু হতাম? মিরিসা ভাবল, মনে হয় না– আমরা বড় বেশী একরকম।

তাহলে তুমিই হলে কিতানি। তুমি নিয়ে যাচ্ছ লোরেনের প্রথম সন্তান নক্ষত্রের মাঝ দিয়ে। তবে সত্যিই কি সে প্রথম সন্তান হবে, যখন আমার সন্তানের শতাব্দী পর তার জন্ম হবে।

সে এখনও আবিষ্ট। শুধু ঠান্ডার কারণেই সেটা নয়। ক্রিস্টালের দরজা তাদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল। লোরেন তাকে অভিভাবকের পাশ দিয়ে ধরে নিয়ে গেল।

তার আঙ্গুলগুলো আরেকবার ছুঁয়ে গেল অমর সোনালী কিশোরের মুখ। উষ্ণতা মুহূর্তের জন্য তাকে চমকে দিল– তারপরই তার মনে পড়ল তার শরীর এখনও স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ফেরেনি।

কয়েক মিনিট লাগল এতো কিছু দেখতে –মিরিসা ভাবল, কিন্তু তার বুকের ভেতর যে বরফ জমে আছে তা গলতে আর কতদিন লাগবে?

৫৪. বিদায় সম্ভাষণ

ইভলিন, দীর্ঘতম নিদ্রায় যাবার আগে এটাই তোমার সাথে শেষ কথা। আমি এখনও থ্যালসার মাটিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শাটল এসে যাবে ম্যাগেলানের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য। আজ থেকে তিনশ বছর পরে গ্রহ বরণের আগে আমার আর কিছুই করার নেই... আমার বিষণ্ন বোধ হচ্ছে। আমার প্রিয়তম বন্ধুকে আমি এইমাত্র বিদায় জানালাম, মিরিসা লিওনার্দ। তুমি যদি ওর সঙ্গে পরিচিত হতে পারতে। থ্যালসায় আমার দেখা সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ। আমরা কত কথা বলেছি যদিও আমার আশংকা তার অনেকটাই বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি যা নিয়ে তুমি প্রায়ই আমাকে খেপাতে...

সে প্রায়ই ঈশ্বর সংক্রান্ত প্রশ্ন করত। তবে তার সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন যেটা ছিল তার উত্তর আমি ঠিকমতো দিতে পারিনি।

তার ছোট ভাইটি মারা যাবার পর, একদিন সে শুধালো, দুঃখের প্রয়োজন কি? এর কি কোন শারীরিক কাজ আছে?

কি আশ্চর্য আমি কখনো এই দিকে নজরই দেইনি। যদি কোন বুদ্ধিমান সভ্যতা থাকে যাদের মৃতদের চিন্তা হয় কোন দুঃখ ছাড়াই, অথবা মৃতদের চিন্তাই তাদের মাথায় আসে না, তবে সেটা কেমন হবে। অবশ্যই মানবীয় না –তবে পৃথিবীর পিঁপড়া বা উইয়ের মতো তারাও বাঁচতে পারে।

বিষাদ কি ভালোবাসারই মতো দুর্ঘটনা অথবা অবশ্যম্ভাবী উপজাত? যার এক আবশ্যকীয় শারীরিক ক্রিয়া আছে। এ এক অদ্ভুত, কুহেলীময় চিন্তা। কিন্তু অনুভূতিই আমাদের মানুষ বানিয়েছে। কেইবা অনুভূতিগুলো বিসর্জন দিতে চাইবে, যদিও সে

জানে যে প্রতিটি ভালোবাসাই আসলে সময় আর ভাগ্যের মতো দুই সহোদরের হাতে জিম্মি মাত্র।

সে প্রায়ই আমাকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করত ইভলিন। সে খুব বিভ্রান্ত হয়ে যেত, যখন সে ভাবত যে একজন পুরুষ কেবল সারাজীবন ধরে একজন নারীকে ভালোবাসতে পারে, আর তার মৃত্যুর পর অন্য কোন নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তা করে না। আমি একবার তাকে খেলাচ্ছলে বলেছিলাম হিংসার মতো ব্যভিচার শব্দটা ল্যাসানদের কাছে অপরিচিত। সে জবাব দিয়েছিল যে ওদুটো হারিয়ে তারা আদতে জিতে গেছে।

শাটল চলে এসেছে– তারা আমায় ডাকছে। থ্যালসাকে আমাকে এখন চিরতরে বিদায় জানাতে হবে। আর তোমার স্মৃতিও ধূসর হয়ে আসছে। যদিও আমি সবাইকে উপদেশ দিয়ে বেড়াই, তবে আমি মনে হয় আমার দুঃখ বেশীই আঁকড়ে আছি, যা তোমার স্মৃতিকে ব্যাথাতুর করে তুলছে।

থ্যালসা আমাকে সুস্থির হতে সাহায্য করেছে। তোমাকে হারাবার বিলাপ না করে, তুমি একদিন আমার ছিলে এটাই এখন শান্তির।

এক অদ্ভুত সমাহিতভাব আমাকে ঘিরে ধরেছে। আমার মনে হয় এই প্রথম আমি আমার বৌদ্ধ বন্ধুদের চিন্তা– তাদের নির্বাণ কিছুটা বুঝতে পেরেছি... আর আমি যদি সাগান-২-এ জেগে নাও উঠি অসুবিধে নেই। আমার কাজ এখানেই সমাপ্ত হয়েছে –আমি তৃপ্ত।

৫৫. যাত্রা

মাঝরাতের ঠিক আগে নৌকাটা গুল্মের জঙ্গলের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছুল। ব্র্যান্ট তিরিশ মিটার পানির গভীরে নোঙর করল। সকাল থেকে কাঁকড়া পল্লী হতে দক্ষিণ দ্বীপ পর্যন্ত সে গোয়েন্দা- গোলক ফেলতে ফেলতে এসেছে। ঠিকমতো কাজ করলে এ পথে কাঁকড়াদের আসা যাওয়া সব চোখে চোখে থাকবে। যদি উপহার ভেবে কোন কাঁকড়া এটাকে বাড়ী নিয়ে যায় তাহলে আরও ভালো। খোলা সাগরের চাইতে সেখান থেকে আরও ভালো তথ্য সেটা পাঠবে।

এখন আর কিছুই করার নেই। মৃদু দুলতে থাকা নৌকায় শুয়ে তারনার রেডিওতে ভেসে আসা মৃদু সঙ্গীত শোনা ছাড়া। আজকে সেটা অবশ্য কম। থেকে থেকে বসতির লোকেদের পক্ষ থেকে পাঠানো কোন শুভেচ্ছাবাণী অথবা কবিতা পড়ে শোনানো হচ্ছে। দুই দ্বীপের খুব কম লোকই আজ ঘুমাতে পারবে। মিরিসা মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে সম্পূর্ণ অজানা একটা বিশ্বে অবশিষ্ট জীবনের জন্য নির্বাসিত হওয়া ইয়েন ফ্লেচার এবং তার সঙ্গীদের মনে কি চিন্তা খেলা করছে এই মুহূর্তে। উত্তরের এক ভিডিওতে সে তাদের শেষ দেখেছে। তাদের দেখতে মোটেও অসুখী মনে হয়নি। তারা এখানে ব্যবসার সুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করছিল।

ব্র্যান্ট এতো চুপচাপ যে, সে ভেবেছিল ব্র্যান্ট ঘুমিয়ে গিয়েছে। শুধু নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় আগের মতো শক্ত মুঠোর চাপটা বুঝিয়ে দেয় সে সজাগ। ব্র্যান্ট অনেক বদলেছে–সম্ভবতঃ তার চাইতেও বেশী। আগের অস্থিরতা নেই, বেড়েছে তার বিবেচনা বোধ। সবচে ভালো ব্যাপারটা হল ব্র্যান্ট বাচ্চাটাকে মেনে নিয়েছে। তার কথায় সে কেঁদে দিয়েছিল, 'ওর দুটো বাবা হবে।'

এখন রেডিও তারনা, চূড়ান্ত তবে অপ্রয়োজনীয় উৎক্ষেপনের সময় গণনা শুরু করেছে। ল্যাসানরা ঐতিহাসিক রেকর্ড ছাড়া এই কাউন্টডাউন কখনো শোনেনি। মিরিসা ভাবল, আমরা কি আদৌ কিছু দেখব? ম্যাগেলান গ্রহের অন্যপাশে মধ্য দুপুরের সাগরের বহু উপরে। আমাদের মাঝে পুরো গ্রহটা দাঁড়িয়ে... শূন্য... তারনা রেডিও ঘোষণা দিল– এবং একটা গর্জনে ঢাকা পড়ে গেল। ব্র্যান্ট ঝুঁকে পড়ল নৌকা সামলাতে। এবং আকাশ দীর্ণ হবার আগে রেডিও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

পুরো দিগন্তে আগুনে ঝলসে উঠল। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সব দিকেই। এ এমন এক দৃশ্য যা ল্যাসানরা আগে কখনো দেখেনি, ভবিষ্যতেও দেখবে না।

এ এক চমৎকার শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য। মিরিসা এখন বুঝতে পেরেছে কেন ম্যাগেলান গ্রহের উল্টোদিকে। যদিও এটা কোয়ান্টাম ড্রাইভ নয়, কেবল মাত্র এর সঙ্গে জ্বলতে থাকা প্রাথমিক ইঞ্জিনগুলোর শক্তি, যার পুরোটাই আয়োনোস্ফিয়ার দিয়ে শোষিত হবে। সুপারস্পেসের শকওয়েভ সম্বন্ধে একবার লোরেন বলেছিল যে, এমনকি এই ড্রাইভের স্রষ্টাও এর কারণটা ঠিক জানেন না।

কাঁকড়াগুলো এই মহাজাগতিক রশ্মি দেখে কি করবে–মিরিসা ভাবল। গুল্মের নীচে ডুবন্ত শহরে কিছু আলো ফিল্টার হয়ে অবশ্যই পৌঁছুবে।

এটা কল্পনাও হতে পারে, তবে একটা বহুরঙা আলোর মুকুট তৈরী হচ্ছে আকাশ জুড়ে। সম্ভবত ম্যাগেলান গতি বাড়ানোর জন্য থ্যালসা ঘিরে একটা চক্কর দিচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ তার লাগল ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে এবং একই সময়ে সেটা কমে গেল। আর হঠাৎই সেটা থেমে গেল। রেডিও তারনা রুদ্ধশ্বাসে বাতাসে ভেসে এল।

...সবকিছুই পরিকল্পনা মাফিক এগুচ্ছে... মহাকাশযান দিক পরিবর্তন করছে... অন্যান্য জিনিস খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে না... গ্রহের পাশে বাকী উত্তরণ ঘটবে, তবে তিনদিন পর যখন এটা এই গ্রহজগত ছেড়ে যাবে তখন আমরা একে দেখতে পাব সরাসরি...

মিরিসার কানে আর কিছু ঢুকছিল না। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। আকাশে এখন আবার নক্ষত্র একটা দুটো করে ফুটে উঠছে– যে নক্ষত্রের দিকে তাকালেই এরপর থেকে তার লোরেনের কথা মনে পড়বে। যদিও এ মুহূর্তে তার তেমন অনুভূতি নেই। যদিও বা চোখে থাকে জল– তা পরেই দেখা দেবে।

সে তার চারপাশে ব্র্যান্টের উষ্ণ হাত অনুভব করল আর মহাকাশের নিঃসঙ্গতার বিপরীতে তাদের এই নিবিড়তাকে সে স্বস্তিকর হিসেবেই গ্রহণ করল। এটাই তার

জায়গা। আর কিছুর জন্য তার হৃদয় ব্যথিত হবে না। এবং এতোদিনে সে এটাও বুঝতে পারল যে, লোরেনকে সে পছন্দ করে তার শক্তির জন্য এবং ব্র্যান্টকে তার দুর্বলতার জন্য।

বিদায় লোরেন– সে ফিসফিসিয়ে বলল –তুমি আর তোমার সন্তান দূরের সে পৃথিবীতে সুখে থেকো। মানব সভ্যতার সেই নতুন সাম্রাজ্যে আমার কথা মনে কোরো, পৃথিবীর পথে তিনশ বছরের পরের কথা মনে কোরো তুমি।

ব্র্যান্ট তার চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভাবল কোন সান্তনার কথা বলে। কিন্তু বুঝল যে নীরবতাই শ্রেয়। যদিও মিরিসা আবার তার হয়েছে, তবু কোন বিজয়ের অনুভূতি তার মধ্যে কাজ করছে না। তাদের পুরানো, দায়িত্বহীন রোমান্স আজ মৃত। ব্র্যান্ট জানে লোরেনের ছায়া সব সময়ই তাদের সাথে অশরীরি ছায়া হয়ে থাকবে এবং তারা ছাই হয়ে বাতাসে মিশে যাবার দিনও সে থাকবে চির তরুণ।

তিনদিন পর যখন ম্যাগেলান পূব আকাশে দেখা দিল, খালি চোখে এর দিকে তাকানো যেত না। যদিও রেডিয়েশনের প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য এর কোয়ান্টাম ড্রাইভ অন্যদিকে সতর্কভাবে ঘুরিয়ে রাখা হয়েছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহে, মাসের পর মাসে এটা ধীরে ধীরে ম্লান হতে লাগল। যদিও কোথায় আছে জানা থাকলে দিনেও এটা দেখা যায় আর বছরের বেশী সময় ধরে এটা ছিল রাতের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা।

দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যাবার আগে মিরিসা শেষ বারের মতো এটা একবার দেখেছিল। এর কোয়ান্টাম ড্রাইভ–যা রেডিয়েশনের ভয় ছাড়াই সরাসরি থ্যালসার দিকে তাক করা, দূরত্বের কারণে মৃদুভাবে জ্বলছে।

যখন পনের আলোকবর্ষ দূরে, তখনও মিরিসার নাতি-নাতনিরা তৃতীয় উজ্জ্বলতার নীল তারাটাকে, বৈদ্যুতিক কাঁকড়া- প্রতিরক্ষা দেয়ালের পর্যবেক্ষণ চূড়ার ওপরে ঠিকই দেখতে পেত।

৫৬. সমুদ্রের তলদেশ

তারা এখনও বুদ্ধিমান না, তবে তাদের কৌতুহল আছে– আর অন্তহীন যাত্রার পথে এটাই প্রথম পদক্ষেপ। প্রাচীন পৃথিবীর সমুদ্রের বহু প্রাণীর মতোই তারা হয়ত অন্ত-হীনভাবে থাকতে পারত।

শেষের শতাব্দীর আগে অবশ্য তারা তেমন কিছু করার তাগিদ অনুভব করেনি। কারণ বিশাল সেই গুল্মের জঙ্গল তাদের সব কিছুর যোগান দিত। বড় পাতাগুলো খাদ্য যোগাত, কান্ডগুলো দিত তাদের প্রাচীন প্রযুক্তির উপকরণ।

তাদের শুধু দুটো প্রাকৃতিক শত্রু ছিল। একটা হচ্ছে সব সময় খিদে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কদাচিৎ দেখতে পাওয়া গভীর পানির মাছ। আর বিষাক্ত জেলী মাছ যা

এক ধরনের ভেসে বেড়ানো পাল্প। মাঝে মাঝে তারা সমুদ্রের তলদেশে হামলে পড়ে পুরো জায়গাটা মরুভূমি বানিয়ে দেয়।

মাঝে মাঝে পানি আর হাওয়ার ঝঞ্ঝাট ছাড়া কাঁকড়াগুলো হয়তো সারাজীবনই পানির তলে চমৎকার ভাবে অভিযোজিত হয়ে কাটিয়ে দিত। কিন্তু পিঁপড়ে বা উই পোকার মতো তারা বিবর্তনের কানা গলিতে ঢুকে পড়েনি। তারা পরিবর্তনের সাপেক্ষে সাড়া দিতে জানে।

এবং সামান্য হলেও, সাগরের বিশ্বে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। আকাশ থেকে চমৎকার সব জিনিস এসে পড়ছে। এগুলো কোত্থেকে আসছে? এবং নিশ্চয়ই আরও আছে। প্রস্তুত হয়ে কাঁকড়ারা একদিন খুঁজতে বেরুল।

অন্তহীন সময়ের থ্যালসার সাগরে তেমন কোন তাড়াহুড়ো করার কারণ ছিল না। তাদের স্কাউটরা বিচিত্র সব রিপোর্ট আনার বহু বছর পর তারা বাইরের জীবগুলোর ওপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়।

তারা অবশ্য এটাও বোঝেনি অন্য স্কাউটরা তাদের ওপরে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। এবং যখন তারা চূড়ান্ত আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল, তখন সময়টা ছিল তাদের জন্য সত্যিকার অর্থেই খারাপ। তীরে ওঠার সময় তাদের সামলাবার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়েন ফ্লেচার সম্পূর্ণ অসাংবিধানিকভাবে কিন্তু পুরো যোগ্যতা নিয়েই দ্বিতীয়বার তার অফিসে অবস্থান করছিলেন।

সাগান-২

৫৭. সময়ের স্বরধ্বনি

কুমার লোরেনসন যখন জন্মায় তখন মহাকাশযান ম্যাগেলান কয়েক আলোকবর্ষের বেশী দূরে নয়। কিন্তু তার বাবা তখন হিমনিদ্রায় এবং তিনশ বছরের আগে সে এই খবর জানতে পারবে না।

লোরেন কেঁদেছিল এই ভেবে যে তার প্রথম সন্তানের পুরো জীবনকালটাই চলে যাবে তার ঘুমন্ত অবস্থার মাঝখানে। সে যখন আবার জ্ঞান ফিরে পাবে তখন তাদের কথা থাকবে মেমরী ব্যাঙ্কে। সে দেখবে তার সন্তান কিভাবে বড় হচ্ছে, সে শুনবে শতাব্দী পেরিয়ে আসা শুভেচ্ছা যার জবাব সে কখনোই দিতে পারবে না। এবং তাকে এও দেখতে হবে কয়েক সপ্তাহ আগে যে প্রিয় মেয়েটাকে সে বাহুর মাঝে নিয়েছে তার বুড়িয়ে যাওয়া এবং মৃত্যু। তার ঠোঁট দিয়ে ভেসে আসা বিদায় ধ্বনি শোনার আগেই সে মিশে যাবে বাতাসে।

তার বেদনা তীক্ষ্ম হলেও আস্তে আস্তে কেটে যাবে। নতুন এক সূর্যের আলো আকাশ ভরিয়ে দেবে, আরেকটি নতুন জন্ম হবে নতুন গ্রহে, যার কক্ষপথে ম্যাগেলান ঘুরবে চিরতরে।

দুঃখটা একদিন চলে যাবে, থাকবে শুধু স্মৃতি।

সময়পঞ্জী

(তেরানের বয়স হিসাবে)

১৯৫৬ নিউট্রিনো আবিষ্কার

১৯৬৭ সৌর নিউট্রিনোর অস্বাভাবিকতা আবিষ্কার

২০০০ সূর্যের ভবিষ্যত নির্ণয়

১০০ আনন্তঃনাক্ষত্রিক অনুসন্ধানযান

২০০

৩০০ রোবট বাহিত ভ্রূণ সমৃদ্ধ মহাকাশযানের পরিকল্পনা

৪০০

২৫০০ মহাকাশযান উৎক্ষেপন শুরু (ভ্রূণ সমৃদ্ধ)

৬০০ ডি.এন. এ কাঠামো সমৃদ্ধ যান

৭০০

৭৫১ থ্যালসার উদ্দেশ্যে বীজ বহনকারী মহাকাশযান প্রেরণ

৮০০

৯০০

৯৯৯ শেষ সহস্রাব্দ

৩০০০ থ্যালসা

১০০

৩১০৯ প্রথম অবতরণ ০

২০০ শেষের সভ্যতার জন্ম ১০০

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ

৩০০ দিনের ২০০

ক্র্যাকান পর্বতের অগ্ন্যুৎপাতঃ

৪০০ প্রভুরা সংযোগ বিচ্ছিন্ন ৩০০

৩৫০০ ৪০০

কোয়ান্টাম ড্রাইভ

৬০০ চূড়ান্ত মহাপরিকল্পনা স্থবিরতা

৬১৭ মহাকাশযান ম্যাগেলান

৩৬২০ পৃথিবী ধ্বংস

৩৮৬৪ ম্যাগেলানের আগমণ ৭১৮

৩৮৬৫ ম্যাগেলানের প্রস্থান ৭২০

৪১৩৫ সাগান-২ ১০২৬